ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা
সামাজিক প্রেক্ষাপট

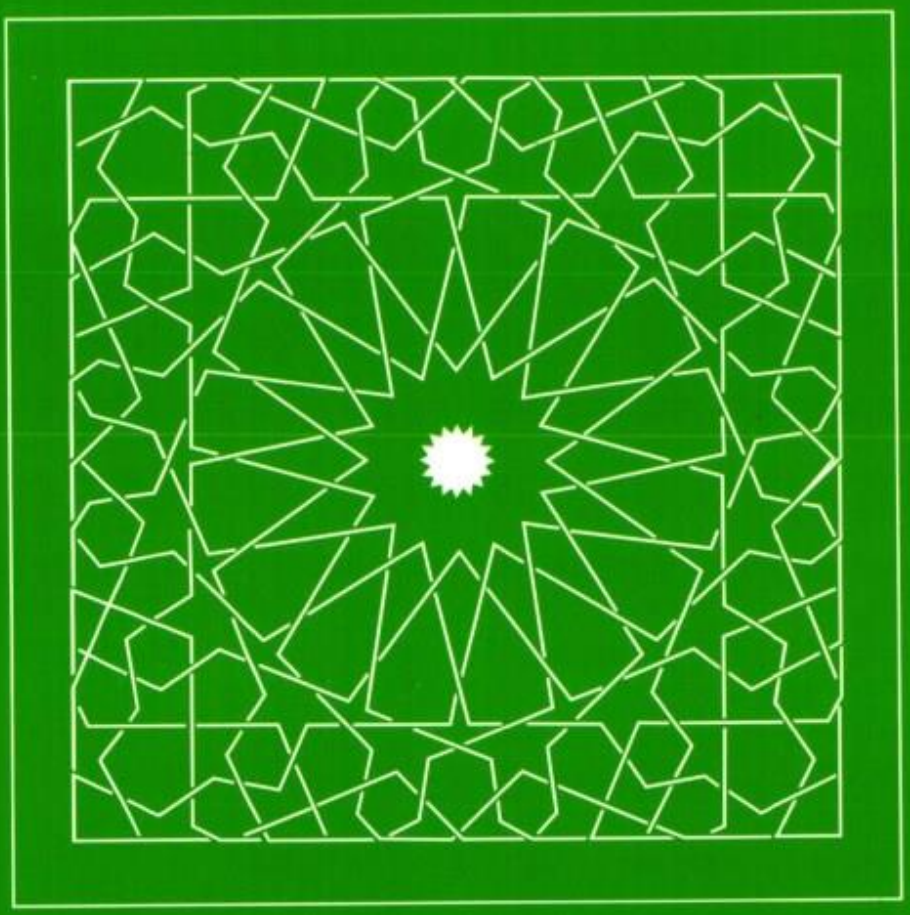

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি)

ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা
সামাজিক প্রেক্ষাপট

অনুবাদ

এম রুহুল আমিন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
(বি. আই. আই. টি)

www.pathagar.com

ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা
সামাজিক প্রেক্ষাপট
ISLAM AND A NEW INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER THE SOCIAL DIMENSION

অনুবাদ ঃ এম রুহুল আমিন

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি)
১৪৫ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৯১১৪৭১৬, ৯১৩৮৩৬৭, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯১১৪৭১৬
E-mail: biit_org@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৩/১৪২৪ হিঃ

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN-984-8203-31-8

প্রচ্ছদ ঃ এম. এ. আকাশ

মুদ্রণে ঃ **আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস**
৪২৩ বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৫৮৪৩২, ৯৩৪৫৭৪১

মূল্য অফসেট ঃ টা. ১৩০.০০
সাদা ঃ টা. ১০০.০০

Islam 'O Naya Antorjatik Ortho Babostha : Samajik Prekhkhapot is a Bengali version of **"Islam and a New International Economic Order the-Social Dimension"** is an ILO-Zeneva publication Translated into Bangla by M RUHUL AMIN, edited by Dr. Mahmud Ahmad and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), 145 Green Road, Dhaka-1205, Bangladesh. Phone: 9114716, 9138367, Fax: 880-2-9114716, E-mail: biit_org@yahoo.com, biit89_info@yahoo, 1st edition: June 2003/1424 H.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলামী অর্থব্যবস্থার কোন ভূমিকা বা ইসলামে কোন অর্থ ব্যবস্থা থাকতে পারে কিনা বিশেষ করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সামাজিক প্রেক্ষাপটই বা কি হতে পারে এ নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে প্রচুর আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ১৯৮০ সালের ৭-১০ জানুয়ারি জেনেভায় ইন্টারন্যাশনাল লেবার স্টাডিজ ইনস্টিটিউট একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার দেশগুলো আন্তর্জাতিক মানের এ সিম্পোজিয়ামের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। সম্মেলনে মুসলিম অধ্যুষিত প্রধান দেশগুলোর ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের বিখ্যাত পন্ডিতবর্গ যোগদান করেন। এই সিম্পোজিয়ামে ইন্টারন্যাশনাল লেবার স্টাডিজ ইনস্টিটিউট'র পরিচালনা বোর্ড ও জেনেভাস্থ এর অংগ সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের পরিচালনা বোর্ড সম্মিলিতভাবে উন্নয়নের ওপর সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর যে ভূমিকা ও প্রভাব রয়েছে তার ওপর একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার সংস্কারের কথা ধরলে এখনো ঘুরে ফিরে আবার পশ্চিমা সমাজ দর্শনের ওপরই আলোচনা চলে আসে। এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষিত আলোচনায় আমাদেরকে অন্যান্য কলাকৌশল নিয়ে ভাবতে হবে। উন্নয়নের পন্থা উদ্ভাবনে অন্য সমাজ, অন্য সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিষয়গুলোর ওপর আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে এসে অবস্থার উন্নয়নে আজ ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের দিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি দেয়ার সময় এসেছে। জেনেভায় অনুষ্ঠিত ঐ সিম্পোজিয়ামের মূল উদ্দেশ্যটাই ছিল আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ইসলামী চিন্তা ছড়িয়ে দেয়া যাতে প্রগতিশীল ও সুষম বিশ্ব ব্যবস্থা বিনির্মাণের সামাজিক কৌশল প্রণয়নে ইসলাম আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেমিনারে তিনটি মূল বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। (১) ইসলামী সংস্কৃতি ঃ এর ভিত্তি ও ভবিষ্যত, (২) সমাজ ও রাষ্ট্র ঃ ইসলামী সত্তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সমাজ, (৩) উন্নয়ন ও অর্থনীতি ঃ ইসলামী সমাজ ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা। এই মূল বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই সিম্পোজিয়ামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এই পুস্তকে সিম্পোজিয়ামে উপস্থাপিত ও আলোচিত প্রবন্ধগুলোই স্থান পেয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের সামাজিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার নতুন দিগন্ত উন্মোচনে পুস্তকটি যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। সিম্পোজিয়ামে যে নয়টি প্রবন্ধ পঠিত হয় তার সব ক'টিই পুস্তকটিতে স্থান পেয়েছে। সিম্পোজিয়ামে যারা অংশ

www.pathagar.com

গ্রহণ করেন ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কীর্তিমান। নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় তাঁদের লেখনি যথেষ্ট অবদান রাখবে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট বিশেষত ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ সংস্কৃতির ওপর অনুবাদসহ মৌলিক, গবেষণামূলক ও সৃজনশীল প্রকাশনা করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার ওপর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা জেনেভা কর্তৃক প্রকাশিত **Islam and a New International Economic Order-Social Dimension** বইয়ের বংগানুবাদ, **ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা–সামাজিক প্রেক্ষাপট** বইটি প্রকাশ করেছে।

ড. মাহমুদ আহমদ
সেক্রেটারী জেনারেল
বি.আই.আই.টি.

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

রাজনৈতিক ধারণা ও অর্থনৈতিক ধারণার কারণে বিশ্বমানবতা আজ দ্বিধা বিভক্ত। এগুলো আবার নিজেদের মধ্যে কোথাও কোথাও যোগসূত্রও সৃষ্টি করেছে। ধারণা দু'টোর একটি অপরটিকে তাড়িত করে, আর সেজন্যই পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষের সাথে অপর প্রান্তের মানুষের দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। রাজনৈতিক ধারণা অর্থনৈতিক ধারণাকে প্রভাবিত করে, আবার অর্থনৈতিক ধারণাও রাজনৈতিক ধারণার মেরুকরণ করে। অর্থনৈতিক ধারণা মানুষের বস্তুগত জীবনকে এতবেশী প্রভাবিত করে যে, এর দ্বারা মানুষের মানবিক ও সামাজিক গুণাবলীও প্রভাবিত হয়। বস্তুগত বিশ্বে শান্তির জন্য বহু রাজনৈতিক মতবাদ ও অর্থনৈতিক মতবাদ মানুষকে সুখ শান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। অবশ্য এগুলোর কোনটাই সফল হয়নি। পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত বহু রকমের অর্থনৈতিক মতবাদ মানুষকে শান্তির কথা বলেছে। অথচ এর কোনটাই ঠিক ছিলনা। কোন তত্ত্বই সম্পদের প্রাপ্তি আর সুষম বন্টনকে নিশ্চিত করতে পারেনি। যার জন্যই মানবতার এমন বিপর্যয়। মানুষের তৈরী তত্ত্ব আর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র তত্ত্বের মধ্যে আবহমান কাল থেকেই এই দ্বন্দ্ব। মানুষকে সৃষ্টির সাথে সাথে আল্লাহ মানুষের জন্য কল্যাণকর তত্ত্বও সৃষ্টি করেছেন। ইসলামী অর্থনীতি মানুষের চলার জন্য সেরূপ একটি তত্ত্ব। এই গ্রন্থে ইসলামী অর্থনীতির সামাজিক দিকই আলোচিত হয়েছে। যাঁরা এই গ্রন্থে লিখেছেন তাঁরা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক দিকগুলোর ওপরই লিখেছেন। এসব বিষয় সমাজকে প্রভাবিত করে, আর এই প্রভাবিত করার কারণে অর্থনীতিও প্রভাবিত হয়। এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোই এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অনুবাদের বিষয়টি ছিল খুবই জটিল। এরূপ একটি গ্রন্থ অনুবাদের সময় আমার শুধুই মনে হয়েছে, এধরনের গ্রন্থ বা এরূপ বিষয়ের ওপর অনুবাদকর্ম আরো পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল। দেরীতে হলেও হয়েছে। আশা করি পাঠক, গবেষক ও শ্রোতাদের কাছে আমার অনুবাদ কর্মটি উপভোগ্য হবে। আমার অনুদিত পান্ডুলিপিটি আজ বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এর পুরো কৃতিত্ব বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট'র সেক্রেটারী জেনারেল ও আমার শ্রদ্ধেয় স্যার জনাব জহুরুল ইসলাম'র। তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণা না পেলে আমার এই অনুবাদকর্ম হয়ত প্রকাশিত হতো না। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটির গুণগত উৎকর্ষ সাধনে ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেকস্ট বুক বোর্ডের স্পেশালিস্ট অধ্যাপক মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান পুরো গ্রন্থের সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যে সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁর এই অকৃপণ সহযোগিতা না পেলে গ্রন্থটি এতবেশী সুখপাঠ্য হতো না। আমি তাঁর কাছে ঋণী। ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট ড. মাহমুদ আহমদ গ্রন্থটি রিভিউ করে প্রয়োজনীয় স্থানে সম্পাদনা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর কাছেও আমি ঋণী। আমার সহকর্মী ও খুব প্রতিশ্রুতিশীল জনাব মতিয়ার রহমান পুরো পান্ডুলিপিটি কম্পোজ করে আমাকে যেভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন তার প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিবার ও অফিস জীবনের দারুণ ব্যস্ততার মাঝেও অনুবাদ কাজে বাংলা ভাষার সরস উপস্থাপনায় আমাকে অকৃত্রিম সাহায্য করার জন্য আমার সহধর্মিনী জনাব সাবিনা ইয়াসমীনকেও ধন্যবাদ জানাই।

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

ইসলামী সলিডারিটির জন্য ইসলামী সম্মেলন সংস্থার নির্দিষ্ট স্থায়ী তহবিল রয়েছে। ঐ তহবিলের সহায়তায় দি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লেবার স্টাডিজ (IILS) ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা ঃ সামাজিক প্রেক্ষাপট এর ওপর একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। জেনেভায় অনুষ্ঠিত এ সিম্পোজিয়াম ১৯৮০ এর ৭ জানুয়ারী থেকে ১০ জানুয়ারী পর্যন্ত চলে। মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান এলাকার ৬০ জন অংশগ্রহণকারী ছাড়াও ইসলামিক স্টাডিজের বিশিষ্ট পন্ডিতবর্গ এ সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন।

আই আই এল এস (IILS) এর পরিচালক মি আলবার্ট টিভোয়েরয (Albert Tevoidrje) তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, সিম্পোজিয়ামটিতে এই প্রথমবারের মত আই আই এল এস বোর্ড এবং এর মূল সংগঠন দি ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের গভর্ণিং বডি উন্নয়নের ওপর সাংস্কৃতিক উপকরণসমূহের ভূমিকা ও প্রভাবের বিষয়টি উদ্‌ঘাটনের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদন করে। আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার পুনঃনির্মাণে বর্তমান বিতর্কের বিষয়টিকে আধিপত্য বিস্তারকারী পাশ্চাত্য উৎপাদন কাঠামোর ওপর তখনো সীমাবদ্ধ থাকতে দেখে তিনি বলেন যে, উন্নয়নের পন্থা নির্বাচনে অন্যান্য কৌশলের কথা বিবেচনা করা এবং অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপকরণের কথা চিন্তা করার আজ সময় এসেছে। সিম্পোজিয়ামে আশা ব্যক্ত করা হয় যে, সিম্পোজিয়ামটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি উন্নয়নে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বধর্মের (ইসলাম) প্রভাবের ওপর আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্তমান অবস্থাকে সংশোধনের নিমিত্তে একটি পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং এই সিম্পোজিয়ামের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী দর্শন ও জ্ঞানের প্রচার, যাতে একটি নতুন, অধিকতর প্রগতিশীল ও অধিকতর ন্যায়ভিত্তিক বিশ্ব-ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য সামাজিক নীতি নির্ধারণে মূল্যবান অবদান রাখা সম্ভব হয়।

সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ তিনটি বিশেষ বিষয়ের ওপর তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন। বিষয়গুলো হলো ঃ (১) ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি ও ভবিষ্যৎ (২) রাষ্ট্র ও সমাজ ঃ ইসলামী বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ অন্বেষণ (৩) অর্থনীতি ও উন্নয়ন ঃ ইসলামী সমাজ ও একটি নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা। এ সব বিষয়ের ওপর উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলো, আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনসহ এ গ্রন্থে প্রকাশ করা হলো। এসব প্রবন্ধে এবং প্রতিবেদনে প্রকাশিত মতামত লেখক ও অংশগ্রহণকারীদেরই। এগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন মতামত নয়।

আশা করা যায় যে, সিম্পোজিয়াম ইসলাম ও সামাজিক নীতির ওপর একটি বৃহত্তর প্রকল্প গ্রহণ করবে যার ওরিয়েন্টেশন ও কর্মসূচী এ সভায় আলোচিত হয়েছে।

সিম্পোজিয়ামে পঠিত প্রতিটি আর্টিকেলই বিশ্বমানের তবুও পঠিত আর্টিকেলগুলোর মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বাছাইয়ের পর IILS কর্তৃপক্ষ মাত্র নয়টি আর্টিকেল বই আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

প্রফেসর আব্দুল বারী স্যারকে

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ধর্ম, বিজ্ঞান ও শিক্ষা, পুরনো বিরোধিতার মুখে সমসাময়িক ইসলাম	মুহাম্মদ সোইসি	৯
আধুনিকীকরণ বনাম পাশ্চাত্যকরণ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	গাউস আনসারী	১৯
সংস্কারবাদ হতে ইসলামী বিপ্লব	হিশাম জায়িত	৩৪
ইসলামে কর্তৃত্ব, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি অধিকার	ইসাত ক্যাম	৪২
ইসলামী সমাজে নারী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার	শাহজানান শাকারচি ইয়াসীন	৫০
ইসলাম ও শ্রমিক	ইসমাইল আর আল-ফারুকী	৭৫
ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা	মুহাম্মদ আহমদ সাকর	৯৯
অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী পদ্ধতি	সাইয়েদ নওয়াব হায়দার নকভী	১১২
ইসলামী ব্যবস্থায় উন্নয়ন কৌশল ভাবনা	খুরশীদ আহমদ	১২২
আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার		১৪০

www.pathagar.com

ধর্ম বিজ্ঞান ও শিক্ষা

পুরনো বিরোধিতার মুখে সমসাময়িক ইসলাম

মুহাম্মদ সোইসি•

ইসলাম ও বিজ্ঞান

পড় তোমার প্রতিপালকের নামে,
যিনি সৃষ্টি করেছেন-
সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্ত পিন্ড থেকে।
পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত,
যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে,
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতোনা। (কুরআন ৯৬:১-৫)*

মুসলিম শাস্ত্রমতে কুরআনে এগুলোই সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ যা শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা জিবরাঈলের নিকট থেকে রাসূল (সা) লাভ করেছিলেন। অন্যভাবে বলা যায়, ইসলামের প্রথম শিক্ষা জ্ঞানের সমস্যার ওপরই কেন্দ্রিভূত। আর বিজ্ঞানের প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য ইসলামের জরুরী আহবান রয়েছে।

প্রথম যা "পড়তে" হবে তা হলো আল্লাহরই নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনী আইনের শিক্ষা। যুগ যুগ ধরে ইসলামে বিজ্ঞানের ধারণাকে কখনো পূর্ণভাবে কখনো সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কারো কারো নিকট বিজ্ঞান ছিল কালামের (ধর্মতত্ত্ব) জ্ঞান আর অন্যদের কাছে ন্যায়শাস্ত্র ও ফিকহ্ বিশেষ। আবার কারো কারো কাছে তা কুরআন ও *হাদীসের* বিজ্ঞান।

হিজরীর দ্বিতীয় শতক থেকে বিজ্ঞানকে জ্ঞানের সকল দিকে সম্প্রসারিত করা হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় কুরআনে ৭০০টি আয়াতে ধাতুর (Root) উল্লেখ রয়েছে। যদি একই ধাতু সম্বলিত আয়াতগুলো দু'বার, তিনবার বা চারবার পুনরাবৃত্তি করা হয় তা হলে ২০০০ স্থানে এর উল্লেখ দেখা যাবে।

"ওহে তোমাদের যাদের চক্ষু আছে, তোমরা শিক্ষা (ই-তা বিরু) গ্রহণ কর" কুরআনে বারংবার এর উল্লেখ রয়েছে। মুসলমানদের জন্য বিজ্ঞান হলো পর্যবেক্ষণ (*রুইয়া*) ও প্রতিফলন (*রে*) : উভয়ের সম্মিলন *(মুসাহাদানাজর)*, যেমন, বাস্তব ও ভাবমূলক বিজ্ঞানের সমন্বয় বা জ্ঞানের বস্তুগত উৎস ও বুদ্ধিগত দিকের প্রয়োজনীয়তা পূরণকে মুসলিম পন্ডিতগণ ইতিবার বা পরীক্ষা (Experiment) বলে অভিহিত করেছেন।

• ড. মুহাম্মদ সোইসি-তিউনিস ইউনিভার্সিটি, তিউনিস

* যে সব স্থানে কুরআনের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেখানে বন্ধনীতে প্রথমে সূরা ও পরে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, এ জন্য প্রথমবারের পর কুরআনের নাম ব্যবহার না করে গ্রন্থের অন্যত্র শুধু বন্ধনীতে প্রথমে সূরা ও পরে আয়াত নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ইবন রুশদ্-এর মতে "ধর্মীয় আইন মানুষকে সৃষ্টি সম্পর্কে পরীক্ষা করতে ও মুক্তির মাধ্যমে জ্ঞানান্বেষণ করতে সচেতন করে তোলে"।

রূপ তাগিদ আছে বলেও জানা যায়, "জ্ঞানান্বেষণের জন্য প্রয়োজন হলে চীনে যাও।"

বিজ্ঞান এভাবে মুসলিম সমাজের জন্য একটি সমষ্টিগত উদ্যোগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। খলিফা, মন্ত্রী এবং রাজদরবারের সকল অমাত্য বৈজ্ঞানিক অবজারভেটরী, হাসপাতাল ও স্কুল নির্মাণের জন্য বড় রকমের অর্থ সাহায্য করতেন। ধর্মীয় বৈষম্য, সামাজিক মর্যাদা বা গোত্রীয় বৈষম্য-এ সবকিছুর কথা ভুলে গিয়ে সবার নিকট জ্ঞানকে পৌঁছে দেয়ার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এ উদ্দেশে সকল ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করা হয়। মানুষ শুধুমাত্র তথাকথিত ইবন অন নাদিম কর্তৃক উল্লিখিত ফাইরিস্ট বা ইবন আবী উসায়বীয়া কর্তৃক উল্লিখিত উয়ুন আল আনবা গ্রন্থে পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক সম্পাদিত কৃতকর্মের উপমাই দিত। এর উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির নিমিত্তে কি পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা তারা দিয়েছিলেন তা তুলে ধরা এবং খোলা মন ও সহিষ্ণুতার পরিধি জানার জন্যই বিভিন্ন শাসকের বক্তব্য উদ্ধৃত করা।

মুসলিম হোক বা না হোক জ্ঞান অর্জনে তখন প্রত্যেকেরই অধিকার ছিল। অনেক বিদেশী বিজ্ঞানের সুবিধা আদায়ের জন্য ইসলাম অধ্যয়ন করেন। আব্বাসী মতাদর্শে দীক্ষিত কোন কোন যিম্মী আরবী সংস্কৃতির রাজ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ করেন।

এক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই উয়ুনুল আনবা গ্রন্থে ২৬৩ ও ৬৪৬ হিজরীর মাঝামাঝি (৮৭৬ ও ১২৪৮ খ্রী) অর্থাৎ ৪ শতাব্দীর কম সময়ের মধ্যে ১৫জন নেতৃস্থানীয় খৃষ্টান ডাক্তার ও ২০জন নেতৃস্থানীয় ইহুদী ডাক্তার খলিফাদের নিকট (বিশেষ করে মিশর ও সিরিয়ার ফাতেমীয় ও আইয়ুবী খেলাফতের সময়) প্রভূত সম্মান লাভ করেন।

এর পরও আব্বাসী এবং আল-মনসুর ও আর-রশীদের আমলে এমন বহু ডাক্তারের নাম শোনা যায় যারা রাজদরবারে বেশ মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে সম্মান ও সম্পদ উভয়ই লাভ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ গ্যাব্রিয়েল বাখতিদু-এর নাম উল্লেখ করা যায় যিনি খলিফা আর-রশিদের নিকট থেকে ২৩ বছর ধরে গড়ে বাৎসরিক এক মিলিয়ন দিরহাম অর্জন করেছিলেন। হজ্জের সময় খলিফার সেবকদের মধ্যে তিনি একজন ডাক্তার ছিলেন।

একবার খলিফা গ্যাব্রিয়েলকে কৌতুকবশতঃ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "গ্যাব্রিয়েল! তুমি কি জান তুমি আমার চোখে কোন্ স্থানটুকু অধিকার করে রয়েছো ?" উত্তরে গ্যাব্রিয়েল বললেন, "অবশ্যই প্রভু, আমি জানবোনা কেন?"

www.pathagar.com

খলিফা বললেন, "আল্লাহর শপথ, আরাফাতে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি অনেক দোয়া করেছি"।

এরপর বানু হাশিমের দিকে ফিরে খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, "এর বিরুদ্ধে তোমাদের কি কিছু বলার আছে?" তারা উত্তরে বললেন, "না প্রভু, তিনি যে একজন যিম্মী।"

খলিফা বললেন, "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমার স্বাস্থ্য ও শরীর ভাল থাকা তার ওপরই নির্ভর করছে। এটা সমগ্র মুসলমানের স্বার্থেই, তার জীবন ভাল থাকার ওপরও তা নির্ভর করছে।"

বানু হাশিমের লোকজন তখন সমস্বরে বলল, " হে বিশ্বাসীদের রাজপুত্র, আপনি অবশ্য অবশ্যই ঠিক বলেছেন।"

এই ছিল ইসলামী আচরণ যেখানে বিজ্ঞানকে সুন্দররূপে ধারণ করা হয়েছিল। ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার ও প্রচারের জন্য ইসলামের অনুসারীদের প্রচেষ্টা ছিল, যেন পণ্ডিত ব্যক্তিগণ মরে গেলেও তাদের কৃতকর্ম মানুষের মাঝে বেঁচে থাকে।

ভারতের কোন কোন ধর্মের মানুষ মৃত্যুর পর দেহান্তর প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে থাকে। তাদের ধারণা মৃত ব্যক্তির আত্মা পৃথিবীতে এসে অন্য ব্যক্তির মধ্যে স্থান লাভ করে। কিন্তু মুসলমান পণ্ডিতদের নিকট আসল জন্মান্তর হল আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন যেখানে পূর্ব প্রবংশের কর্মের দ্বারা পরবর্তী প্রবংশ উপকৃত হয়।

বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের এক আশ্চর্য ক্ষেত্র

ইসলামে বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের যে সম্পর্ক তাকে নেতিবাচকভাবে না দেখে ইতিবাচকভাবে দেখা হয়। নিজস্ব গন্ডিতে নিজকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্যই এ ব্যবস্থা। কেননা কোন কিছুকে মন্দ বললে সংকট সৃষ্টি হয়। ইসলামের সমসাময়িক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ন্যূনপক্ষে এ সত্যটাই প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্বাস বা আশা পণ্ডিতদেরকে ইহজগতে বাঁচিয়ে রাখে। বিজ্ঞান প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ রহস্য উদ্‌ঘাটন করে সত্য প্রতিষ্ঠা করে। এরপরও বস্তুগত বিষয়কে অস্বীকার করে কখনো কখনো সন্ন্যাস জীবন যাপনের ওপর যে আস্থা দেখা যায়, পৃথিবী থেকে সে আস্থাটাকে একেবারে উচ্ছেদ করে ফেলা হয়নি।

মুসলিম নীতির কথা হলো, "পৃথিবীতে যখন বাস কর তখন তুমি এমনভাবে কাজ করবে যেন তুমি সারা জীবনই বেঁচে থাকবে।" আর এ পৃথিবীর পরের জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা বলেন, "এমনভাবে কাজ কর যেন আগামী কালই তুমি মরে যাবে।"

www.pathagar.com

একটা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টির জন্য শান্তিময় মাধ্যম অর্জন করতে পারাটাই মুক্তি। সমাধান নির্ভর করে মধ্যপন্থার মধ্যেই। "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবেন।" (২ঃ১৪৩)

তবে ইসলামে যে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয় তা একেবারে অনমনীয় ভারসাম্য নয়। কেননা স্থবিরতা মৃত্যু বা ধ্বংস ডেকে আনে। অপরপক্ষে কুরআনের সমুজ্জ্বল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে একটি প্রশ্ন অহরহ থেকেই যাচ্ছে। কেননা বিরাজমান মৌলিক নীতিগুলি ছাড়া বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মের অবিরত বিবর্তন ঘটছেই। এখানে বিজ্ঞানের অবদান চিরদিনই একটি আপেক্ষিক ব্যাপার হয়ে থাকছে। কেউ এটা দাবী করতে পারেনা যে, সে মহাবিশ্বের গুপ্ত গ্রন্থের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছে। সিদ্ধান্ত যতই ঠিকঠিক বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে ততই সত্যের নিকট পৌঁছার জন্য অহরহ চেষ্টা চলছে। আর যতই সত্যের দিগন্তের কাছে পৌঁছার চেষ্টা চলছে, ততই সত্য দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আর রহস্যাবৃত জিনিসটা চিরতরে দূরে সরে থাকছে। পণ্ডিতদের হতাশা একটা চিরাচরিত ব্যাপার। হাদীসে বর্ণিত আছে "দু'জন অনুসন্ধানকারী কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে না, একজন অর্থের অনুসন্ধানকারী। আরেকজন জ্ঞানের অনুসন্ধানকারী"।

এ হতাশা একজন বিজ্ঞানী ও একজন ধার্মিকের মধ্যে সমান। এজন্য তাদের অধ্যবসায়ই সাধারণত দায়ী। অহরহ প্রচেষ্টার পর তাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে যে, সত্য উদ্‌ঘাটনে চেষ্টার অগ্রগতি শুধু সম্ভবই নয় বরং অবধারিত ভাবেই তা সম্ভব। মানুষের জন্য সত্য একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির থাকার ব্যাপার নয়। তবে তা অল্প অল্প করে মানুষের চেষ্টার বিনিময়েই প্রজ্জ্বলিত হয়। মানুষের চেষ্টা সাধনা দ্বারা যা সম্ভব মানুষ তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে। আর তাই আলোকে পাওয়ার আকাংখা বা আলোর পিপাসা এক ধরনের গুপ্ত জিনিস আবিষ্কারের শিশুসুলভ আনন্দ ছাড়া কিছুই নয়।

এ প্রসংগে আল-বিরুনী বলেন, "একজন তৃষ্ণার্ত মানুষ পানি দেখে যেভাবে আনন্দ অনুভব করে আমিও জ্ঞান চর্চায় সে আনন্দ অনুভব করি।"

মানুষের জ্ঞানের আপেক্ষিকতা ও স্বর্গীয় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব

সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছার জন্য ত্রুটি এড়িয়ে চলতে হবে ও ঝুঁকি থেকে দূরে থাকতে হবে। কেউ শুধুমাত্র "কারণের দীর্ঘ শৃংখলের " ওপর নির্ভর করে চলতে পারে না যা শাশ্বত যৌক্তিকতা ও অব্যর্থ লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে বলে ধারণা করা হয়।

www.pathagar.com

এখনো অনেক ক্ষেত্র রয়ে গিয়েছে (জীবন, সমাজ, ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অধিবিদ্যা) যেখানে বুদ্ধিগত গঠন ও যৌক্তিক পদচারণা খুব কমই সার্থক প্রমাণিত হয়েছে। এ সব বিষয় বুঝে কাজ করার জন্য অন্যান্য পন্থা অনুসরণ করতে মানুষের বিচক্ষণতা, বৈষম্য বিচার এবং দন্ড ও বিচার বিবেচনার ক্ষমতা থাকতে হবে। যুক্তি ও কারণ বহির্ভূত অন্যান্য শক্তি মানুষের কার্যাবলীকে নির্দেশ করে ও নতুন কিছু আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত করে। এগুলো হলো সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি, সৃজনশীল সত্তা, দৈব ঘটনা ও ঐশ্বরিক ক্ষমতার নয়া শক্তি।

আধুনিক পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতির বর্ণনার পর ইবনে হাইসাম তার এসব শক্তি সম্পর্কে উপসংহারে বলেন ঃ

> যে সত্য আমাদের হৃদয়ে আনন্দ এনে দেবে
> সে সত্য অর্জন করে আমাদের কর্তব্য শেষ করতে পারি। ধীরে ধীরে আমরা টের পাওয়া না যায় এমনভাবে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি ও সত্য লাভ করতে পারি। সাবধানতা ও সমালোচনামূলক মনোভাব নিয়ে কোন দ্রব্যের প্রকৃত চরিত্রের ওপর আমরা হাত রাখতে পারি, যে সম্পর্কে কোন যুক্তি বা বিভ্রান্তি থাকতে পারে না। আমাদের গবেষণা কার্যক্রমে সকল শক্তি (বুদ্ধিগত বাস্তবতা) নিয়োগ করার পরও মানবজাতির ভেতরে যে সুপ্ত ত্রুটি রয়ে যায় তা থেকে আমরা নিজদেরকে নিরাপদ ভাবতে পারি না।

একমাত্র আল্লাহর কাছেই আমরা সকল কাজে সাহায্য কামনা করি (আল মানাজির কর্তৃক বর্ণিত ভূমিকা)।

আবারও উল্লেখ করতে হয় যে, "মুসলমানদের বিশেষ মনোভাব কঠোর খাটুনী ও স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্ব পালনের পর সব কিছুতে আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে ও একমাত্র একজনের শ্রেষ্ঠত্বের অস্তিত্বই আবিষ্কার করে। এখানে মানুষের চেষ্টার কোন শেষ নেই। যদি আদম সন্তানগণ আল্লাহর রাজত্বের ওপারে যা রয়েছে সেখানে পৌঁছতে চেষ্টা করতো তাহলে তারা কৃতকার্য হতো।" আসল ব্যাপারটা হলো, বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলা। যা তুলনা করা যায়না তা থেকে দূরে থাকা। আল্লাহর আদেশ থেকে মানুষের আদেশকে পার্থক্যের দৃষ্টিতে দেখতে শেখা।

"দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে প্রয়োজন" এই কথা বলতে গিয়ে লুই পারডেট বলেন ঃ

> "একটি বিষয়কে আরেকটি বিষয়ের ন্যায় একই মনে করো না। কোন কারণে কোন দ্বন্দ্ব বা গোপনে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তার নিকট যেওনা। আমি কখনো তার যা নেই তা আশা করে তার নিকট যাই না। বরং যা আমার নেই তা গ্রহণ করতে তার নিকট যাই। যা আমার নিকট বেশ খাঁটি বলে মনে হবে তার জন্যই আমি তার নিকট যাই।"

www.pathagar.com

মানবীয় বিজ্ঞান দ্বারা সৃষ্টির কোন জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। তবে অনবরত গভীর গবেষণার দ্বারা প্রকৃত সত্তাকে আবিষ্কার করা যায়। প্রকৃত সত্তাটাকে দেখাই উদ্দেশ্য কিন্তু এটা কোন তত্ত্ববিদ্যা নয়। বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির ফলে প্রযুক্তির উচ্চ পর্যায়ের অগ্রগতি সাধনের পরও আধুনিক বিজ্ঞানে বস্তুর প্রকৃতি এখনো অগম্য। তাপগতি বিদ্যার (Thermodynamics) সূত্র সম্পর্কে গবেষণা করা হয়েছে। আলোক বিদ্যার পরীক্ষার ফলাফল মাপা হয়েছে এবং এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সঠিকভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলাফল জানা হয়েছে কিন্তু এসব ঘটনার মূল বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞান কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। তাহলে কি কোন মুসলিম অনুসন্ধানকারীকে কোন আবিষ্কারের কারণের ক্ষেত্র সম্পর্কিত সীমারেখা টেনে দেয়ার জন্য দোষ দেয়া যাবে ?

মানুষের বুদ্ধির জগৎটা সীমাবদ্ধ। "প্রাকৃতিক বিশ্বে মানুষকে তার জ্ঞানের পরিধির মাঝেই বিবেচনা করা হয়।" অতি-প্রাকৃতিক বিষয় তার সাথে প্রতারণা করে। সভ্যতার বর্তমান অবস্থায় আমাদের জীবনের শুরু ও শেষ সম্পর্কে বিজ্ঞান আমাদেরকে জ্ঞান দান করতে অক্ষম। সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়টা মানুষের নিকট বোধগম্য হতে পারে না, কারণ এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকটই সংরক্ষিত।

আর সেজন্যই আমাদের প্রথম কাজ হবে আমাদের আসল প্রকৃতিকে স্বীকার করা। তারপর আমাদের ক্ষমতার প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা। জটিল বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণের পদ্ধতি, বিভিন্ন পদার্থের একত্রিকরণ, সমন্বয় ও প্রতিপাদন সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রটা পরিমিত ও সীমাবদ্ধ। একমাত্র আল্লাহই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমরা তাঁর নিকট পৌঁছতে চেষ্টা করি যদিও কখনো পৌঁছতে পারি না। তিনি আমাদের নাগালের বাইরে অবস্থান করেন। "আমরা আল্লাহর রাজত্বে বেঁচে আছি আর তাঁর নিকটই আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

ইবনে খালদুনের মতে, "যুক্তি বুদ্ধিই হলো প্রকৃত ভারসাম্যের ব্যাপার। এর বিচার বিশ্লেষণ প্রশ্নাতীত ও প্রতারণামুক্ত। তবে ধর্মতত্ত্বের সাথে একে পরিমাপ করার প্রত্যাশা করার কোন কারণ নেই। পরকাল, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃতি বা আল্লাহর গুণাবলী ও অন্যান্য সবকিছুই এর আওতার বাইরে থাকবে। ঐ প্রতারণা এখানে ব্যর্থ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে স্বর্ণ পরিমাপের জন্য পাহাড় মাপায় ব্যবহৃত পাল্লা ব্যবহার করা যাবে বলে মনে করে থাকে।" *(মুকাদ্দিমা* ৪৬০-এ, কায়রো সংস্করণ)

তিনি বলেন, "অস্তিত্বশীল সত্তা সম্পর্কে মন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে পারে ও আল্লাহর সৃষ্টির সবকিছু উপলব্ধি করতে সক্ষম" -মনের এ দাবী বিশ্বাস করো না।

মনে রেখো, শৈশবকালে প্রত্যেকে মনে করে যে, সে তার বুদ্ধিজ্ঞান দ্বারা অস্তিত্বের

www.pathagar.com

সবকিছুই বুঝতে পারে। কোন কিছুই তার বুদ্ধিকে ফাঁকি দিতে পারে না। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ভিন্ন। সে যা বুঝতে পারে তার চেয়ে সত্যটা অন্যরকম।" (*মুকাদ্দিমা* ৪৫৯)

প্রকৃত সত্য কথা বলতে গিয়ে ইবনে খালদুন একটি সত্যের অবতারণা করে বলেন, "এমন কিছু বুঝতে সক্ষম হবেনা যা ইতিপূর্বেই বুঝার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে।"

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সহিষ্ণুতার মূল্যায়ন

উদ্ভাসিত সত্য মানুষের স্বীকৃতি লাভ করে থাকবেই। কিন্তু ঐটাই চূড়ান্ত নয়, এর পাশাপাশি অন্য সত্যও বর্তমান থাকতে পারে। একটা ঘটনাকে বুঝানোর জন্য অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হতে পারে।

> ইবনে হাইসাম বলেন, দু'টা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব যদি প্রচলিত থাকে, এর মধ্যে একটা ঠিক হবে, অন্যটা হবে ভুল বা উভয়টাই ভুল হবে। সত্যটার অবস্থান হবে অন্যত্র বা অন্যভাবে বলতে গেলে উভয়টার ফলই হবে একরকম। কোন একটা সত্য হবেই। তবে একটি বা অপরটির সমর্থক কেউ কোনটার ওপরই গবেষণা চালায়নি, যার ভিত্তিতে উভয়টার ব্যাপারেই একটা সিদ্ধান্তে পৌছা যাবে। এর ফলে, একদল একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে। অন্যদল উপনীত হওয়ার পূর্বেই মাঝপথে থেমে গেছে। যার ফলে, দু'টো পথের মধ্যে যে পার্থক্য তা শুধু আপাতঃ স্পষ্টই রয়ে গেছে, আর যদি গবেষণাই পরিচালনা করা হতো, ফল হতো একই রকম। (*আল-মানাযিরের ভূমিকা*)

একই সম্পর্কের কারণে ভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আসলেই ভিন্ন নয়। শুধুমাত্র প্রকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই ভিন্নতার সৃষ্টি করে। সূর্যের (দশম শতাব্দীতে) চারদিকে পৃথিবীর ঘুর্ণন সম্পর্কে আলবিরুনী বলেন ঃ

> পৃথিবীর ঘুর্ণন কোন অবস্থাতেই জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় হিসাব নিকাশকে বাতিল করে না ('গতিহীন পৃথিবীই বিশ্বের কেন্দ্রস্থল-এ ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত সত্য') যেহেতু অপর যেকোন তত্ত্বের ন্যায় দৃশ্যমান সকল অবস্থাকেই একটি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা যায় ...

একটি তত্ত্ব বা ধারণার গুরুত্বকে তার পারস্পরিক সংহতির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায়। একগুচ্ছ সত্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য শুধুমাত্র বৈষয়িক মূল্যমানের প্রয়োজন।

পূর্ববর্তীদের ন্যায় একজন মুসলিম পণ্ডিত বা একজন ধার্মিক মুসলিমের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো সহিষ্ণুতা, চিন্তার স্বাধীনতার ফলে যার সৃষ্টি। আল-মনসুর মালিক বিন আনাসের নিকট বলেন যে, তার আল মাওয়াত গ্রন্থে যে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ রয়েছে তা বাধ্যতামূলক (Compulsory) করতে হবে। সুযোগ দেয়ার আইন

www.pathagar.com

অনুযায়ী যেকোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকেই ঈমানদারদের অনুসরণের কথা বলে খলিফাকে অনুরোধ জানিয়ে মালিক বিন আনাসের গ্রন্থের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাবকে আল-মনসুর প্রত্যাখ্যান করেন।

মৌলিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান ঃ সমসাময়িক ইসলাম ও প্রযুক্তি বিদ্যা

শব্দার্থগত পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করলে দেখা যায় তিনটি বর্ণ (CLM) তাদের ভিন্নরূপ স্থান পরিবর্তনের ফলে (CML : LMC) একই অর্থ জ্ঞাপন করে। যার ফলে মুহাসিবি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "যুক্তি হলো আলো (LMC) আল্লাহ তা একটি আত্মার ওপর নিক্ষেপ করে তাকে সক্রিয় (CML) করে তোলেন। তাতে সে সবকিছু হৃদয়ঙ্গম (CLM) করতে পারে।"

বিজ্ঞান বা অনুশীলন এ দু'টোর কোনটা বেশী মূল্যবান ? এ প্রশ্নের উত্তরে ইবনে সিবাব বলেন, "অজ্ঞদের জন্য বিজ্ঞান, আর বিজ্ঞানীদের জন্য অনুশীলন।"

সুতরাং মুসলমানগণ তাত্ত্বিক বিজ্ঞান থেকে অনুশীলনের দিকে অগ্রসর হয় আর তার ঈমান হলো "আন্তরিক আনুগত্য ও দৈহিক ক্রিয়াকলাপ"। মুসলিম যুগের দিকে তাকালে দেখা যায় পর্যবেক্ষণ ও প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক ফলাফল ছিল বাস্তব ধরনের। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্যই এর প্রয়োজন ছিল। এছাড়া সঠিকভাবে নামাযের সময় নির্ধারণ বিশেষ করে মাগরিবের নামাযের সময় ঠিক করার জন্য দিনের দৈর্ঘ্য, রামাযানের দিনের দৈর্ঘ্য, বিভিন্ন পর্বাদির তারিখ স্থিরকরণ, বিশেষ করে রোযার দিনে ইফতারের সময় ও হজ্জের সাথে সাথে কুরবানির ঈদের সময় নির্ধারণের জন্য এর প্রয়োজন ছিল।

এর ফলে মুসলিম বিজ্ঞানকে একটি স্বার্থবাদী বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ এতে সাধারণ তত্ত্বের কোন ব্যবস্থা নেই। এরূপ উদাহরণ অনেক রয়েছে যেগুলোর নাম করা প্রাসঙ্গিক হবে না। তা সত্ত্বেও এ অভিযোগ খন্ডন করার জন্য আমরা প্রশ্ন রাখবো ঃ "এরূপ তথাকথিত স্বার্থবাদী বিজ্ঞান কি পৃথিবীর বস্তুগত দ্রব্যের ওপর অধিকার কায়েম করতে পেরেছে ? বর্তমান বস্তুগত দ্রব্যসমূহের ওপর ক্ষমতা বিস্তারের লক্ষ্যে পরিবেশের ওপর আধিপত্য কায়েমের জন্য কি তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে ?"

এখানেও আমরা ইসলামের বিশেষ আশ্চর্যজনক নৈতিক ভারসাম্যগত দিক লক্ষ্য করি। অর্থাৎ ভাবমূলক এবং তত্ত্বগত চিন্তা ও বস্তুগত প্রয়োগের মধ্যে এর সমদূরত্বমূলক অবস্থান।

বর্তমান শতাব্দীতে মানুষ যখন যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে এবং প্রযুক্তিই যখন সকল শক্তির মূল, তখন বস্তু ও মনের ওপর ইসলামের যে প্রভাব রয়েছে তা স্মরণ করা অনর্থক নয়।

www.pathagar.com

যান্ত্রিক সমাজ আরাম সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু মন সৃষ্টি করতে পারে না। আর মন ব্যতিরেকে কোনো প্রতিভাও নেই। যে সমাজের কোন প্রতিভা নেই সে সমাজ ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য (ভার্জিল জরজিউ ঃ The Twenty Fifth Hour)।

আমাদের যান্ত্রিক সমাজে মানুষ মনুষ্যত্ব থেকে দূরে সরে পড়েছে। সে একটি যন্ত্রের পিস্টনের ন্যায় যার সবগুলো খাঁজই সমান ও একই রকম। সবগুলোই যান্ত্রিক নিয়ম অনুসরণ করে। কোনটিই স্বাধীনভাবে তার নিজ নিজ ভূমিকা পালনের ক্ষমতা রাখে না। প্রত্যেকটিই তার নিয়ম অনুসারে যন্ত্রের অন্যান্য অংশের অনবরত ঘুর্ণনের সাথে জড়িত।

মৌলিকভাবে করণীয় হলো মানুষের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা। শান্তি ও মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টিকারী আত্মভারসাম্যের দিকে ফিরে যেতে পারলেই এ যান্ত্রিকতাকে দূর করা যায়।

মানুষ একটি পিস্টন নয় বা একটি চাকার খাঁজও নয়। "আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি" (১৭ ঃ ৭০)। সুতরাং তাকে তার মর্যাদা বজায় রাখতে হবে। মানুষকে প্রযুক্তির সেবাদাসে পরিণত না করে মানুষের সেবা করার জন্যই প্রযুক্তির সৃষ্টি করতে হবে। বিশ্বে যে রূপান্তর ঘটছে, সেটাকে বর্তমান ও সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্য মানুষের বাসোপযোগী পরিবেশে পরিণত করতে হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের সম্পত্তির শেষ হয়ে যাওয়া, ব্যাপক বায়ু দূষণ এ সবই নৈতিকভাবে অবৈধ, যদি কোন অর্থনৈতিক কারণে তা করা না হয়। কারণ ঐ বিনষ্টকরণ প্রক্রিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সবার সম্পদ ধ্বংস করে দিচ্ছে।
সবচেয়ে বড় কথা, সমসাময়িক ইসলামের আহ্বান হলো মর্যাদা যা আল্লাহ মানুষের মধ্যে পয়দা করে দিয়েছেন।

এ ধরনের মর্যাদায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বক্তব্য দানের স্বাধীনতা, গতিবিধির স্বাধীনতার ন্যায় সব ধরনের স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত। পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে স্বাধীনতা অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। মুসলিম প্রথা অনুসারে কিছুতেই তা হতে পারে না। মানুষের দ্বিতীয় গুণ তথা মানুষের সহজাত মর্যাদাবোধের মধ্যেই নিহিত। তাছাড়া ব্যক্তিগত ন্যায়বোধ, সামাজিক ন্যায়বোধ ও আন্তর্জাতিক ন্যায়বোধের মাধ্যমেই মানুষের এ জাতীয় সহজাত মর্যাদার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ইসলামী বিশ্ব শীঘ্রই তার নিজের জন্য ন্যায়বোধে উদ্বুদ্ধ গতিশীল সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠার চেয়ে রাজনৈতিক নির্ভরশীলতার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। উদাহরণস্বরূপ তিউনিসিয়ায় পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের ব্যক্তিগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা (আগস্ট ১৯৫৬) করা হয়েছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সবার জন্য শিক্ষা,

www.pathagar.com

সবার জন্য সমাজকল্যাণ, বঞ্চিত ও বৃদ্ধদের জন্য সাহায্য, উন্নততর বেতন ও আরো অনেক কিছুর জন্য তিউনিসীয় সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এছাড়া বহির্বিশ্বে ইসলাম তার প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ধারে নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিদেশী কোম্পানীর বেলায়ও জাতীয়করণের অনুরূপ অধিকার আদায়ে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী বিশ্বের এ দাবিগুলো একযোগে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। এর মধ্যে রয়েছে একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। সকল উন্নয়নশীল মুসলিম দেশ এ প্রচেষ্টার অংশীদার। এ অর্থ ব্যবস্থাটা হবে বর্তমান অর্থ ব্যবস্থা অপেক্ষা ন্যায়ভিত্তিক। এ অর্থ ব্যবস্থার সাহায্যে ঐ সকল দেশ তাদের রপ্তানী আয় স্থিতিশীল করতে ও কাঁচামালের মূল্য ধরে রাখতে পারবে। এ আবেদনটা যেমন অন্তরের অন্তস্তল থেকে করা হয়েছে তেমনি এর পেছনে যুক্তিও রয়েছে। কাঁচামালের উৎপাদকরা সার্বিক বিশ্বাসে এর ব্যবহারকারীদের নিকট তাদের দ্রব্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে চায়। এ বিশ্বাসে যে এর পরিবর্তে তাদের প্রযুক্তিতে তাদের প্রবেশাধিকার থাকবে।

সবার ওপরই সবার অধিকার রয়েছে। বস্তুতপক্ষে উৎপাদনের কিয়দংশ দরিদ্র দেশগুলোকে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র ও রোগ দূরীকরণে দিয়ে দেয়া হয়।

কোন শর্তারোপ ছাড়া খোলাখুলিভাবেই দরিদ্র দেশগুলোকে তা দেয়া হয়। ওয়াদা করার নেক দিকের প্রতি ইসলাম একান্তভাবে বিশ্বাস করে। আমরা যেমন আশা করতে পারি কিছুসংখ্যক অংশীদার ইসলামে যাদের বিশ্বাস রয়েছে তারা কখনো অস্বীকার করতে পারবেনা যে, সর্বোপরি বহুজাতিক কোম্পানী বা অন্য কোন নব্য ঔপনিবেশিক উদ্ভাবনের মাধ্যমে আস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতিকে ম্যাকিয়াভেলী পদ্ধতিতে বিশ্বাসঘাতকতা করে নস্যাৎ করে দেয়া যায় না।

"ঈমানদার দু'বার একই ফাঁদে পা দিতে পারে না।"

মুসলিম জাতির জন্য এখনো কি সে চূড়ান্ত সময়টা আসেনি যে মুসলিম জাতি আটটি শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ? আধুনিক বিশ্বের সাথে মানব মনের চমৎকার পরিবর্তনের সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সময় এখানো কি মুসলমানদের আসেনি ?

বংশ পরম্পরাক্রমে কর্মক্ষেত্রে যে অনেক মানুষ আসছে তা কি শুধু মনের মিলের বাসনা ? একতার শৃংখলকে অক্ষত রাখতে এটা প্রবলতর আকর্ষণ নয় কি ? মানব জাতি যে এক সে সুদৃঢ় আস্থা আর সে ঐক্যের আলোকবর্তিকা মান-মর্যাদাকে স্থায়ী ও চিরদিন সমুন্নত রাখতে পারে তা কি এক জাতি হতে আরেক জাতিতে স্থানান্তরিত হচ্ছে না ?

---

www.pathagar.com

আধুনিকীকরণ বনাম পাশ্চাত্যকরণ
ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী

গাউস আনসারী*

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে আধুনিকীকরণের বিষয়টি পাশ্চাত্যকরণের সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণের জন্য এ দু'টি পারস্পরিক নির্ভরশীল পদ্ধতির নির্দিষ্ট পার্থক্য নির্ণয় দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্যের সমার্থক বলার কারণ হলো, বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোও পাশ্চাত্য হতে আধুনিক কলাকৌশল ও দক্ষতা অর্জন করছে।

পৃথিবীতে পাশ্চাত্য প্রভাব বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়ার তিনটি সুস্পষ্ট দিক রয়েছে। যেমন-১. উত্তর আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় ও নিউজিল্যান্ডে ইউরোপীয়দের বসবাস ২. বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন শক্তিশালীকরণ ৩. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আমদানীকৃত বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ।

ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীগণ দেশীয় জনগণকে আবদ্ধ রেখে প্রাথমিক অবস্থায় উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বেশ উন্নত সাংস্কৃতিক এলাকায় তাদের বসতি স্থাপন করে। প্রথম দিকে বসতি স্থাপনকারী ইউরোপীয়দের চলে যাওয়ার বহুদিন পরও কিন্তু ইউরোপীয় ও স্বদেশীদের মধ্যে কোনো সাংস্কৃতিক আদান প্রদান সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্য প্রভাবের দরুণ এ সময়ে নব আবিষ্কৃত অঞ্চলগুলো ইউরোপীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। বর্তমানে এসব এলাকা পাশ্চাত্য দেশ হিসাবে পরিচিত।

আফ্রো-এশীয় দেশগুলোর উপনিবেশিকীকরণ নবাবিষ্কৃত অঞ্চলসমূহ হতে একটি ভিন্ন পদ্ধতির জন্ম দেয় (দেশীয় জনগণকে পুরো বন্দী করে রাখা হয়)। পূর্ব থেকে শিল্পসমৃদ্ধ ঔপনিবেশিক হিসেবে এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের আবির্ভাবের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সাথে একটি দীর্ঘ সাংস্কৃতিক বন্ধন সৃষ্টি হয়। শিল্পসমৃদ্ধ ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের উন্নত প্রযুক্তি ও আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে দু'টো মহাদেশকে বশীভূত করতে সমর্থ হয়। তা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইসলামী ও ভারতীয় সভ্যতার বহু পুরনো উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ এখনো বর্তমান।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল তাদের শিল্পের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশ ও দূরপ্রাচ্যে প্রচুর পরিমাণে

*প্রফেসর গাউস আনসারী-কালচারাল এনথ্রোপলজি বিভাগ, কুয়েত ইউনিভার্সিটি, কুয়েত

www.pathagar.com

কাঁচামালের নিরবচ্ছিন্ন ও সংরক্ষিত সরবরাহ নিশ্চিত করা। দূরপ্রাচ্য ও ইউরোপের বাণিজ্য পথগুলোকে রক্ষা করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের এলাকাগুলো ইউরোপীয় শক্তির নিকট ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুদূর মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে ইউরোপীয় ও অটোম্যানদের মধ্যেকার যুগসঞ্চিত বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড চালিয়ে নেয়াই ছিল প্রাচীন ইউরোপীয় শক্তি ও অটোম্যান সাম্রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা ও মুখোমুখী সংঘর্ষের কারণ। প্রাক-শিল্প ইউরোপ বহু দিন ধরে বরাবরই অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু ইউরোপে শিল্পশক্তির উত্থানের পর শক্তিশালী আর্থ-রাজনৈতিক সংগঠনের অভ্যুদয় ধীরে ধীরে সামন্ততান্ত্রিক মুসলিম শক্তির পতন ডেকে আনে। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে চূড়ান্তভাবে এর পতন হয়। ইসলামী বিশ্বের জন্য অটোম্যানদের খেলাফতকে একটা জীবন্ত শক্তি হিসেবে মনে করা হতো। ধীরে ধীরে এর ক্ষমতা লোপ পাওয়ার সাথে সাথে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে এটা একটা প্রতীকে পরিণত হয়। ১৯২০ সালের প্রথম দিকে অটোম্যানদের ওপর তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের অধিবাসীরা চূড়ান্ত আক্রমণ করে। ফলে খেলাফতের স্বর্ণযুগ চূড়ান্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ফলে তুরস্কে খেলাফতের অবসান ঘটে। কিন্তু অনেকে মনে করে যে, ইসলামী শক্তির শেষ চিহ্নটুকু বিলুপ্ত করতে এটা ছিল পাশ্চাত্য শক্তির প্রচ্ছন্ন আক্রমণ।

বিশেষভাবে তুরস্ক ও ইরানের বেলায় পশ্চিমা শক্তির প্রভাবের তৃতীয় পর্যায়ের কথা খাটে। তারা কখনো সরাসরি ঔপনিবেশিক শক্তির আওতায় আসেনি। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিস্তার ও তা শক্তিশালী করণের সময়েও তারা তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে। সরাসরি জার-শাসিত রাশিয়ার (Czarist Russia) সাথে থাকার জন্য আফগানিস্তানসহ ঐ দেশগুলোতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটানর অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে একটি।

তাদের শিল্পে নিয়মিত কাঁচামাল সরবরাহ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শক্তি দক্ষ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে। তারা শাসক দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত আর্থ ব্যবস্থারও উন্নয়ন সাধন করে। বর্ধিত বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থা বিস্তার এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তি একটি দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টির তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে। এ সময় অফিস কর্মচারী ও নিম্নশ্রেণীর প্রশাসক হিসাবে বিদেশী শাসককে সহায়তা করার জন্য তাদেরকে পশ্চিমা শিক্ষা ও ঐতিহ্যে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। পাশ্চাত্য প্রভাবিত দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টির উদ্দেশে উপনিবেশগুলোতে একদিকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দেয়। অপর দিকে প্রতিশ্রুতিশীল করণিকদের প্রশিক্ষণের জন্য ইউরোপে প্রেরণের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

এভাবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রশাসন ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার আধুনিকীকরণ এবং নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শহরবাসীদের জন্য পাশ্চাত্যকরণ এক সাথে চলতে থাকে।

আরব উপদ্বীপ ও আফগানিস্তানের জন্য মাত্র এক শতাব্দী পূর্বে আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সরাসরি ঔপনিবেশিক তোষণ এবং ঐ সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অনুপস্থিতিতে যদিও আরব উপদ্বীপের অনেকগুলো দেশ বৃটেনের সাথে বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে তবুও তখন কোনো আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নেয়া হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এরূপ স্থিতাবস্থা (status quo) চলতে থাকে।

আফগান যুদ্ধে উপজাতিগুলোকে কোন সামরিক শক্তির নিকট মাথা নত করান খুবই কষ্টকর ছিল। ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আফগান সরকার অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কোনো সুবিধাই বৃটিশদের প্রদান করেনি। শুধুমাত্র বৃটিশ ভারতের উত্তর সীমান্তের আফগান উপজাতিকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য মাঝে মাঝে সামরিক অভিযান চালানো হত। আজ পর্যন্ত সকল ইসলামী দেশের মধ্যে আফগানিস্তানকেই কেবল অদ্বিতীয় বলা যাবে যেখানে সবচেয়ে কম পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে। আধুনিকীকরণের বর্তমান স্রোতধারায় সুবিধাবাদী সামন্ত পরিবারের ক্ষুদ্র একটা অংশ এবং পশ্চিমা জীবন ধারায় পুষ্ট একটি সীমিত আধুনিক শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই শুধু আফগানদের মূল জীবনধারা থেকে ভিন্ন করে দেখা যেতে পারে।

ইরান ও তুরস্ককেই কেবল পূর্বে উল্লিখিত পশ্চিমা প্রভাবের তৃতীয় পর্যায়ে ফেলা যায়। ইরানের ক্ষয়িষ্ণু কাজার রাজবংশ ১৯২৫ সনে রেজা শাহ পাহলভী কর্তৃক গদিচ্যুত হয়। ৪ বছর পূর্বে ১৯২১ সালে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক পরিচালিত প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন সর্বশেষ অটোম্যান সম্রাটকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়। ইরান ও তুরস্ক উভয় দেশই তাদের ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বৈচিত্র সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নতুন নেতৃত্বের অধীনে সম্পূর্ণ পশ্চিমা ধাঁচে আধুনিকীকরণের অভিন্ন পথে অগ্রসর হয়। যুগ যুগ ধরে পরিচালিত পুরনো রীতি-নীতি, ঐতিহ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা এমনকি ধর্মীয় উপাসনা ব্যতীত উন্মুক্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি সরকারী নির্দেশের মাধ্যমে রাতারাতি বিলুপ্ত করা হয়। বিনিময়ে নতুন ধরনের আচার অনুষ্ঠান, শিক্ষা ব্যবস্থা ও পশ্চিমা ধাঁচের সরকারী প্রশাসন চাপিয়ে দেয়া হয়। তুরস্ক আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। পশ্চিমাদের সাথে সম্পূর্ণরূপে তাল মিলাতে গিয়ে তুরস্ক নিজকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে এবং আরবীর পরিবর্তে রোমান বর্ণমালা চালু করে।

পূর্ববর্তী আলোচনায় ইসলামী বিশ্বের ওপর যে পশ্চিমা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইউরোপের সাথে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের

www.pathagar.com

মুসলিম সমাজের সংযোগ সাধন। বিভিন্ন সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলিম দেশগুলোর সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং এটা বলা কঠিন যে, পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকীকরণের সাথে ইসলামী মূল্যবোধ একত্রে অবস্থান করছে। আফগান অথবা পাখতুন উপজাতীয় পাঠানদের নিকট পাশ্চাত্যের সবকিছুই অনৈসলামিক। কিন্তু একজন তুর্কী ইউরোপীয় জীবনবোধের অনুসারী বলে পরিচয় দিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এ দু'টো জীবনবোধ বা বিশ্বাসের বেলায় বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের মধ্যে পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকীকরণের ব্যাপারে বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া এ দু'টো পদ্ধতির ব্যাপারে মুসলমানদের বিভিন্ন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী পর্যালোচনার পূর্বে এ স্তরে প্রকৃতপক্ষে দু'টো পদ্ধতি কি তা পরিষ্কার করে জানা প্রয়োজন। সে সাথে ঐগুলো মুসলিম সমাজে প্রয়োগের ব্যাপারে একটি থেকে আরেকটির পার্থক্য কতটুকু তাও বের করতে হবে। আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণের প্রেক্ষিতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করলে সনাতনী মতবাদকে একটি স্থায়ী উপাদান হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। একে কখনো অবহেলা করা যাবে না। প্রথমেই তিনটি স্বতন্ত্র ধারণা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়। আধুনিকীকরণ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির এমন একটি পর্যায় যার মাধ্যমে বহু প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক কাঠামো নতুন রূপ লাভ করে। বর্তমানে শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য নতুন শ্রেণী কাঠামোর সৃষ্টি করে ফলে নতুন ক্ষমতা কাঠামো সৃষ্টি হয়, যা পরিণামে নতুন সামাজিক আচরণ ও আশা আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়ে থাকে। এ পদ্ধতি অনুসারে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের নিমিত্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। ফলে পুরনো কারিকুলামের স্থলে বিজ্ঞানভিত্তিক নতুন পদ্ধতি চালু হয়।

পাশ্চাত্যকরণ একটি সাংস্কৃতিক ঝোঁক প্রবণতা। এর ফলে প্রাচ্যের জনগণ জীবনের সর্বত্র পাশ্চাত্যের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে, যারা পাশ্চাত্যের অনুসারী তারা মনে করে যে, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির বিভিন্ন দিক যেমন ঃ অভ্যাস, আদর্শ, মূল্যবোধ, রাজনীতিতে নৈতিকতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা, ললিতকলা ও সাহিত্য, এমনকি পাশ্চাত্য-উদ্ভূত চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছেদ-এসবই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, উন্নত ও বিখ্যাত। এসব ভেবে যদি প্রাচ্যের কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কান্ডজ্ঞানহীনভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে থাকে তাহলে তা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সামষ্টিক বা আংশিক ক্ষতি সাধন করবে।

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় সনাতনী ধ্যান ধারণা হলো ইসলামের একটি স্থায়ী *সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এটাও একটা স্থায়ী কারণ। ইসলামের প্রথম দিকে বদ্ধমূল সনাতনী প্রথা যেকোন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের অভাব, সাম্য ও অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ইসলামের সনাতনী পদ্ধতি ও পুনর্জাগরণী আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো আধুনিকীকরণকে উপেক্ষা না করে সনাতনী পদ্ধতিকে গ্রহণ করা। সনাতনী পদ্ধতি ইসলামের মৌল কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ আধুনিকীকরণের বিষয়গুলোকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ

www.pathagar.com

করে নিতে পারে। পুনর্জাগরণ প্রক্রিয়া (Revivalism) সর্বদাই সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এটা সর্বদা প্রথম দিককার ইসলামী সামাজিক সংগঠনের পুরো জীবনধারায় তার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সনাতনী পদ্ধতি বিভিন্ন ইসলামী সমাজে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বিপরীত ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া সামাজিক অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন মৌলিক পরিবর্তনগুলোর বেলায় সনাতনী পদ্ধতি সমন্বয়ের (Synthesis) কাজ করছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এশিয়া ও আফ্রিকার ইসলামী সমাজে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ দু'টো ভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিধারা হিসেবে সংহতি আনয়ন করে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ১. উন্নত সামন্ত তান্ত্রিক সংগঠন ও কাঠামো, যেমন ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারতীয় উপমহাদেশ, তুরস্কের অধীন বিরাট অটোম্যান সাম্রাজ্য, ২. আরব উপদ্বীপ ও গ্রীষ্মমন্ডলীয় আফ্রিকার উপজাতীয় সামাজিক সংগঠন এবং ভারতের শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্য চূড়ান্ত ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। অটোম্যানরা এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, তাদের বিশাল সাম্রাজ্যকে তারা আর ধরে রাখতে পারছিল না। এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জ রাজনৈতিক ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। এশীয় সামন্তবাদ বহুদিন ধরে ইসলামী সাম্রাজ্য সংহত করতে থাকে যখন প্রাচ্যে ইউরোপের শিল্প-উত্তর ঔপনিবেশিক শক্তি উন্নয়নের দিক থেকে চরমে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা শুধু ক্ষয়িষ্ণু এশীয় সামন্ত কাঠামোকে দূর করার উপায় অবলম্বন করেই আসেনি। বরং উন্নত শিল্পভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সংগঠনও সাথে নিয়ে আসে। এছাড়া তারা সাম্রাজ্যের কারণে ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে তাদের উপনিবেশগুলোতে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত আধুনিকীকরণ প্রর্বতন করে।

এর কারণ হ'ল, ইসলামের আধিপত্যপূর্ণ বিশাল এলাকাটা (দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলব্যাপী বিস্তৃত এলাকা) ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি দখল করে নেয়। সর্বপ্রকারের আধুনিকীকরণ ও ইউরোপীয় সব কিছুর প্রতি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বৈরিতা ছিল সুস্পষ্ট। এরূপ বৈরী মনোভাব ও উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিমদের শত্রুতা দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করে। এসব আন্দোলন, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক নব প্রবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। পুরো উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী সাধারণ ইসলামী মনোভাব এবং ইউরোপ প্রবর্তিত আধুনিকীকরণ বৈরিতাপূর্ণই থেকে যায়। এরপরও পাশ্চাত্যকরণকে একটি বিরাট দোষ হিসেবে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এমনকি ঐ সময়ে মুসলিম জনগণের বিরাট অংশ কর্তৃক তা নিন্দিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আধুনিকীকরণের কিছু বাছাই করা উপাদান গ্রহণে ইসলামী ভাবধারা এগিয়ে আসে। মনোভাবের এরূপ পরিবর্তনের কারণ হলো, মুসলিম উদারপন্থীগণ বুঝতে পারেন যে, অগ্রগতির নব স্রোতে অংশগ্রহণের নিমিত্ত নতুন

www.pathagar.com

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে আপোষ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তারা এটা অনুভব করলেন যে, আধুনিকীকরণের প্রতি মুসলমানদের এরূপ না-সূচক মনোভাব পরিণামে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সকল সামন্ততান্ত্রিক ইসলামী সমাজে মুসলিমদের আধুনিক পন্থায় অগ্রগতি সম্পর্কে উদারনৈতিক পরামর্শের কথা অনেক বেশী শোনা যায়। ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক ভাবধারায় উদারনৈতিকতা ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিমূল গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা করায় আধুনিকীকরণের নীতি অবলম্বন করা তাদের জন্য কঠিন ব্যাপার হয়নি। এই দ্বীপপুঞ্জের শতকরা ৮৫ ভাগ সাধারণ মানুষ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ইন্দোনেশীয় সংস্কৃতি হলো আরব ও ভারতীয় সভ্যতার সংকর সৃষ্টি । যে সমাজ দ্বৈত সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তা ছিল মন মেজাজে শান্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ। ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকরা তাদের সমসাময়িক বৃটিশদের ন্যায় উপনিবেশের ওপর পুরোপুরি তাদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেনি। ফরাসী উপনিবেশও এটা কখনো করেনি। তারা শুধু ঐসব বিষয় প্রচলন করতে চেয়েছিল, যেগুলো তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে প্রয়োজন ছিল। সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য থেকে নব-সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজকে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর ধারক বাহক বলে পরিচয় দিতে থাকে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনেও দেশীয় কর্মচারীদের জন্য মধ্যস্তরের পেশা লাভে সুযোগ সুবিধা অপ্রতুল হওয়ায় প্রথমদিকে ঐ শ্রেণীর প্রবৃদ্ধি কিছুটা সীমিত থাকে। যার ফলে এ শ্রেণীর বিরাট কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে জনগণের মধ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলতে গেলে ধার্মিকদের দ্বারাই প্রথম পরিচালিত হয়।

ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত মুসলিম পন্ডিত হাজী আগুস সালিম (১৮৮৪-১৯৫৫), যার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণকে পূর্বেকার আরব নেতা আল আযহারের মুহাম্মদ আবদুহুর অনুসারী বলা যায়। তিনি ছিলেন উদারনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা। ইসলামের মৌলিক নীতির সাথে কোন সংঘর্ষ সৃষ্টি না করে তিনি অগ্রগতির ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ইসলামে প্রগতি আনয়নের পরামর্শ দেন। মাসজুম পার্টি দ্বিধাহীনভাবে হাজী আগুস সালিমের দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করে। অপরপক্ষে দারুল ইসলাম প্রগতির এরূপ ধারা অনুসরণকে গোড়া পুনর্জাগরণী মতবাদ বলে প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারণা চালাতে থাকে। ইসলামী সনাতনী মতবাদের ভক্ত নাহদাতুল উলামা কোন এক সময়ে আধুনিকীকরণের প্রবাহে গা ভাসাতে অস্বীকার করলেও উন্নয়নের ব্যাপারে শেষের দিকে একটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। সাধারণ অর্থে ইসলামের পূর্ণ সমর্থনে ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, তাত্ত্বিকভাবে রাজনৈতিক মেরুকরণ, বিচার ব্যবস্থা, সামরিক ও বেসামরিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে আধুনিকীকরণকে সমর্থন করা হয়। দারুল ইসলামের ক্ষুদ্র একটি অংশ এর প্রতিবাদ করে। পাশ্চাত্যকরণের ক্ষেত্রে (সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন প্রণালীতে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বনে) ইন্দোনেশীয় ইসলামী সমাজ ঐক্যবদ্ধ ও স্থায়ী

www.pathagar.com

বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দেশীয় সংস্কৃতি এত গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল যে, প্রচলিত সাংস্কৃতিক ভারসাম্যের কোন পরিবর্তনের কথা বলার সাথে সাথে এর বিরোধিতা করা হতো এবং প্রত্যাখ্যান করা হতো। বিংশ শতাব্দীতে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জকে মুক্ত করা। ডানপন্থী, বামপন্থী ও কেন্দ্রপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর এটা ছিল একটা বিরাট ধরনের ঐক্য। পাশ্চাত্যের আধিপত্য থেকে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাদের মধ্যেকার ঐক্যের একটি কারণ। সেজন্য পাশ্চাত্যের যেকোন সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন অবলম্বনকেই জাতীয়তাবাদ বিরোধী বলে মনে করা হতো। আধুনিকীকরণের ভিত্তিতে অগ্রগতির যেকোন উপায়কে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করা হলেও দেশীয় সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যকরণের যে কোন বড় ধরনের প্রবণতা প্রতিরোধ করা হতো।

বৃটিশ ভারতে মুসলিমগণ ছিল সংখ্যালঘু। ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করে তখন এ উপমহাদেশের প্রায় ৩৩% মানুষ ইসলামের অনুসারী ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের জন্ম হয়।

দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে মুসলিম প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ ছাড়াও তারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। ভারতে ইসলামী সংস্কৃতি যদিও হিন্দু সংস্কৃতির সাথে পাশাপাশি অবস্থান করেছে তবুও ইন্দোনেশিয়ার ন্যায় এটা আরব-পারস্য স্বকীয়তা হারায়নি। মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে উভয়ের সংস্কৃতি সর্বদা খাপ খাইয়ে নিত। হিন্দুরা তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের নিকট থেকে অনেক সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ রপ্ত করে। বিনিময়ে মুসলিমরাও হিন্দুদের অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ শিখে নেয়। দু'টো ধর্মীয় দলের মধ্যে এমন একটি যোগসূত্র রচিত হয় যে, তাদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সহিষ্ণুতার পরিবেশ গড়ে ওঠে। তাদের সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বৃটিশের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় মুসলিম নেতৃত্ব অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও হিন্দু ও মুসলিম সমন্বয়েই নেতৃত্বের পদমর্যাদা সৃষ্টি করা হয়।

মুসলিম বিদ্রোহীদের চূড়ান্ত পরাজয় ও ভারতীয় এলাকাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাথে এক করে ফেলার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের সামনে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার আরেকটি নতুন প্রেক্ষাপট উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত কাঠামোর প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের সম্পৃক্ততা থাকায় নতুন সংগঠনে যোগ দেয়ার ক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের তুলনায় অনেক দূরে অবস্থান করতে থাকে। তারা তখনো তাদের গৌরবময় অতীতকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় একটি শূন্যতার মধ্যে বসবাস করছিল। এরূপ অচলাবস্থা থেকে বের হয়ে আসার কথা তখন মুসলিমগণ ভাবতে শুরু করে। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাবধি

www.pathagar.com

পরস্পরবিরোধী দু'টো সমাধান বের হয়ে আসে। দু'টো চিন্তাধারাই সনাতনপন্থী মুসলিমদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। একদল মুসলিম আধুনিকতার মাধ্যমে আচারনিষ্ঠ জীবনাদর্শ থেকে বের হয়ে না আসার পক্ষে মত প্রকাশ করে। এ দলকে আহলে হাদীস বলা হয়। তাদের বিশ্বাস যে, কোন নতুন জীবনাদর্শ ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি আপোষ করলে পরিণামে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে। সনাতনপন্থী স্যার সৈয়দ আহমদ খান অন্য একটি দর্শন প্রচার করেন। তার নতুন দর্শনে তিনি শুধু ভারতীয় মুসলিমদের অংশগ্রহণের কথাই বলেননি বরং বৃটিশদের সাথে যতটুকু সম্ভব নিজেদেরকে এক করে ভাবার কথাও বলতে থাকেন। এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি আলীগড়ে মোহামেডান এাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ-এর (বর্তমান মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়) ভিত্তি স্থাপন করেন। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি স্টাইলের এরূপ কলেজ কয়েক বছর পূর্বে সৈয়দ আহমদ খান দেখে এসেছিলেন। তিনি যে জীবনধারার কথা উৎসাহের সাথে সমর্থন করেছিলেন ও আলীগড়ে যে পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, প্রথম প্রথম তা ছিল পুরো বৃটিশ ধাঁচে মুসলিম পাশ্চাত্যকরণের একটা দৃষ্টান্ত।

মুসলিমদের পরীক্ষামূলক এ পাশ্চাত্যকরণও কিছু আংশিকভাবে এবং কিছু সাময়িকভাবে সফল হয়। এর ফলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আস্থা ফিরে আসে। বৃটিশ প্রশাসনে তাদের চাকরি পেতে সুবিধা হয়। বৃটিশদের পক্ষে এর বাইরে আর কোন জনসমর্থন ছিল না। পাশ্চাত্যভিত্তিক আলীগড়ে প্রশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা সরকারী চাকরি প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার লাভ করলো এবং মুসলিমদের প্রধান জীবনধারা থেকে দূরে থেকে গেল। জাতীয়তাবাদীগণ ১৯২০ সালে মুসলিম খেলাফত আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। এ আন্দোলনের ফলে স্যার সৈয়দ আহমদ খান কর্তৃক প্রবর্তিত ও সর্বান্তঃকরণে সমর্থিত পাশ্চাত্যকরণ সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে পুনঃচিন্তার সৃষ্টি হ'ল। আলীগড়ের আন্দোলন তার প্রথম দিকের ভাবমূর্তি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং বিকল্প পন্থার অন্বেষণ করতে থাকে। দু'দশক পর অবশেষে মুসলিম জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়।

দু'বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় মুসলিমগণ দু'টো প্রধান রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১. একটি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, যার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মাধ্যমে বহু-ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ২. নিখিল ভারত মুসলিম লীগ যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এর পরিণতিতে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বৃটিশ শাসনের মোহমুক্ত হয়ে তুরস্কের চাকচিক্যময় খেলাফতের পতনের ফলে আলীগড়ে প্রশিক্ষিত পাশ্চাত্য অনুসারী আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের (শওকত ও মোহাম্মদ) ভুল ভেঙ্গে যায়। তারা আবার খেলাফত পুনর্জাগরণের (*তাহরিখ-ই-খেলাফত* আন্দোলন) ডাকে সাড়া দেন ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারা পাশ্চাত্যবাদী আলীগড়ের শিক্ষার নিন্দা করে আলীগড়েই *জামীয়া মিল্লিয়া ইসলামীয়া*

www.pathagar.com

নামক নতুন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখে ভারতীয় মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আন্দোলনকারীদের মধ্যে আবুল কালাম আযাদ ছিলেন ইসলামী সনাতনপন্থীদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (আযাদ ছিলেন আরব বংশোদ্ভুত, তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত ইসলামী পন্ডিত হিসেবে খ্যাত ছিলেন)। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের মুসলিম বিপ্লব শুধুমাত্র আধুনিকীকরণের মাধ্যমেই সম্ভব। তিনি স্পষ্টভাবে পাশ্চাত্যকরণের নিন্দা করেন। *জমিয়ত উলামা-ই-হিন্দও* (ভারতে মুসলিম আলেমদের সংগঠন) ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল। এ সংগঠনটিও অস্পষ্টভাবে মুসলিম প্রগতিকে সমর্থন করত এবং স্পষ্টভাবে পাশ্চাত্যকরণকে অনৈসলামিক বলে নিন্দা করত।

১৯৩০-এর দশকে ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে উৎসাহব্যঞ্জক দিকনির্দেশনা লাভ করে। তিনি পাশ্চাত্য ধাঁচে প্রতিষ্ঠাযোগ্য পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাব করলেন। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও আলীগড়ে প্রশিক্ষিত সৈয়দ আহমদের অনুসারীদের কাছ থেকেও পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন আসতে থাকে। জিন্নাহ যে ধরনের মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন তা শরী-য়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তিনি কামাল আতাতুর্কের পাশ্চাত্যকৃত তুরস্কের আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন।

পাশ্চাত্যকৃত ইসলামী সমাজ সম্পর্কে জিন্নাহর ধারণা প্রথমদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করেছিল ঠিকই, তবে পরিণামে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জনসাধারণের নিকট পাশ্চাত্যকরণ পদ্ধতি বুদ্ধিগত ও সামাজিক দিক থেকে বোধগম্য ছিল না। পাকিস্তান বলতে তারা একটি আচারনিষ্ঠ রাষ্ট্রকেই বুঝতো। মধ্যপন্থী ও ইসলামী বিপ্লবী উভয় শ্রেণীই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রপ্ত করা পাশ্চাত্যকৃত জীবনাধারাকে সক্রিয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। জামায়াতে ইসলামী (আবুল আলা মওদুদী কর্তৃক পরিচালিত) একটি আচারনিষ্ঠ (পিউরিটান) রাষ্ট্র গঠনের প্রতি বরাবরই আহ্বান জানাতে থাকে।

ইতিহাসের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতীয় উপমহাদেশে যে ধরনের আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ ঘটে তার চেয়ে আরব বিশ্বে ভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। ভৌগোলিকভাবে ইউরোপের সাথে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের দরুণ নিকট প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকীয় দেশগুলোতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শিল্প-পূর্ব আধুনিকায়নের জন্য যা যা প্রয়োজন তা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর চাইতে পূর্ব ভূ-মধ্যসাগরীয় দেশগুলোতে বেশী পাওয়া যায়। ভারত ও ইন্দোনেশীয় উপনিবেশবাদ প্রবেশের পরেই এসব অঞ্চলে ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অটোম্যান সাম্রাজ্যের যে শেষ শক্তিটুকু

www.pathagar.com

বাকী ছিল তার জন্যই এমন হয়। এর পরপরই অটোম্যান সাম্রাজ্য চূড়ান্ত পতনের দিকে এগিয়ে যায়। ১৮৩৫ সালের কিছুকাল পূর্বেই আলজেরিয়া ফরাসীদের অধীনে আসে। এরপর ১৮৮১ সালে তিউনিসিয়া ফ্রান্সের অধীনে চলে যায়। ১৮৮২ সালে বৃটিশরা মিশর দখল করে। এসব দেশকে উপনিবেশে পরিণত করার ফলে উত্তর আফ্রিকার ওপর ইন্দো-ফরাসী আধিপত্য বিস্তার চূড়ান্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে অটোম্যান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতনের পর মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলো (আরব উপদ্বীপ ব্যতীত) বৃটিশ (প্যালেস্টাইন, জর্দান, ইরাক) ও ফরাসীদের (সিরিয়া ও লেবানন) আধিপত্যে চলে আসে।

ওলন্দাজদের ন্যায় বৃটিশরা তাদের উপনিবেশের ওপর নিজেদের সংস্কৃতি পুরো চাপিয়ে দেয়নি। অপরপক্ষে দেখা যায় ফরাসী উপনিবেশকরণ যেমন সাংস্কৃতিক ছিল তেমনি ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। ফরাসী ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অধীনে তারা শতাব্দীব্যাপী তাদের সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে সেদিন পর্যন্তও ফরাসী শাসিত উত্তর আফ্রিকা ও মরক্কো (সরাসরি এ দেশগুলো ফ্যান্স ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অধীনে না থাকলেও ফরাসী সংস্কৃতির প্রতি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল) বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে মধ্যযুগীয় পর্যায়ে থেকে যায়। ফ্রান্স কর্তৃক আলজেরিয়া দখল হওয়ার পর কাদেরীয়া তরীকার একজন গোঁড়া শেখ, আবদুল কাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে ফরাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন ও ১৫ বছর ধরে (১৮৪৭ পর্যন্ত) যুদ্ধ করেন। তার জিহাদ ছিল প্রকৃতই ইসলামী এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ। এরপর ১৯২০-এর দশক পর্যন্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হয়নি। এ সময় ফরাসীদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রতি অবদমিত মনোভাব উত্তর আফ্রিকানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি করে। ১৯৫০-এর দশকে মিসরে যখন আরব জাতীয়তাবাদী চেতনা ঘনীভূত হচ্ছিল এবং আরব মধ্যপ্রাচ্য পশ্চিমা শক্তির সাথে মুকাবিলায় রত ছিল, উত্তর আফ্রিকা তখনো আরব জাতীয়তাবাদের অনুসারী হবে, না ইসলামী ভাবধারায় নিজকে গড়ে তুলবে তা নিয়েই ব্যস্ত। এসব উত্তর আফ্রিকান দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাশ্চাত্যকরণ ঔপনিবেশিক যুগে তাদের মধ্যে একটি শূন্যতার সৃষ্টি করে (ফরাসী শিক্ষা-দীক্ষা ও ফরাসী জীবনধারায় অভ্যস্ত করণ)। তখন তাদের সামনে আর কোন নির্দেশনা ছিল না। ঔপনেবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাধ্যমে তিউনিসিয়া তার আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোতে আধুনিকীকরণ আনতে সক্ষম হয় এবং তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপন করে। মরক্কো, আলজেরিয়া ও লিবিয়ার এ জাতীয় সম্ভাবনা ছিল না। পাশ্চাত্যকরণের ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যকে প্রতিরোধ করা এবং স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলজেরিয়া ও লিবিয়া দ্রুতগতিতে আরব-ইসলামী পুনর্জাগরণী আন্দোলনে শরীক হয়।

আজহারের (আল-আজহারে প্রশিক্ষিত ব্যক্তি) ধ্যান ধারণার প্রভাব সুদূর অতীতে শুধুমাত্র মিশরেই লক্ষ্যণীয় ছিল না। এর প্রতিধ্বনি আরব বিশ্ব তথা সমগ্র মুসলিম

www.pathagar.com

বিশ্বেই শোনা যায়। ইসলামের প্রভাব জানার ব্যাপারে এর গভীরে যাওয়ার পূর্বেই মিসরের সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখা যাক। আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গ আলোচনার বেলায় সেখানে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হবে। ১৮৮২ সালের দিকে মিসরে বৃটিশের শাসন শুরু হয়। কিন্তু নেপোলিয়নের আক্রমণের পূর্ব থেকে ততদিন পর্যন্ত ইউরোপের সাথে মিসরের সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই মিসরীয় অভিজাতগণ তাদের তরুণদের সামরিক শিক্ষা ও অন্যান্য বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার জন্য প্যারিসে পাঠাতে থাকে। এর ফলে বৃহৎ পরিসরে আধুনিকীকরণ শুরু হওয়ার পূর্বেই ফরাসী শিক্ষিত শ্রেণীর ব্যাপক উদ্ভব ঘটে। নব উদ্ভুত পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রশিক্ষিত শ্রেণী মিসরীয় এলিটদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা ও পরিকল্পনা প্রবর্তন করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে মিসরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ইসলামী বিশ্বের অনেক দেশ থেকে অনেকাংশে উন্নত ছিল। সামন্তবাদ কৃষিভিত্তিক পুঁজিবাদের দিকে মোড় নিচ্ছিল। জমিদারীর শোষণ চলছিল মজুরীশ্রমের মাধ্যমে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তখনো মধ্যযুগীয় সামন্তবাদের মধ্যে বসবাস করছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তার ও মিসরীয় তুলা ফসলের বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণের ফলে অতিরিক্ত সুবিধা কৃষিভিত্তিক পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী প্রেরণা হিসাবে কাজ করে। ইউরোপের সাথে ভৌগোলিক সান্নিধ্য এবং সর্বোপরি ইউরোপের অগ্রসর সার্বিক অর্থনৈতিক পটভূমি মিসরের দ্রুত পাশ্চাত্যকরণে সহায়তা করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বর্ধিত বর্তমান পাশ্চাত্যকরণ প্রতিরোধ করার জন্য মুহাম্মদ আবদুহ (আল-আজহারের স্বনামধন্য ইসলামী পন্ডিত) এগিয়ে আসেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক প্রভাবকে প্রতিরোধ করা যাবে। খাঁটি ইসলাম পুরাপুরিভাবে আধুনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে, আধুনিক সময়ে ইসলামকে একটি সার্থক শক্তিতে পরিণত করার জন্য এর আদি কাঠামোকে আধুনিক উপায়ে গড়ে তুলতে হবে। আল-আজহারের সেকেলে শিক্ষাক্রম আধুনিকীকরণে তিনি বিরাট অবদান রাখেন। মুহাম্মদ আবদুহ্‌র সনাতনী কাঠামোতে ইসলামকে আধুনিকীকরণের প্রশ্নে জনৈক বিখ্যাত পন্ডিত তাহা হুসায়ন ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মতে মিসর ও ইউরোপ উভয়ে একই বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের অধিকারী। তিনি ইউরোপীয় সংস্কৃতি গ্রহণ এবং ইসলামী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বৃত্তি গ্রহণের তুখোড় সমর্থক ছিলেন। তাহা হুসায়ন যদিও তার প্রাথমিক শিক্ষা আল-আজহারেই গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু প্যারিসে তার পরবর্তী শিক্ষা তার আদর্শগত পরিবর্তনের সূচনা করে। তাহা হুসায়নের লেখা আধুনিক আরবী সাহিত্যে বিরাট প্রভাব ফেলে। এরপরও ইসলামী বিশ্বে তার নাম কেউ জানে না। আবদুহ্‌র আদর্শই ইন্দোনেশিয়ার

www.pathagar.com

বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। সিরিয়া, লিবিয়া এবং দূর ও মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলো ব্যতীত আধুনিকীকরণ তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক। ইরাক ও জর্দান (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাবধি এ দু'টো দেশ বৃটিশের অধীনে থাকে) উভয় দেশেই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো বর্তমান। এখনো অনেক ভূস্বামী রয়েছে যারা অনেক জমির মালিক ও গ্রামদেশে বিরাট অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং শহর এলাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী (১৯৫৮ সালে ইরাকে প্রজাতান্ত্রিক শাসন দ্বারা এ পদ্ধতি ধ্বংস ও বিলুপ্ত করা হয়)। মধ্যযুগীয় সামন্তবাদ ছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানও এ দু'দেশের আধুনিকীকরণে বেশ বিলম্ব ঘটায়। উভয় দেশই অন্যান্য দেশের সীমান্ত দ্বারা চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত ছিল। শুধু ইরাকের জন্যই উপসাগরীয় পথের মাধ্যমে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপীয় শক্তির প্রসারের সময় বহির্বিশ্বের সাথে অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে যোগাযোগ সৃষ্টির সুযোগ হয়। এ ভৌগোলিক-অর্থনৈতিক উপাদান এ দু'টো দেশের জমিদারী আভিজাত্যের অন্তর্মুখী জীবনধারা সৃষ্টিতে বিপুলভাবে দায়ী। মিসরের মত এ দু'দেশের সুবিধাবাদী শ্রেণী সাধারণভাবে স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত অতৃপ্ত থাকেনি। বৃটিশ প্রশাসন ১৯২০ দশকের দিকে আধুনিকীকরণের কিছু কিছু নমনীয় পন্থা প্রবর্তন করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাবধি এর অগ্রগতি মন্থরই থেকে যায়। বর্তমানের আরব তেল-অর্থনীতি ও অন্যান্য সম্পদ এ দু'টি দেশে আধুনিকীকরণের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

এ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেশ দু'টি পাশ্চাত্যকরণের যেসব উপাদান পেয়েছে তার প্রায় সবগুলোই মিসরীয় শিক্ষা, সাহিত্য ও গণমাধ্যমের সাহায্যে। গত কয়েক দশক ধরে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে বহু ধরনের যোগাযোগের ফলে ইরাক ও জর্দানের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃতির দ্বার খুলে গেছে। কিন্তু মানুষের বর্তমান অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্য পাশ্চাত্যকরণের যেকোন প্রভাবের প্রতি না-সূচক অভিমত ব্যক্ত হয়। ইরাকের বেলায় আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইরাক শিয়া ও সুন্নী মায্হাবের (দু'টো বড় ধরনের ইসলামী মাযহাব) ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। আজও শিয়াপন্থী পীর আওলিয়াদের শিক্ষার সবচেয়ে বিখ্যাত কেন্দ্র নাজাফে অবস্থিত। স্থানটির ধর্মীয় পবিত্রতাবোধ ও বর্তমানে প্রচলিত সনাতনী জীবনধারা পাশ্চাত্যকরণের গতি প্রতিরোধের ব্যাপারে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। এখানে সুন্নী ও শিয়া আওলিয়াদের কারো নিকটই আধুনিকীকরণ ও ইসলামী জীবনধারার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। শিয়া-সুন্নী মতবাদ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা এবং সেকেলে অর্থনীতিকে নতুন করে সংস্কার করার ব্যাপারে কখনো ইসলামের মৌল ঘোষণার বিরোধিতা করেনি।

প্রায় তিন দশক পূর্বেই আরব উপদ্বীপে আধুনিকীকরণে গতি সঞ্চারিত হয়। তেল থেকে প্রাপ্ত বর্ধমান রাজস্বের মাধ্যমে এ সংক্ষিপ্ত সময়ে উপদ্বীপের পুরো অঞ্চলে

www.pathagar.com

(দক্ষিণ এলাকা ব্যতীত) জীবনের সর্বক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও এখনো দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বিভিন্ন জাতির জীবনধারায় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকরণ কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারেনি। আরবের অন্যান্য মুসলিম দেশের ন্যায় সনাতনপন্থী মতবাদ আধুনিকীকরণ ও এর নিজের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি করেনি।

তুরস্ক ও ইরান এ দু'টো মুসলিম দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আধুনিকীকরণের করার নিমিত্তে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল সেগুলো ছিল বিপ্লবাত্মক। এমনকি তুরস্কের বেলায় রাষ্ট্রের কাঠামো পরিবর্তন করে পুরোপুরি ইউরোপীয় ধাঁচে গড়ে তোলার পদক্ষেপও নেয়া হয়েছিল।

অটোম্যানদের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলোতে খেলাফতের কেন্দ্র বিন্দু হওয়াতে তুরস্ক সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন ও আধিপত্য সংকুচিত হয়ে যাওয়ার মত একটি প্রকৃত সত্য তুরস্ক বাসীদের নিকট উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই তুরস্কবাসী নতুন স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণা খুঁজে পায়। ইসলামী দিব্যতত্ত্বের নামে সমগ্র শতাব্দীব্যাপী খেলাফত টিকে ছিল। মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা খেলাফতের ব্যাপারে চূড়ান্ত লড়াই হয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ইসলামের কেন্দ্রীয় ভূমিকারও সমাপ্তি ঘটে। প্রজাতান্ত্রিক যুগের প্রথম দিকে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে বর্তমান থাকলেও তা ছিল প্রতীকী ধরনের। এ সময় শরীয়া মন্ত্রণালয় ও অটোম্যানদের ইসলামী আদালত উঠিয়ে দেয়া হয় ও মুসলিম পীর আওলিয়াদের দমন করা হয়। পোশাকের বেলায় কঠিন আইন চালু করা হয় (ফেজ টুপী ও বোরখা নিষিদ্ধ করা হয়)। তুর্কিদের লেখার জন্য আরবীর স্থানে রোমান হরফ চালু করা হলো। আরবীতে আযানের পরিবর্তে তুর্কি ভাষায় আযান চালু করা হয়। ইউরোপের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাথে জাতীয়তাবাদী তুর্কীদের অভিন্ন করে দেখার জন্য এসব কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। পাশ্চাত্যকরণের নিমিত্ত নতুন নেতৃবৃন্দের উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে ১৯৩১-৩২ সালে পুরো পাশ্চাত্য ধাঁচে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য পিপলস্ হাউস (People's House) করা হয়। লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ কামাল আতাতুর্কের শাসন পুরো জাতিটাকে দমন করে রেখেছিল। ১৯৩৮ সালে তার মৃত্যুর পর উদার নৈতিকতা অনমনীয় রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

যুদ্ধ-পরবর্তী শতকে তুরস্কে ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, ইসলামী সনাতনপন্থীরা তা' সংশোধনের উদ্দেশে একটি চাপগোষ্ঠি (Pressure Group) রূপে আবির্ভূত হয়।

বিভিন্ন কারণে ইরানেও দ্রুত আধুনিকীকরণের (যেগুলো পাশ্চাত্যকরণের কাছাকাছি পৌঁছে যায়) একই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ইরানী শাসনের শেষ দশকগুলোতে

www.pathagar.com

কাজার রাজবংশ প্রদেশগুলোর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কেন্দ্রীয় সরকার নামে মাত্র থেকে যায়। ১৯২৫ সালে রেজা শাহ ক্ষমতা দখল করে প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সুসজ্জিত সামরিক বাহিনী সংগঠিত করা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য তিনি পশ্চিমের দেশগুলোর সাহায্য কামনা করেন। তার সৈন্যবাহিনীর সমস্ত কাঠামোকে ইউরোপীয় মানে পুরোপুরি আধুনিকীকরণ করার পর তিনি শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেন। শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণে ফরাসী শিক্ষাক্রম অনুসরণের মাধ্যমে ১৯৩৫ সালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য এ সময় ছাত্রদেরকে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশীর ভাগ শিল্পোন্নত দেশে পাঠান হয়। যে ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করতে তখন ছাত্রদেরকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল তা' আসলে বেশ উঁচু শিল্পোন্নত সমাজের জন্যই উপযোগী ছিল। ঐ শিক্ষা সে সময়েও প্রয়োজন অনুসারে ইরানে ছিল না। রেজা শাহ (তার সন্তান মোহাম্মদ রেজাও) এমন ধরনের উচ্চ প্রশিক্ষিত পাশ্চাত্য শ্রেণীর কথা ভাবতেন পরিণামে যা তার গোষ্ঠীর শাসনের জন্য একটি শক্ত ভিত নির্মাণ করে। ইউরোপীয় পর্যায়ে পৌঁছার উদ্দেশে তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের ন্যায় তিনিও চরম মানের আধুনিকতার ওপর ধর্মের প্রভাব হ্রাস করার জন্য কঠিন পন্থা অবলম্বন করেন। এরূপ করতে গিয়ে তিনি শুধু যুগ-পুরনো ইসলামের বৈধ নিয়মগুলোরই বিলোপ সাধন করেননি বরং আমামা (ইসলামী ওলামাদের পরিহিত পাগড়ী) ও পর্দা নিষিদ্ধ করে নির্দেশ জারী করেন।

ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য অংশের ন্যায় ইরানও শিয়া অধ্যুষিত। দৈনন্দিন জীবনে শিয়ারা বেশ সনাতনপন্থী। তারা বেশ উৎসাহের সাথে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে। স্বভাবতই আধুনিকীকরণের নামে সম্পূর্ণ বিদেশী যে সংস্কৃতিকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছিল তা শিয়া আলেমদের মধ্যে মারাত্মক বৈরিতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাহ্‌লভী শাসনামলে ইরানী সমাজের নিম্নস্তরে এই শত্রুতা বিরাজমান ছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কাঠামোতে ধীরে ধীরে আধুনিকীকরণ চলতে থাকলেও আজকের ইরানের ইতিহাস পুরো ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রচিত।

পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকীকরণের প্রথমটিতে সাংস্কৃতিক প্রবণতা এবং দ্বিতীয়টিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা বুঝায়। এর মধ্যে পাশ্চাত্যকরণ হলো একটি বেশ আধুনিক ঘটনা যাকে বিভিন্ন সমাজের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে। আধুনিকীকরণ একটি স্তর। এর প্রমাণে ইতিহাসে ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইসলামী সমাজকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এসবের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে। ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের শিক্ষা আন্দোলন, মিসরে তাহা হুসায়নের বুদ্ধিজীবী আন্দোলন, কামাল আতাতুর্ক, রেজা শাহ, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাশ্চাত্যমুখী সামাজিক,

www.pathagar.com

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংস্কার তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তানে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যেগুলো ইসলামের গ্রহণযোগ্য সনাতনী মতবাদের কাঠামোকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। উদারপন্থীগণ ঐসব সংস্কারের বিরোধিতা করেছিল, এমনকি প্রত্যাখ্যানও করেছিল। অপরপক্ষে দেখা যায় আধুনিকীকরণ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তা' ইসলামী সমাজ সংগঠনের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছিল। এ কথা সত্য যে, সমগ্র ইসলামী ইতিহাসে ইসলামী পুনর্জাগরণবাদীদের আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখা যায় কিন্তু পুনর্জাগরণবাদ এর প্রতিদ্বন্দ্বী পাশ্চাত্যকরণের ন্যায় জনসমর্থন পায়নি।

পাশ্চাত্যকরণ এবং ইসলামী পুনর্জাগরণবাদ দু'টোই বিপরীত মেরুর ন্যায় হলেও উভয়ের সম্পর্কই সাংস্কৃতিক প্রবণতা। পাশ্চাত্যকরণ সাংস্কৃতিক নির্দেশনার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। পুনর্জাগরণবাদ প্রথমদিকের ইসলামী সমাজ সংগঠনের রোমান্টিক সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের জন্যে অতীতের দিকে চেয়ে থাকে। সবাই এটা লক্ষ্য করে থাকবে যে, যেসব ইসলামী দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকরণকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয়েছে সেখানেই আবার পুরো বিদেশী সংস্কৃতিকে প্রতিরোধ করার জন্য পুনর্জাগরণ মতবাদের শক্তিশালী যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে। তবে এটাও সত্য যে, ঐসব দেশের যেখানে আধুনিকীকরণ সাংস্কৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে একটি স্থিতিশীল গতি বজায় রাখতে পেরেছে সেখানে পুনর্জাগরণ মতবাদকে মানুষ তেমন গ্রহণ করেনি।

www.pathagar.com

সংস্কারবাদ হতে ইসলামী বিপ্লব

হিশাম জায়িত*

আজকের ইসলামে সংস্কারবাদ ও আধুনিকতাবাদ

বিভিন্ন ধরনের সংস্কারবাদ ও আধুনিকতাবাদ একই বুদ্ধিবৃত্তিক বাস্তবতার ওপর গড়ে না উঠলেও তাদের মধ্যে বিস্তর মিল রয়েছে। ইউরোপে ইসলামের অনুপ্রবেশের কারণে বৃহত্তর অর্থে এটা ছিল ইতিহাসাশ্রয়ী চিন্তার আন্দোলন। এটা ছিল প্রতিশোধের আন্দোলন, যদিও এর মধ্যে ধর্মীয় বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বস্তুগত বিষয়াবলী যুক্ত হয়েছিল। এ দৃষ্টিকোণ হতে এগুলোকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের ফল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। দ্বন্দ্বের বিষয়টিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

- সংস্কারবাদ ও আধুনিকতাবাদ ;

- বিভিন্ন ধরনের সংস্কারবাদ ও বিভিন্ন ধরনের আধুনিকতাবাদ–এর মধ্যে বিরাজমান দ্বৈত বিভাজন।

গতানুগতিক মুসলিম গোষ্ঠী হতে সংস্কারবাদের উৎপত্তি। এর মধ্যে বিভিন্ন *উলামা বা মুসলিম গোষ্ঠীর প্রধানগণও* অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ আফগানী, আবদুহ, রশীদ রিদা ও আরো পূর্বের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব বা সুদানের মাহদী। তারা আসলে ঐসব উলামা বা অতিন্দ্রীয়বাদী নন যারা ঐ গোত্রের প্রধান অংশটাই গঠন করেন, কিংবা যারা অধিকাংশ আন্দোলনের সাথেই জড়িত। এসব ব্যক্তিত্বের মধ্যে দ্বৈততা ছিল না। পশ্চিমা প্রভাবের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়নি। তারা মুসলিম। ঈমানের দিক দিয়ে সামাজিক আচার আচরণ নির্ধারণকারী ধ্যান ধারণা ও অনুভূতিতে তারা মুসলিম। কিন্তু তাদের লক্ষ্য কোন দিকে ?

এটা সাধারণতঃ লুথারের ন্যায় বিরোধ সৃষ্টিকারী একটি ধর্মীয় সংস্কার নয় বরং সভ্যতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি পরিশুদ্ধ ধর্ম। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব একটি ব্যতিক্রম। তিনি তার ধর্মের দেয়া পূর্ণ সমাধানের পরিপোষক ছিলেন। বহির্বিশ্বের কোন প্রভাব তার ওপর পড়েনি।

অপরপক্ষে আধুনিকতাবাদের মূল নিহিত ছিল পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরও যারা মুসলিম ছিলেন। সালামা মুসার ন্যায় একজন আধুনিকতাবাদী মুসলিম প্রথমে ফেবিয়ান এবং পরে মার্কসবাদী হয়ে

* ড. হিশাম জায়িত-তিউনিস ইউনিভার্সিটি, তিউনিস

www.pathagar.com

এ গোষ্ঠির অর্ন্তভুক্ত হতে পারেন না। সংস্কারবাদ ও আধুনিকতাবাদের মধ্যে সাধারণ গ্রহণীয় বিষয় যা তা হলো সম্পূর্ণ দ্বিধাহীনভাবে ইসলামী আকীদা ও ঐতিহ্যকে সমগ্র গভীরতাসহ গ্রহণ। এর পরও আধুনিকতাবাদী আন্দোলনে পশ্চিমা আর ইউরোপীয় জীবনধারা ও চিন্তাধারার প্রতি পরিষ্কার দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, আধুনিকতাবাদের প্রকৃত বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে তার সাংস্কৃতিক প্রভাব। সমস্যাটা এখানে নৈতিকতা বিষয়ক নয় বরং আচার আচরণ ও রাজনৈতিক পদ্ধতি বিষয়ক। আধুনিকতাবাদের বিভিন্ন রূপ মুসলিম চিন্তাবিদদের ভীষণভাবে ইসলামে আকৃষ্ট করে। এসব চিন্তাবিদদের মধ্যে ইকবাল, আমীর আলী, সমাজ সংস্কারক কাসিম আমিনের ন্যায় উদার বুদ্ধিজীবীদের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা ধীরে ধীরে তাদের সংস্কৃতির গোড়ায় বিদ্রোহ করেন। এদের মধ্যে লুতফী আস-সাইয়িদ বা তাহা হুসায়ন এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনায়ক আতাতুর্কের নামও উল্লেখ করা যায়। এটা উল্লেখ্য যে, আধুনিকতাবাদ বুদ্ধিজীবীদের দ্বন্দ্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটাকে সাধারণ ও শিথিলভাবে বিশ্লেষিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে গণ্য করা যায়।

সংস্কারবাদের শ্রেণী বিভাগ

ওয়াহ্হাবী মতবাদ ও মাহদী মতবাদ

গোত্রীয়, গ্রামীণ বা যাযাবর সংস্কারবাদ (ওয়াহ্হাবী মতবাদ ও মাহদী মতবাদ) এবং শহুরে, মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত সংস্কারবাদ (মৌলিকতাবাদ ও সালাফী মতবাদ) আলোচনার পূর্বে প্রথমেই এদের মধ্যে একটি সামাজিক ও ভৌগোলিক পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। এ ধরনের এক সমাজতাত্ত্বিক পার্থক্য আরেক পার্থক্যের ওপর বহাল হয়, এটা আন্তঃশক্তি বা বহিঃশক্তির আন্দোলন নির্ধারণ করে। পশ্চিমাদের ধারণা, আত্মীকরণের পূর্বেই ওয়াহ্হাবী মতবাদের আবির্ভাব ঘটে। বস্তুতঃ ইসলামের অন্তর্নিহিত প্রয়োজন মেটানোর জন্যই এর আবির্ভাব। ইসলামের এ অন্তর্নিহিত প্রয়োজনটা ছিল ইবাদতে পীরদের মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান যা ছিল কঠোরতম হাম্বলী মতবাদের পরিপন্থী। এর বিশাল সৃজনশীলতার বিষয়টিকে সুযোগ দিতে হবে। এটা সংস্কারের উর্ধ্বে একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একজন ওয়াহ্হাবীর সংস্কারের গোপন দ্বার দিয়ে ইসলামের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। সম্ভবতঃ এটা সর্বশেষ প্রাচীন মতবাদ। নির্যাতন এ মতবাদে একটি উপদলের সৃষ্টি করেছে এবং তা একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে।

মাহদীবাদটি গ্রামমুখী। এর পটভূমি হলো চাষী আর তা চিন্তার কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে, তবে গভীর। পশ্চিমা আধিপত্যের সাথে দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই মাহদী মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। ওয়াহ্হাবী মতবাদের ন্যায় এটি অভ্যন্তরীণ কোন খাঁটী কুলসঞ্জাত ছিল না।

www.pathagar.com

তবে ওয়াহ্হাবী মতবাদের সাথে এর সাধারণ গ্রামীণ সম্পর্কের গভীরতা ছিল। এ ছাড়া গোত্রীয় আশা আকাংখা প্রকাশের ও সৈন্যবাহিনী সৃষ্টির শক্তিও এর ছিল। তার পরও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল। পুরান ভাববাদের অনুসরণে ওয়াহ্হাবী মতবাদ গোত্র প্রধানদের মতান্তরিত করেছে, যারা তখন সবেমাত্র ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। মাহদীবাদ কোন প্রতিষ্ঠিত কিংবা সদ্যোত্থিত শক্তির সহায়তায় কাজ করেনা। মাহদীবাদ নিজেকে বরং নেতৃত্বদানকারী শক্তিরূপে পেশ করেছে এবং জিহাদের ভাবধারাকে স্পষ্ট করেছে, যদিও তত্ত্ব হিসেবে এটা ছিল সে সময়ের অতিন্দ্রীয় ও আফ্রিকী ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা ছিল ব্যক্তির সম্মোহনী নীতি ও সামষ্টিক প্রতীকধর্মিতা একীকরণের প্রতিফলন।

মৌলবাদ ও সালাফীবাদ

এ আন্দোলন শহর কেন্দ্রিক। ইউরোপীয় অনুপ্রবেশে প্রভাবিত দেশগুলিতেই এর উদ্ভব। ইউরোপের আধিপত্যের বিরদ্ধে একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়া এতে রয়েছে এবং অন্তত: আফগানী ও আবদুহুর লেখায় কিছু কিছু আধুনিক চিন্তাভাবনা রয়েছে। প্রতিক্রিয়া অথবা প্রতিরক্ষার বিষয়টি আফগানীর লেখায় সুস্পষ্ট। তিনি সর্বোপরি নিজকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী বলে মনে করেন। আধুনিকতাবাদের দিকটি আবদুহুর লেখায় স্পষ্ট। এর নানা প্রক্ষিপ্ত ধারণার তাত্ত্বিক জবাব ইসলামের রাজনৈতিক একতা, ধর্মীয় বিশুদ্ধতা, মৌলিকত্বের দিকে প্রত্যাবর্তন, সব আবার ইসলাম ও মুসলিম এই ইতিবাচক দ্বৈততার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ হচ্ছে আবদুহুর দর্শনের নির্যাস। সুতরাং এর দু'টো মেরু রয়েছে : একটি বহির্মুখী, অপরটি অন্তর্মুখী। তত্ত্ব হিসেবে এটা রাশিদ রীদা ও মানার গাষ্ঠি থেকে পৃথক যা সাধারণভাবে পরিচিত এবং উদ্ভাবকের অবস্থান স্পষ্টকারী। সালাফী মতবাদের মূল এখানেই। ওয়াহ্হাবী মতবাদের সাথে এর মিল স্পষ্ট। কিন্তু সালাফী শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠী নয়, এটা একটা সক্রিয় চিন্তাগোষ্ঠী। আবদুহু ও এর অনুসারীদের পার্থক্যকে অবহেলা করা যাবেনা। যেমন, আধুনিকতাবাদের বিভিন্ন দিক রয়েছে, আবদুহুর রচনায় তার প্রকাশ কঠোর, মানার-এর মাঝে এ কঠোরতা দেখা যায় না। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারবাদে তাছাউফের সর্বব্যাপী একটি আবেদন রয়েছে যা রাশীদ রীদা অস্বীকার করেছেন। এরপরও বুদ্ধিগত ভিত্তিই এর সাধারণ পটভূমি হয়ে রয়েছে। জনপ্রিয় ধাঁচে সহজতর করার পূর্বে সালাফী মতবাদের প্রথম দিকে মৌলিকত্বের আলোকে পরিশুদ্ধকরণের একটা প্রচেষ্টা লক্ষণীয় ছিল। ওয়াহ্হাবী মতবাদের সঙ্গে এর পার্থক্য ছিল এই যে, এতে সমগ্র সুন্নাহ তথা সমগ্র ইসলামী ঐতিহ্য আত্মীকরণ করা হয়। এটা ছিল বুদ্ধিবৃত্তিবাদী, নিছক আচারনিষ্ঠ নয়। এভাবে এটা মিসর, সিরিয়া, মরক্কো, আল-জিরিয়া ও তিউনিসিয়ায় ইসলামে বুদ্ধিবাদ পুন:প্রবর্তনে সক্ষম হয়। বাহ্যিক গতানুগতিক মতবাদ হওয়ার কারণে প্রথমে এটা প্রত্যাখাত হয়। সালাফী মতবাদ

www.pathagar.com

মরক্কো ও আলজেরিয়ায় জাতীয়তাবাদে প্রাণ সঞ্চার করে এবং পরোক্ষ রাজনৈতিক ফলাফল প্রদান করে। এ মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্তায় কোন রাজনৈতিক বিপ্লব বা মৃদু অশান্ত ভাবধারাও ছিল না। শাসক সমাজ ইসলামে অনুপ্রাণিত হয়ে ধীরে ধীরে তাদের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় সচেতনতার কাঠামোকেই পরিবর্তন করে দেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামে তার প্রতিফলন ঘটানো যা নতুন বা পরিশুদ্ধ করা হয়েছে। যেভাবেই হোক সালাফী মতবাদ ইসলামের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সংহতির সামগ্রিকতার ধারণা দিয়েছে। এটা সত্য যে, এ ধারণা জনসাধারণের চেতনায় ভিত্তি অর্জন করেছে ও তা' সালাফী চেতনার সাথে একীভূত হয়েছে। ধীরে হলেও ইসলামী অনুভূতির সকল ক্ষেত্রে এ সচেতনতা দৃঢ়ভাবে বিস্তার লাভ করে। এরা ছিল প্রাচীনপন্থী আলেমদের ভিন্ন একটা গোষ্ঠি, মধ্যম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী। কিন্তু, এসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে সালাফী মতবাদ একইভাবে গৃহীত হয়নি। এ মতবাদের কতিপয় নির্ধারিত উপাদানই শুধু আত্মীকৃত হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী যুগ

জামালুদ্দীন আফগানী ও আবদুহ্‌র দ্বৈত শিক্ষা সত্ত্বেও ১৯১৯ সালে প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমা আধিপত্যের অধীনে ছিল। এ বিশেষ অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, আফগানীর বুদ্ধিবৃত্তিক আধ্যাত্মবাদ তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধানে ছিল দুর্বলভাবে গ্রথিত। এর ফলে খেলাফতের ধারণার ওপর কামালপন্থী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এ জাতীয়তাবাদ ছিল একটি অযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। মোস্তফা কামালের এই তুলনামূলক সাফল্য ছিল ইউরোপের সামরিক পরাজয়ের ফল। ইউরোপীয় শক্তিকে পরাজিত করার পর তিনি তারই হাস্যকর অনুকরণ করেছিলেন। এটা ছিল পুনরাবৃত্তি করার মত অবস্থা। অর্ধ শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বের জন্য সক্রিয় জাতীয়তাবাদ (বিদ্রোহ, বিদ্রোহী, স্বাধীনতা আন্দোলন) একটি প্রচ্ছন্ন আদর্শে পরিণত হয়। এটা সত্য যে, রীতিনীতির নকল আধুনিকীকরণ এবং উপনিবেশবাদী বা আধা উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষকরণ চলছিল পর্দার অন্তরালে। কিন্তু শাসন হিসেবে বৃহদায়তন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঘটে স্বাধীনতা আন্দোলনে কিছু সাফল্যের পর। তখন এটা আকাংখিত বিষয়ে পরিণত হয় যা ক্ষমতায় এসেই জাতীয়তাবাদীরা মানারের সালাফীবাদের চেয়ে আবদুহ্‌র আলোকিত মৌলবাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে আবির্ভূত হত। এর সাথে ধর্মীয় চরিত্রের ছিল স্পষ্ট অমিল। এর মধ্যে আবদুহ্‌র উত্তরাধিকার এবং ১৯৩০ এর উদার আধুনিকতাবাদকে সমন্বিত করার একটা প্রবণতা ছিল। ক্ষমতায় এসেই জাতীয়তাবাদীরা মানারের সালাফী মতবাদ অপেক্ষা আবদুহ্‌র উজ্জ্বল মৌলিকতাবাদের উত্তরাধিকারীর ন্যায় আচরণ করে। ধর্মীয় চরিত্রের দ্বারাই এটার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল আবদুহ্‌র পরের ধ্যান ধারণা ও ১৯৩০ এর উদার আধুনিকতাবাদের সমন্বয় সাধন। এটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

একটা বিষয় যার মাধ্যমে সংস্কারবাদী বনাম আধুনিকতাবাদী সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারা যখন সামাজিক পট পরিবর্তন করছিল ও সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে আনছিল, বস্তুতপক্ষে তারা তখন একক ইসলামের ধারণাটিকেই ভেঙ্গে দিচ্ছিল। স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে যা কিছু পাওয়া গিয়েছিল তার প্রত্যেকটিই পশ্চিমা ভাবধারায় আত্মস্থ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উন্নয়নগামিতা, মার্কসবাদ এবং রাষ্ট্র-সমাজ ও মানবজীবনের ধর্মনিরপেক্ষকরণ। এটা আজ আর আধুনিকতাবাদ বা বুদ্ধিবৃত্তিক লক্ষ্যের ব্যাপার নয়। এটা হলো কোন কাঠামো আধুনিকীকরণের প্রকৃত ঘটনা। এর পরও দেখা যায় ইসলাম, বিশেষ করে আরব বিশ্বে রাষ্ট্র ও জনগণের ধর্ম হিসেবেই রয়ে গিয়েছে, এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো হলেও আধুনিকায়নের আদর্শ ইসলামকে চিন্তা বা আধ্যাত্মিকতার লড়াইয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটা আত্মবিরোধী হলেও সত্য যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় পরাজয় পশ্চিমাদের হলেও তা কিন্তু ইসলামের ক্ষতির চেয়ে বেশী নয়। ইসলামকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে উচ্ছেদের মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছে এবং ইসলামকে সৃজনশীল কর্মকান্ডের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা হয়, যেখানে এ ইসলামকেই একদা লড়াইয়ে উদ্যমের বিষয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আরব বিশ্বে এবং এর চেয়ে বেশী তুর্কীস্তান ও ইরানে যা প্রত্যক্ষ করা যায় তা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ফল নয় বরং এটা হলো জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক রূপরেখা যা বিদেশীদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ও ইসলামের ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এটা হলো সম্পূর্ণরূপে সাংস্কৃতিক আত্মসমর্পণ যা মাঝে মাঝে সৌদি আরবের ন্যায় সেকেলে দেশ বা মরক্কোর ন্যায় সুসংগঠিত নাটুকে দেশে পরিলক্ষিত হয়। আবদুহ্ ও পরবর্তী সালাফী সংস্কারবাদী অভিলাষ এক সময় পরিত্যক্ত হয়। সম্ভাব্য কারণ হলো, এর প্রধান প্রধান নীতিগুলো বিসদৃশ হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র ইসলামের জনপ্রিয় সারসপক্ষীর পালকে সজ্জিত পোষাকটিই খুলে ফেলা হয়নি, এর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিকেও খুলে ফেলা ও সমকালীন আচ্ছাদনযুক্ত অর্থহীন রাজনৈতিক দর্শনের সংলাপে পরিণত করা হয়। আরব বিশ্ব থেকেই এর নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে। বারগুইবাকে আস্থাহীন মৌলিকতাবাদী ও পুরনো ধাঁচের আধুনিকতাবাদীর হোতা বলা যেতে পারে। অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মাধ্যমে তার দেয়া রূপরেখায় ইসলামী সমাজের মুক্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন আস্থাবান। তার সংগ্রাম ছিল যুগ বহির্ভূত ও সেকেলে। তিউনিসিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের সফলতার পেছনে এ জাতীয় লড়াইয়ের সফলতা দেখা গেলেও ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকের দিকে যা লক্ষ্যণীয় তা কিন্তু এ আধুনিকতাবাদী সংগ্রামের জের নয়। বরং এটা ছিল নব্য রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদেরই একটা রূপ। এ নব চিন্তাধারাটা ছিল নাসেরের মতবাদ, বা'থের মতবাদ, তৃতীয় বিশ্বের আদর্শ আধুনিকতাবাদ ও শিল্পায়নেরই ধারণা। এটা সত্য যে, এসব শক্তি

www.pathagar.com

তাদের জাতীয় সীমারেখার মাঝে থেকে নিস্ফল লড়াই করে যাচ্ছিল কিন্তু তারা কখনো প্রকৃত প্রস্তাবে পাশ্চাত্য আধিপত্যবাদকে প্রভাবিত করতে পারে নি। আর এ সবের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, সংস্কারবাদী আধুনিকতাবাদী বিতর্ক যেখানে ভিত্তি গেড়েছে সেখানে মূল সুর থেকে এর বিচ্যুতি ঘটেছে। তাছাড়া বিচ্যুতিটাও ছিল মারাত্মক। কেননা সব মানুষকে এটা ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার নিকট মাথা নত করতে বাধ্য করেছে।

ইসলামী ধারার আবির্ভাব

এরপর বলা যায় যে, মুসলিম বিশ্বে "জাতীয়তাবাদী" শাসন ইসলামকে রাজনৈতিক বিতর্কের বাইরে ঠেলে দিয়েছে। কখনো কখনো ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা *"আলেমদের"* কর্তৃত্ব নিয়ে নেয় এবং তদুপরি কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার মতামত প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। ফল এ হলো যে, যা বাতিল করা হয়েছিল তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তীব্র তাগিদে একটা পুনঃ জাগরণের সৃষ্টি হলো। এ জাগরণ প্রথমে যুবক শ্রেণী ও পরে জনতার মধ্যে বিস্তার লাভ করে যারা কোন কিছুতেই ইসলামের গভীর চেতনাকে বিসর্জন দেয়নি। শাসকচক্রের ব্যর্থ প্রতিরোধের পর এলো স্বাধীনতা তথা ইসলামী আন্দোলন যার উদ্দেশ্য ছিল একটি শূন্যস্থান পূরণ, তা গত দশকে বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিকভাবে জন্ম লাভ করে। যেকোন ক্ষেত্রেই তারা শতাব্দীর শুরুতে সংস্কারবাদী আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের চেয়ে একটা ভিন্ন চরিত্র উপস্থাপন করে। তারা যেসব আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন তার মধ্যে ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত মিসরীয় সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমুন –এর নাম উল্লেখ করা যায়। ইখওয়ানুল মুসলিমুন-এর আল্ বান্না আবদুহর ন্যায় কথা বলেননি। কেননা তিনি যে সমাজ ব্যবস্থাকে তার বাণী শুনিয়েছিলেন তা ইতোমধ্যেই পুরো ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে গিয়েছিল। তার ইচ্ছা ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রকে পুনঃ ইসলামীকরণ করা, ইসলামকে সংস্কার করা নয়, তার জন্য এটা ছিল শাশ্বত সত্যের ন্যায়। তিনি ছিলেন সক্রিয়বাদী সংগঠক, গণআন্দোলনকারী। তিনি আবদুহ-এর ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচারক ছিলেন না। তিনি একটি দল হিসেবে তার সম্প্রদায়কে গড়ে তোলেন। এটা করতে গিয়ে তিনি একদিকে যেমন সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ডে দোলায়িত হয়েছেন অন্যদিকে তেমনি সংসদীয় পদ্ধতিকেও আঁকড়ে ধরেছেন। যদিও জোরালো বিশ্বাস রয়েছে যে, ইসলাম অবশ্যই সমগ্র রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে (অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে) আত্মস্থ করে, কিন্তু কৌশল ও বুদ্ধিকে অনুপ্রেরণাগতভাবে আধুনিক মনে করে। এরপরও নীতিগত দিক থেকে বিচার করলে আশ্চর্য হতে হয় যে, সংহত ইসলামী সমাজের পতনের ফলে যার উদ্ভব ঘটেছিল প্রকৃতই সে ধারণাটা নতুন ছিলনা।

নাসের কর্তৃক দমনকৃত আল বান্নার আন্দোলনের আরব বিশ্বে বিশেষ ইসলামী বিপ্লবের আদিরূপ হিসেবে কাজ করার জন্য পরে আবার উত্থিত হয়। প্রসংগত

www.pathagar.com

পাকিস্তানের মওদুদীর জামাত-ই-ইসলামীর নাম উল্লেখ করা যায়। যদিও এর প্রভাব ছিল স্বল্প মাত্রার এবং এর অগ্রগতি ছিল দ্বিধান্বিত। বর্তমান ইসলামী আন্দোলনের সব চেয়ে সাম্প্রতিক ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় ইরানী বিপ্লবে আর এর চেয়ে স্বল্প মাত্রার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় তিউনিসিয়ার বিপ্লবে।

প্রসঙ্গত এটা বলা যায় যে, তিউনিসিয়ার প্রবণতাটা যুব প্রজন্মের কারণেই। যদিও এর চলমানতা আল জিতুনার ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। ঐতিহ্যের এ প্রবাহ রাজনৈতিক উচ্চমাত্রিকতা মন্ডিত। এটা সে সময়কার অনেক রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা আত্মস্থ করে লাভ করে। এক বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো যা' ছিল সবার নিকট উন্মুক্ত। এটা ইসলামকে সংগ্রাম ও প্রতিফলনের একটা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করলেও বিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান হতে ইসলামকে অনেক দূরে রাখে। অপর পক্ষে, এটা ইসলামে ঐ সভ্যতা প্রয়োগ করতে অস্বীকৃতি জানায়, যার মূল হলো সংকোচনবাদ। এসব নেতাদের দুর্বল দিক হলো চিন্তা সম্পর্কিত ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোকে পাশ কেটে যাওয়া যা জনগণের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ছিল। হতে পারে যে, ইরানী বিপ্লব আরব বিশ্বের ইসলাম দ্বারা খুব কমই প্রভাবিত হয় বা মোটেও প্রভাবিত নয়। কিন্তু একথা তিউনিসিয়ার জন্য পুরো ঠিক নয়। যদিও এটা বলা যাবে না যে, তিউনিসিয়ার বিপ্লবটি ছিল মিসরীয় পদ্ধতির "ইখওয়ানুল মুসলি-মুনের" মতই একটি বিপ্লব।

ইরানে ইসলাম শীয়া সদস্যদের নির্দেশে পরিচালিত। তারা রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ। তারা একটা আধ্যাত্মিক শক্তি হিসেবেই থেকে যায়। এ আধ্যাত্মিক শক্তিই শাহের ঘৃণ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে খোমিনীকে দুর্দমনীয় লড়াই-এর প্রেরণা জোগায়।

ইরানী বিপ্লব শীয়া ঐতিহ্য থেকে মূল রাজনীতির ধারণা লাভ করে। ঐ ঐতিহ্য কুফায় মুখতারের মুস্তাদাফীন বা বঞ্চিতদের প্রতিরক্ষার শ্লোগানে প্রতিধ্বনিত হয়।

এখানে সমাজের ভিত্তিমূলে নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারের একটা অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জনগণের মাঝে নৈতিক চরিত্রের বিষয় হিসেবে আধুনিক নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক সংস্কারে প্রতিধ্বনিত হয় না। ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের মাঝে এটা তার স্বকীয়তার অন্বেষণ না করে ইসলামের মাঝেই উৎপত্তির কারণ অন্বেষণ করে আধুনিক ধ্যান ধারণার সংস্পর্শে আসে। এখানে অভ্যন্তরীণ উপাদানের চেয়ে বহির্দেশীয় উপাদানই আগে উপস্থিত হয়, যদিও পরে যে উপাদান আসে সেটা থেকে এটা জীবনীশক্তি লাভ করে। ইরানী বিপ্লবটা ইরানী জনগণের সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্যই শুরু হয়। যদিও এটা স্বীকার করতে হয় যে, ন্যায় ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ইসলামকে বজায় রাখার মাধ্যমেই এ বিপ্লব সংঘটিত হয়। কিন্তু ইসলামী জনগণের সাথে পুনঃ নব মিলনের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়, যা তখন মানুষের মধ্য থেকে তিরোহিত হয়েছিল। আর এ বিপ্লবটা এমনই যে সভ্যতার সংঘর্ষের মাধ্যমেই তার পরিসমাপ্তি ঘটা উচিত, যার দ্বারা তার স্ব স্ব ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে

www.pathagar.com

ইসলামী এলাকাটা নিজেকে স্বাধীন এলাকা হিসেবে পরিগণিত করতে ইচ্ছুক। ইরানী বিপ্লব অতীতের সকল বিভেদকে ভুলে গিয়ে ইসলামী সার্বজনিনতার উন্মেষ ঘটিয়েছে।

উপসংহারে প্রশ্ন জাগে যে, এ বিপ্লবে এবং সমগ্র ইসলামী আন্দোলনে এ জাতীয় কোন নজীর আছে কি ? সর্ব প্রথমে ইসলামের কথাই ধরা যাক। এতে রয়েছে পুনঃ নবায়িত গতিশীলতা, বিজয় ও মূল্যবোধের সুবাস। কঠোর সংযম, আজকের দিনের বস্তুবাদের অস্বীকৃতি, আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতি। প্রাধান্যশীল নৈতিক শিষ্টতা থেকে অতিন্দ্রীয়বাদের এ বার্তাটা সকল মানব জাতির জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। ইসলাম যদি আধুনিক বিশ্বে কোন ভূমিকা পালন করতে পারে তা হলে ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইহলীলা ত্যাগের বদ্ধ সংস্কারের বিষয়টি তেমন বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং এটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মানুষকে কিছু কিছু প্রাথমিক গুণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেমন- মেলামেশায়, দান দক্ষিণা এবং বস্তুগত সুখ কামনায় অভাবনীয় আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের বাইরে আনন্দ অনুভব করা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশ্বের বন্দী শিবিরগুলোতে শক্তিশালী ও গভীর বিশ্বাস নির্ভর প্রতিষেধক পাওয়া যাবে। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষ দুষ্ট ও পাশবিক প্রকৃতির। কেননা তার গঠনে নির্দিষ্ট বিভিন্ন উপাদানের কখনো পরিবর্তন ঘটেনা। সুতরাং মানুষের এটা কর্তব্য যে, সহ্য করা যায় এমন কাজই তাকে করতে হবে। এ অবস্থায় ইতিহাস লংঘনের দিকে তাকে ঠেলে দেয়া, ইসলামী আন্দোলনের জন্য কি একটা ভাল সংবাদ হতে পারে ? যে আন্দোলন ব্যতীত সব ধর্মভীরু আশাই বিসর্জন দিতে বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য ?

---

www.pathagar.com

ইসলামে কর্তৃত্ব, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি অধিকার

ইসাত ক্যাম*

শব্দগত অর্থে কর্তৃত্ব বলতে আদেশদানের ও আনুগত্য লাভের ক্ষমতাকে বুঝায়। এভাবে আমরা কর্তৃপক্ষ বলতে সার্বভৌম বা কোন রাষ্ট্রের কর্ণধারকে বুঝে থাকি। তেমনি কর্তৃত্ব বলতে অধঃস্তনের ওপর উর্ধ্বতনের বা সেনাবাহিনীর ওপর একজন অফিসারের বা সন্তানের ওপর পিতার কর্তৃত্বকে বুঝি। কর্তৃত্বের কথা চিন্তা করতে গেলে আমাদেরকে কর্তৃপক্ষ কথাটা যে ধারণার ওপর ভিত্তি করে চালু হয়েছে, তার গোড়ার দিকে তাকাতে হয়। একবার কর্তৃত্ব ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে তা কখনো নির্যাতনমূলক, কখনো স্বেচ্ছাচারী, কখনো জবরদস্তিমূলক বলে মনে হবে। আবার কখনো এটা আইন-সংগত, বৈধ বা ন্যায়ানুগ বলেও মনে হতে পারে। এভাবে দেখা যায় কর্তৃপক্ষীয় ধারণার ওপর ক্ষমতা যতক্ষণ বিরাজ করবে ততক্ষণ নানা ধরনের বিতর্কের অবতারণা হবে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা থেকে আধুনিক জামানার পার্লামেন্ট পর্যন্ত বহুবার বহুভাবে এর ওপর প্রয়োজনীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাই, প্রত্যেক সমাজই তার নিজস্ব কর্তৃত্ব ব্যবস্থার সাথে তার একতা ও সংহতি রক্ষা করে চলেছে।

একই সময় দেখা যায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মানব গোষ্ঠি নিজের অধিকারের কথা বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করছে। এ শব্দটা বহুবার ব্যবহৃত হচ্ছে বলে প্রশ্ন উঠতে পারে (তা হলে মানব গোষ্ঠির জন্য কিসের অনুমতি রয়েছে ? আমরা তো প্রাকৃতিক অধিকার, মানবিক অধিকার, অর্জিত অধিকার, নাগরিক অধিকার, সভ্য হওয়ার অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ও সম্পত্তির অধিকারের ন্যায় বহু অধিকারের কথা বলে থাকি। সংক্ষেপে বলতে গেলে অধিকার বলতে মানুষে মানুষে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিধি-বিধানের সমষ্টিকেই বুঝানো হয়ে থাকে। প্রত্যেক দেশের সংবিধানেই এসব অধিকারের উল্লেখ রয়েছে।

স্বাধীনতার ধারণাটি অধিকারের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। কঠিনভাবে বলতে গেলে, স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির মর্যাদাকে এমন বুঝানো হয় যা নিয়মের অধীনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকে না। তাই এটা হচ্ছে বাধাহীনভাবে কাজ করা। এ অর্থে স্বাধীনতা ভোটাধিকারের সমার্থক। স্বাধীনতা হলো, সমাজ বা সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করার সম্ভাবনা। যা হবে নিজের ইচ্ছামত, নির্দিষ্ট বিধিবিধানের মধ্যে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যক্তির সেই মর্যাদা যে তার রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। "স্বাধীনতা" শব্দটি "অধিকার" শব্দের মত পশ্চিমা সমাজে প্রায়শই ব্যবহৃত। তাদের ইতিহাস হতেই সমাজে শব্দটির উৎপত্তি। এভাবে পশ্চিমা সমাজগুলো এ দু'ধরনের পরস্পরবিরোধী প্রয়োজনীয় শব্দের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছে। এখানে কর্তৃত্বের অর্থ সমাজের একতা রক্ষা করা এবং

*প্রফেসর ইসাত ক্যাম-ডিপার্টমেন্ট অব পলিটিক্যাল সায়েন্স, ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটি, ইস্তাম্বুল

www.pathagar.com

স্বাধীনতা হ'ল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ। পশ্চিমা সমাজে 'স্বাধীনতার' মত 'অধিকারের' কথাটাও প্রায় বহুল অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাদের জীবনে এগুলো ঐতিহাসিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমা সমাজ সেজন্যই পরস্পর বিরোধী এ দু'টো প্রয়োজনীয় শব্দ, কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা -এর সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ প্রদান করতে চেষ্টা করেছে। কর্তৃত্ব হলো সমাজের একতা রক্ষার জন্য এবং স্বাধীনতা হলো কর্তৃত্ব থেকে ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য। সমসাময়িক পশ্চিমা সমাজ উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের যে চেষ্টা করেছে, তা পরস্পরবিরোধী প্রয়োজনের সন্তুষ্টি বিধানের অন্বেষা থেকেই উদ্ভূত।

পশ্চিমা সমাজের গবেষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যখন এ ধারণাগুলো বের করা হলো তখন এগুলো অন্যান্য সমাজে ব্যবহৃত হতে লাগলো। এর ফলে অনিবার্যভাবে দেখা গেল অন্যান্য সমাজের ওপর সমালোচনার একটা প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বৈষম্য কোথায় তা বের না করে যে কেউ পশ্চিমা সভ্যতার সাথে অপশ্চিমা সভ্যতার ত্রুটি বের করার চেষ্টা ও অনুসন্ধান চালাতে পারে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলতে গেলে, পশ্চিমা সমাজগুলো কিভাবে ভেদাভেদের সৃষ্টি করছে, তা দেখানোই অপেক্ষাকৃত ভাল হবে। আর তা করতে গিয়ে ভেতর থেকে তাদের বুঝার চেষ্টা করাই হবে উন্নততর পন্থা। ইসলাম হলো খৃষ্ট ধর্ম থেকে বেশ ভিন্ন ধরনের একটা ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা। এর বিশেষ বিশেষ শিক্ষা আয়ত্ত করেই এটাকে ভালভাবে বোঝা যেতে পারে। ঐসব জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমেই অতীত ও সমসাময়িক মুসলিম সমাজের বিচার বিশ্লেষণের জন্য সম্ভাব্য সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

ইসলামে কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা

রাজনৈতিক ধারণা

যার ওপর ভিত্তি করে পবিত্র জিনিসগুলোকে উপস্থাপন করা হয়, তা বিকাশ লাভ করে বিশেষ সমাজের দ্বারা। বিশ্বাসের ব্যাপ্তি, শ্রেণী, ধরন ও তীব্রতা গভীরভাবে নির্ভর করে সে সমাজের বিভিন্ন গ্রুপের গঠন ও সংস্কৃতির ওপর। একটি গোষ্ঠীর মানসিক প্রতিনিধিত্ব ও সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক দিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর আবির্ভাবের সাথে সাথে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে থাকে। এ ভন হারনাকের মতে খৃষ্ট ধর্ম তার জন্মস্থান এশিয়া মাইনরে খ্যাতি লাভ করে যেখানে মানুষের শহুরে জীবন ছিল নিবিড়, আর এভাবেই এর গীর্জাগুলো নগরের আদলে তৈরী করা হয়। অন্যান্য ধর্ম বিভিন্ন কৃষক বা যাযাবর গোষ্ঠীর মাঝে বিকাশ লাভ করে ব্যক্তি বা দলীয় উভয় পর্যায়ে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে।

৬২২ খৃস্টাব্দে মদীনায় ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে ও দ্রুত বিস্তার লাভ করে। মুহাম্মদ (সা) শুধুমাত্র একজন পয়গাম্বরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাও। তাঁর নেতৃত্বে দশ বছরেরও কম সময়েই আরব গোত্রগুলোর মধ্যে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ঐক্য সাধিত হয়। এ সংগ্রাম আরব দেশগুলোর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয় এবং মুহাম্মদ (সা) এর ওফাতের পর দৃঢ় পদে ইসলাম বিস্তার লাভ করতে থাকে যতক্ষণ না পশ্চিম হতে ভারত, বলকান থেকে জাঞ্জিবার এবং সুদান ও মালয়েশিয়া পর্যন্ত ইসলামের প্রসার অব্যাহত থাকে।

ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্য হলো, পয়গাম্বর ও রাষ্ট্রপ্রধান –এ দ্বিবিধ ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সা) এর মর্যাদা। ইসলামের বার্তা কুরআন ও *সুন্নাহর* মধ্যেই পাওয়া যায় যা খৃষ্টান ধর্মে দেখা যায় না। আধ্যাত্মিক ধর্ম প্রচার এবং পার্থিব ধর্ম প্রচার দু'টোই অবিচ্ছেদ্য। এভাবে লুই মেসিগননের মতে, কুরআনকে 'একটি বিশ্ব-রাষ্ট্রের প্রত্যাদিষ্ট বিধান বলা যেতে পারে।'

ধর্মীয় সমাজতত্ত্ববিদগণ বহু পূর্ব থেকেই সমাজ ও ধর্মের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতার কথা বলেছেন। ধর্মীয় বিষয়গুলো সামাজিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত, আবার ধর্মের সামাজিক সংগঠন ও কর্তৃত্বের সমস্যাকে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় দল, পরিবেশ ও অভিনব ধর্মীয় প্রতীক হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এটা যদিও একটি সামাজিক প্রপঞ্চ তবুও সমাজের তুলনায় ধর্ম কিছুটা স্বাধিকার ভোগ করে থাকে। যেমন মার্কস ওয়েবার প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ ও পুঁজিবাদের ধারণার ওপর লিখিত গ্রন্থে তা দেখিয়েছেন। একই সময় এটা সম্প্রদায়ের বেশ কিছু ব্যবহারিক দিকের প্রয়োজনীয়তাও মেটায় যেমন সংহতি ও একতা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। ইসলামে এমন একটি রাষ্ট্রের কথাই বলা হয়। এমন রাষ্ট্র রাসূল (সা) ছিলেন যার রাষ্ট্রপ্রধান।

মুসলিম রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি ? মুসলিম রাষ্ট্র হবে বিশ্বরাষ্ট্র যেখানে ধর্মের বলেই নাগরিকত্ব বহাল থাকে। এভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের সংবিধানকে সহজেই কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রণয়ন করা যেতে পারে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা) একজন রাষ্ট্রনায়কের চেয়েও মহান, তিনি হলেন একটি ধর্মীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। কুরআন ও সুন্নাহ একটি সংবিধানের চেয়ে বড়। এগুলো হলো ধর্মীয় আচার-আচরণের সমষ্টি এবং সমগ্র মানবজাতি ও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সৃষ্ট।

মুসলিম সমাজ এমন ধরনের একটি সমাজ, যেখানে জাতিগত কোন ভেদাভেদ নেই। এখানে ধর্মীয় আস্থাই হলো বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। এটা হল একটি রাজনৈতিক একক, একটি রাষ্ট্র, সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ একটি জনগোষ্ঠী। এখানে গোষ্ঠীগত পর্যায়ে একতাকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় আর এরূপ উম্মাহ্ই হলো মুসলিম সমাজ।

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং এর দ্বারা শাসিত গোষ্ঠীর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ উম্মাহ্ হলো আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীন রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত বিশ্বাসীদের সংগঠন। মুসলিম সমাজের কর্তৃত্বের ধারণা কোন সমস্যা নয়। কর্তৃত্ব শুধু আল্লাহরই। কর্তৃত্ব হলো ঐশী ব্যাপার আর উম্মাহ্র দায়িত্ব হলো সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন।

www.pathagar.com

সুতরাং মুসলিম সম্প্রদায়ের একতা এর ঐশী উদ্ভবের ফল। যেমন লুই মেসিগনন বলেন, 'উম্মাহ্ হলো জনগণের এমন একটি গোষ্ঠী যাদের নিকট আল্লাহ রাসূল পাঠিয়ে থাকেন এবং বিশেষ করে যারা তাঁর নসিহত শুনে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে। একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। 'ইসলাম ও এর চুক্তি, এবং এর অধীনস্থ সম্প্রদায় যেখানে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব বিষয়াদি একীভূত হয়, এগুলোর সাহায্যে দেখা যায় আমরা খৃষ্ট ধারণার চেয়ে কতদূরে। খৃষ্টধর্মে খোদার অধিকার ও সীজারের অধিকার পৃথক। ইসলাম হলো আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আল্লাহর কর্তৃত্ব।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কে দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে ? এটা হবে একজন মানুষ এবং মাত্র একজন মানুষ। উম্মাহ বা ঈমানদার সম্প্রদায় তাঁর প্রতি পুরো আনুগত্য প্রদর্শন করে। তাই ইসলাম তত্ত্বগত রাজনৈতিক ধারণা থেকে পার্থিব কর্তৃত্বের সমস্যাকে তিরোহিত করে। সমস্যা যদি কিছু থেকেও থাকে, তা ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে প্রথমেই বা ক্ষমতায় আরোহণের সময়েই দেখা দেয়। কিন্তু তবুও তা অনায়াসেই মিটে যায়। কেননা সফলতা হলো আল্লাহরই দান। আর কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য আদায় করা যায় আনুগত্যপূর্ণ ইবাদতের মাধ্যমেই।

মুসলিম সমাজে পার্থিব শক্তিকে অবাধ মনে করা হয়। কেননা এখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্বটা আসে সরাসরি আল্লাহর তরফ থেকে। আর এ কর্তৃত্ব তাঁর নিকট অনন্তকাল ধরে বিরাজমান। প্রকৃতপক্ষে কখনো এটাকে প্রত্যার্পণ করা হয় না। এমন কি যখন এটাকে মানুষের দ্বারাই বাস্তবে পরিচালিত করা হয়ে থাকে, তখনো আল্লাহর কর্তৃত্ব কোন স্বকীয়তাই হারায় না। কারণ এটা এভাবেই কার্যকর করা হয়।

ইসলাম প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণের দিকে ধাবিত হয়। ইসলামের স্বাভাবিক একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল বিজিত এলাকার ওপর একটি কেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার চালু করা। শরীফ মারদিনের মতে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্বের ওপরই মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি নির্ভর করে। সরকারী কোষাগার আল্লাহরই কোষাগার। রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী আল্লাহরই অনুগত সৈন্যবাহিনী। সরকারী কর্মচারীরা আল্লাহরই কর্মচারী। সবারই দ্বৈত বৈধতা রয়েছে। যা বেশী গ্রহণযোগ্য তা হলো ধর্মীয় বৈধতা। কাজেই মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক ধর্মীয় কর্তৃত্বের আধিপত্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটাই সমস্যা। ইসলামে কর্তৃত্বের সমস্যাটাকে এল গারডেটের ভাষায় সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, 'ইসলাম ধর্ম ও সমাজ উভয়ই। ইসলামে কোন গীর্জা নেই। ইসলামে শুধু রয়েছে বিশ্বাসীদের জাতি। যার হাতে আদেশের কর্তৃত্ব রয়েছে, তার আনুগত্য করতেই হবে। কেননা সে হলো আল্লাহর প্রতিনিধি।'

এরূপ একটা সমাজে নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কি হবে ? ব্যক্তির আচার-আচরণ কি হবে, তা'ও ধর্মে বিশ্লেষণ করা রয়েছে। ইসলাম শুধুমাত্র একটি

www.pathagar.com

শক্তিশালী ও কেন্দ্রাভিমুখী বিশ্ব-রাষ্ট্রের বিধি-বিধানকেই ধারণ করেনা। এটা একটা ধর্মীয় সমাজের ভিত্তিও স্থাপন করে যে সমাজটা গঠিত হয়ে থাকে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে। যাদের প্রাত্যহিক কর্ম-পদ্ধতি পরিচালিত হয় বিভিন্ন বিধি-বিধানের দ্বারা। এসব বিধি-বিধান পবিত্র জিনিস দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। জে কেথোড আরব দেশগুলোর পবিত্র কাঠামো সম্পর্কে গবেষণা করেন। তার মতে, আরব দেশটি এমন একটি বিশ্বের অংশ, যা পবিত্রতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র জিনিসগুলোকে সতর্কতার সাথে নিষিদ্ধ দ্রব্যের সীমাবদ্ধ রূপরেখার সাহায্যে রক্ষা করা হয়েছে। হারাম ও হালাল এ শব্দের দ্বারা এমন জিনিসই বুঝানো হয়, ব্যক্তির হাবভাব ও আচার-আচরণে যা গ্রহণীয় ও অগ্রহণীয়। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের মাধ্যমে এভাবেই একজন ব্যক্তি ঈমানদার হয়ে সমগ্র উম্মাহর একজন সদস্যে পরিণত হয় ও একজন খাঁটি মুসলিম হয়। এল গারডেট-এর ভাষায় উম্মাহ্‌র ধারণার সাথে সাথে আল্লাহর সঙ্গে প্রত্যেক ঈমানদারের সম্পর্ক গভীর হয় এবং ঈমানদারের মধ্যে নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। মুসলিম এমন একটি সম্প্রদায়, প্রত্যেক সক্রিয় ব্যক্তিই যার সদস্য। ফরয নামায, দান খয়রাত, রামাযান, হজ্জ পালন এবং অন্যদিকে সুরা, জুয়া ও জবর দখল থেকে দূরে থাকা ইসলামের বিধান। মুসলিম সমাজে জীবন ব্যক্তিগত হওয়ার চেয়ে সামষ্টিকই হয়ে থাকে। এখানে সামাজিক ও গোত্রীয় সম্পর্ককে স্বীকার করা হলেও ইসলাম গভীর ভ্রাতৃত্ব ও সমতার বাণী শুনায়।

সর্বশেষ বিশ্লেষণে তাই মুসলিম সমাজকে একটি আদর্শ সাম্যবাদী ও তাওহীদবাদী সমাজ হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখা যায়, যে সমাজে প্রত্যেক সদস্যই সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সব ঈমানদারই আল্লাহর নিকট সমান। ব্যক্তিগত মুক্তির অন্বেষণ ও অতীন্দ্রিয়বাদ উভয়ই ইসলামে অচল। উম্মাহর ধর্ম হিসেবে ইসলামে স্বাধীনতার সাম্য তাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদ, ক্ষমতা ও সম্মানের প্রতিশ্রুতি পার্থিব জীবনে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি ইসলামে স্বাধীনতার কথা বলে থাকে, তাহলে পশ্চিমা সমাজে স্বাধীনতার যে ধারণা রয়েছে তার চেয়ে ভিন্ন ধরনের স্বাধীনতার কথাই বুঝানো হবে। এর অর্থ, ভোটদানের অধিকার। ইসলামের এটা একটা নতুন জিনিস যার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা যায়। ইসলামে যান্ত্রিক বলতে কিছু নেই। ব্যক্তিকে আল্লাহ বুদ্ধি দিয়েছেন এবং ভাল কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। উম্মাহ গঠন ও কর্তৃত্বকে মানতে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু ব্যক্তি নিজের চিন্তাধারা মুতাবিক স্ব সিদ্ধান্তে কাজ করে। যদি সে অবাধ্যতা প্রদর্শন করে, তাহলে দোষটা তারই হবে। কেননা তাকে ভাল ও মন্দ উভয়টা করারই অধিকার দেয়া হয়েছে। ইসলামের এ ধারণা পশ্চিমা বিশ্বে প্রচলিত ধারণার চেয়ে ভিন্নতর। এ পর্যায়েও ইসলাম সামষ্টিক জীবনে মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করে এবং উম্মাহর মধ্যে জীবন সঞ্চার করে থাকে।

ইসলাম ও আজকের দাবী

সব বড় ধর্মের ন্যায় ইসলামও আজ বিস্তার লাভ করেছে। সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে ইসলামও সামাজিক কাঠামোর ব্যবহারিক প্রয়োজনে বিবর্তিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

সপ্তম শতাব্দীতে আরবের যাযাবর সম্প্রদায়ে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। আজকের সমাজের যে রাজনৈতিক প্রয়োজন ও যে বাহ্যিক কাঠামো এর বর্তমান নির্ধারণ করে, তা মৌলিকভাবেই ভিন্ন ধরনের। প্রথমত একটি ধর্ম হলো সংগতিপূর্ণ বিশ্বাসের বিষয় যা মানুষকে পরিচালিত করে একটি বিশেষ শত্রুকে পরাভূত করার জন্য বা বিশেষ দেশকে দখলের জন্য। সুতরাং এ অবস্থাটাকে এভাবে বিবেচনা করা কি সংগত হতে পারে, যে অবস্থার মধ্যে বর্তমানে মুসলমান দেশগুলোকে দেখা যায়? এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এ বিশেষ সময়ে তাদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার রূপটা কেমন হবে ?

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশই উন্নয়নশীল দেশ। এর মধ্যে কোন কোনটি বেশ অনুন্নত। এগুলোর কোন কোনটির বস্তুগত সম্ভাবনা নেই যার সাহায্যে তারা তাদের দারিদ্রাবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারে। অন্যগুলো অনুন্নত হলেও তাদের ভূমিতে জ্বালানীর মওজুদ থাকায় তারা যথেষ্ট ভাগ্যবান। তা সত্ত্বেও অন্যান্যরা তাদের দেশকে শিল্পায়িত করার জন্য মহতি প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সে যা হোক, সবগুলো মুসলিম দেশই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্যান্য বিভিন্ন টানাপড়েন মুকাবিলা করে যাচ্ছে। এ অবস্থায় অসহিষ্ণুতা, একাত্মতার সমস্যা, পূর্ববর্তী ভারসাম্য পদ্ধতির সংকট এবং মানুষকে পুনঃ নিশ্চয়তাদান ও সমবেত করার উদ্দেশে আদর্শিক মূল্যবোধের অনুসন্ধান এসব দেশে বেশ সম্প্রসারিত হয়েছে। এসব দেশে অভ্যন্তরীণভাবে মুসলিম দলসমূহের উন্নয়ন একটি সুবিস্তৃত ঘটনাও বটে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আরব দেশগুলোতে একটি বিরাট বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। এসব সম্পর্কের মধ্যে পশ্চিমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করতে দেখা যায়। সে যা হোক, অধিকতর বৈপ্লবিক পদক্ষেপ পশ্চিমা সমর্থন বা পশ্চিমাদের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শনের ধ্বংসাত্মক ধারণাকে প্রবল করেছে। এটি পুনরায় ধর্ম ও সমাজের মধ্যে ব্যবহারিক সম্পর্ককেই উপস্থাপন করে। আজকাল দরিদ্র ও অনুন্নত মুসলিম দেশগুলো অপমানের ব্যাপারে প্রতিবাদ করছে। এটা উম্মাহকে পূনর্গঠন করছে, সংগ্রামের ধারাকে শাণিত করছে। এরূপ আমূল সংস্কার পদ্ধতিতে গড়ে উঠছে একজন নতুন ধরনের নেতা, যিনি অদম্য ও আপোষহীন।

সকল জাতিতেই এই সমষ্টিগত উদ্দীপনার প্রবাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং যে সকল পরিবর্তন জনগোষ্ঠীকে একতাবদ্ধ ও শক্তিশালী করছিল, সে সবের সাথে যুক্ত হচ্ছে শক্তিশালী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব । ইসলামে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো একটি সত্যের দু'টি দিক। নির্বাহী কর্তৃপক্ষ অবধারিতরূপে অধিকতর শক্তিশালী হচ্ছে ধর্মীয় অনুভূতি বৃদ্ধি ও সংগ্রামের আমূল পরিবর্তন ঘটার সাথে। একইভাবে উম্মাহর সংগ্রামী চেতনাও শক্তিশালী হচ্ছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের দিন দিন বেড়ে ওঠার কাজে আরো ঘনিষ্ঠভাবে শরীক হওয়ার জন্য ও ঈমানদারদের স্বাধীনতার নিমিত্ত উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজন অবধারিত। উম্মাহর অনুভূতি ও প্রতিযোগিতায় শরীক হওয়ার জন্য ইসলাম ঈমানদারদের সাম্যের প্রতি স্বীকৃতি দান করে। যুদ্ধ বা শান্তি

www.pathagar.com

যে কোনটিতেই মানুষ নিয়োজিত থাকুক না কেন, ইসলাম মানুষের ওপর নির্ভরশীল কর্তৃপক্ষীয় স্বাধীন প্রজাতন্ত্র। এটা কখনো পশ্চিমা গণতন্ত্রের ন্যায় উদার, অনুভূতিপ্রবণ ও ব্যক্তিতান্ত্রিক নয়। ইসলাম সামগ্রিকভাবে একটি জীবনবিধান। এখানে স্বাধীনতা হলো সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাধীনতা। সমষ্টিগত স্বাধীনতার নিকট ব্যক্তি স্বাধীনতা এখানে অচল।

ইসলাম, অটোম্যান সাম্রাজ্য ও তুরস্ক প্রজাতন্ত্র

অটোম্যান সাম্রাজ্য ছিল ধর্মতান্ত্রিক। এটি ধর্মীয় বিধি বিধান দ্বারা শাসিত হত। এতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আল্লাহর তরফ থেকে সরাসরি আসে বলে বিবেচিত হত এবং তা' সত্ত্বেও রাসূল (সা) এর ইসলামী রাষ্ট্র ও অটোম্যান সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য ছিল। প্রথমেই অটোম্যান সাম্রাজ্যে ছিল বহু ধর্মীয় সমাজ যেখানে প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল গীর্জাকেন্দ্রিক। তবে একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছিল। এখানে মুসলিমগণ ছিল সংগঠিত, যেহেতু ইসলামে গীর্জার অস্তিত্ব নেই। তাই অটোম্যান সাম্রাজ্যে গোঁড়া খৃষ্টান, য়াহুদী, আর্মেনীয় ও মুসলিমগণ পাশাপাশি বসবাস করতো। রাসূল (সা) এর রাষ্ট্রের মত এখানে নাগরিকতা ধর্মের মাধ্যমে নির্ধারিত হতো না বরং অটোম্যান রাজবংশের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই নির্ধারিত হতো। রাজবংশ ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও ইসলামের প্রতি এটা ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের আনুগত্য। সাম্রাজ্যটা মূলতঃ যুদ্ধবাজ ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারের পূর্বেও ঐ ঐতিহ্য ইসলামী বৈধতার কেন্দ্রবিন্দুতেই বিদ্যমান ছিল। সংস্কারের যুগে প্রাচীন ও আধুনিক প্রতিষ্ঠানের সহাবস্থানের প্রারম্ভে তুর্কী সাম্রাজ্য পশ্চিমা রীতি-নীতিতে প্রবেশ করে। কালের স্রোতে, পশ্চিমা রীতির প্রতিষ্ঠানগুলো স্পষ্টত চিরায়ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণুতার ফলে প্রতিষ্ঠানের মান-সম্মান হ্রাস পেতে থাকে এবং ঐগুলি আর পশ্চিমাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি।

মুস্তফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তুরস্ক একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যায়। জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সরকার স্বভাবতঃ জাতির প্রতি আনুগত্যকে পছন্দ করে। তাই মুস্তফা কামাল যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন তা ছিল জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুরস্ক বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। নির্বাচনী প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ কামালের বৈপ্লবিক আদর্শ অপেক্ষাকৃত নমনীয় হয়ে ওঠে এবং সেখানে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটতে থাকে। ষাট-এর দশকের দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে এসব ধ্যান-ধারণা বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তুরস্কে আদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আদর্শিক পুনর্গঠনের ফলে এটা যুক্তিযুক্ত হয় যে, সাময়িকভাবে রাজনৈতিক দলগুলো যুগের বাস্তবতার ভিত্তিতে গঠিত হবে।

www.pathagar.com

Abd-El-Jalil, J. M. *Aspects interieurs de l 'Islam* (Paris, Editions de Seuil, 1949)
Arsel, I. *Teokratik Devlot Anlayisindan Demokratik Devlet Anlayisina* (Ankara, 1975)
Bennabi, M. *Islam Davasi* (Istanbul, 1967)
Berki, A. H. *Islam Mukuku,* Ornek mat. (Andara, 1955)
Cahen, C. *L'Islam des origines au debut de l' Empire ottoman* (Paris, Bordas, 1970)
Carre de Vaux. *La doctrine de l` Islam* (Lyon, G. Beauchesne, 1909)
Chethod, M. J. *Les structures du sacre chez les Arabes* (Paris, Maisonneuve, 1964)
Cuvillier, A. *Sociologie des religions* (Paris, PUF, 1972)
Gibb, H. A. R. *Les tendances modernes de l' Islam* (Paris, Maisonneuve, 1949)
Golpinarli, A. *Siilik* (Istanbul, 1978)
Hamidullah, M. *Islamda Devlet idaresi* (Istanbul, 1963)
Hamidullah, M. *Islama Giris* (Istanbul, 1971)
Humeyni, Anetullah, *Islam Fikhinda Devlet,_* Dusunce yay (Istanbul, 1979)
Mardin, S. *Din ve Ideoloji* (Andara, 1968)
Marti, K. *Les religions del l 'Ancien Testament,_* Vol. xi
Miquel, Andre, *L`Islam et sa civilisation* (Paris, A. Colin, 1968)
Oktem, N. *Ozqurluk sorunu ve Hukuk* (Istanbul, 1977)
Risler, J. *L`Islam moderne* (Paris, Payot, 1963)
Rondot, Pierre. *L`Islam et les Musulmans* (Paris, 1958)
Sabri, Mustafa. *Dini Mucedditler* (Istanbul, 1969)
Sava, Pasa. *Islam Hukuku Nazariyati Hakkinda bir Etud* (Andara, 1955)
Sena, C. *Hazreti Muhammedin Felsefesi* (Istanbul, 1971)
Waardenburg, *J.J. L`Islam dans Le miroir de l' Occident* (Paris Mouton, 1962)
Wach, Joachim, *Sociologie de La religion-La sociologie au XXe Siecle* (Paris, PUF, 1947)
Ward, R. and Rustow, D. *Political Modernisation in Japan and Turkey* (Princeton Press, 1964)
Watt, W. M. *Islam and Integration of Society_* (London, 1961)
Weber, Max. *Economie et societe* (Paris, 1971)

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজে নারী
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার

শাহজানান শাকারচি ইয়াসীন*

ইসলাম শুধু বিশ্বাস নয়, এ ধর্ম মানব জীবনের এমন একটি দিক নির্দেশনা যা মানুষের সমগ্র কার্যক্রমকে সঠিক পথে পরিচালনায় সবচেয়ে বড় সহায়ক। এটিই একমাত্র ধর্ম যেখানে সামাজিক উন্নয়ন ও নারীর মর্যাদাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকাকে ইসলামই প্রথম স্বাগত জানিয়েছে। সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করাই ইসলামের মৌল নীতি–একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে[১]।

ইসলামী ঐক্যজোটের ভূমিকা ব্যাপক। যুগে যুগে ইসলাম সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে মুসলমান সমাজে ধর্মকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। কারণস্বরূপ বলা যায় যে, অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলি বিদেশী শাসকদের করায়ত্ত ছিল। ফলে মুসলমানগণ মূল্যবোধের ন্যায় অনেক কিছু হতেই বঞ্চিত ছিল। "মুসলিম পারিবারিক আইন" বলতে যা বোঝায় সেকালে তেমন কিছুই ছিল না।

এ নিবন্ধে মূলত ইসলামে নারীর অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আলোচনায় সাধারণ ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম আরব দেশগুলোকে সামনে রেখে মহিলাদের বৈধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ওপর আলোকপাত করা হবে। এতে মুসলিম বিশ্বের এ অংশে উন্নয়নের বিভিন্ন গতিধারার উল্লেখ থাকবে।

ইসলামী সমাজে নারীর আর্থ-সামাজিক অধিকার

প্রাক-ইসলাম যুগে নারী

প্রাক-ইসলাম যুগে নারী বিয়ের আগে পিতার এবং বিবাহের পরে স্বামীর অধীনস্থ ছিল। সমাজে বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল এবং পরিবারে পুরুষের ভূমিকাই ছিল মুখ্য[২]। এমনও দেখা গেছে যে, বিয়ের পরে স্ত্রীকে স্বামীর বাড়ীতে যাওয়ার সাথে সাথেই তার নিজস্ব সত্তাকে ভুলে যেতে হয়েছে। তখন একজন পুরুষেরই কেবল তালাক দেয়ার অধিকার ছিল[৩]।

শাখ্ত-এর মতে, "মুহাম্মদ (সা) এর সময়ের পূর্ব পর্যন্ত বেদুঈন ও অন্যান্য শ্রমবিমুখ আরব সমাজে সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল। সুসংগঠিত কোন বিচার ব্যবস্থাও ছিল না[৪]"। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য

*প্রফেসর শাহজানান সাকারচি ইয়াসীন-বাগদাদ ইউনিভার্সিটি

www.pathagar.com

প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব বলতে কিছুই ছিল না। একমাত্র পবিত্র কুরআনেই নারীর মর্যাদার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাক-ইসলাম যুগে কোন কন্যা সন্তান জন্মালেই তাকে হত্যা করার নিয়ম চালু ছিল। এ ধারণা পোষণ করা হত যে, কন্যা সন্তান জন্মালেই পরিবারে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে অথবা যুদ্ধকালীন অবস্থায় মেয়েরা শত্রুদের হাতে বন্দী হলে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে সমাজের বিচারে হেয় প্রতিপন্ন হতে হবে[৫]। কুরআনের ভাষ্য হলো, যুদ্ধে অনেক পুরুষের জীবন দেয়ার কারণেই দারিদ্র ও মহিলার সংখ্যা বেড়ে যায়[৬]। কুরআনে এর নিন্দা করা হয়েছে [১৬:৫৮-৫৯]।

"ওদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সংবাদ দেয়া হয়, তখন মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানিহেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে ওকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে ? সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট[৭]!"

পবিত্র কুরআনে শিশু কন্যাকে জন্মক্ষণে পুঁতে ফেলার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে ও তার জন্মকে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং তাকে আল্লাহর দান বলে বর্ণনা করা হয়েছে [৬ ঃ ১৪১]।

'যারা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানকে হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশে নিষিদ্ধ গণ্য করে, তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথ প্রাপ্তও ছিলো না[৮]।'

প্রাক-ইসলাম যুগে কোন আরববাসী মারা গেলে তার উত্তরসূরী মৃত ব্যক্তির পোষাক পরে মৃতের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী বলে দাবী জানাতে দ্বিধা করত না, অর্থাৎ বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করত। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী এ ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালে তাকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে যৌতুক আদায় করা হত। উপরন্তু তার স্বামীর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সবকিছুই কেড়ে নেয়া হত[৯]।

বিয়েতে সাধারণত পাত্রীর আত্মীয় স্বজনদের মধ্য থেকেই স্বামী নির্বাচন করা হত। জীবনসঙ্গী নির্বাচনের জন্য কন্যার পছন্দ অপছন্দের অধিকার থাকা সত্ত্বেও পিতা বা অভিভাবকদের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত এবং ইবনে আম মতের বিয়েকে প্রাধান্য দেয়া হত। কন্যা সাবালিকা হলেই তার বিয়ে দেয়া হত। কিন্তু ছেলেদের ব্যাপারে বয়সের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিলনা। কন্যার তুলনায় বরের বয়সের মোটেও গুরুত্ব দেয়া হত না। উপযুক্ত বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য মর্যাদার দিক থেকে বরকে সমান বা এর ওপরে হতে হত। কেননা কনের অবস্থা ওপরে হলে বংশের অসম্মানের প্রশ্ন জড়িত ছিল[১০]। আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, একজন নারীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে কোন অধিকার তো ছিলই না বরং বিয়ে বাবদ ধার্য দেন মোহরেও

www.pathagar.com

তার কোন হক ছিল না। এভাবেই একজন নারী সম্পূর্ণভাবে পুরুষের ইচ্ছার কাছে বাঁধা পড়ে যেত[১১]।

ইসলামই প্রথম উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর মৌলিক অধিকার প্রদান এবং প্রাক-ইসলাম যুগের নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইসলামী সভ্যতা এবং ধ্যান ধারণা বিকাশের সাথে সাথে নারীর জীবন যাত্রার মান উন্নত হয় এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তার প্রভাব বিস্তারলাভ করে। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে. পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেছে[১২]।

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে নারী

ইসলাম জাহিলিয়াত যুগের সকল অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে নারীকে মুক্তি দিয়েছে এবং কুরআন, হাদীস ও সুন্নাহ মতে নারীর জীবন যাত্রার উন্নতি সাধন করেছে। কুরআনে পরিবার তথা সমাজে মায়ের অগ্রণী ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। মুসলিম জাতিকে কুরআনে উম্মাহ বলা হয়েছে। 'উম্মুল' শব্দ থেকে উম্মাহর উৎপত্তি, যার অর্থ 'মা'। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মা প্রত্যক্ষভাবে পরিবারকে এবং পরোক্ষভাবে সমাজ তথা জাতিকে প্রভাবিত করে[১৩]। রাসূল-ই-আকরাম (সা) কে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছে, এটা নিছক প্রচারণা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ রাসূল (সা) শুধু তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনই ছিলেন না, তিনি এর বিধানও প্রবর্তন করেছিলেন[১৪]।

আইনের ব্যবহার, কুরআনে যার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, ধর্মীয় এবং নৈতিক মানের এই যুগল ধারা সমানভাবে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছিল। মূলকথা, নারীর মর্যাদার উন্নতির সাথে সাথে পারিবারিক জীবন, প্রতিশোধ প্রথা, মদ্যপান ও জুয়া খেলার ব্যাপারে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে[১৫]।

মুহাম্মদ (সা) এর ওফাতের পর খলীফাগণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অধিকারী হন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব তাঁদের ওপর অর্পিত হয়। ইসলামের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে এ বছরগুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (কিন্তু নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের সমস্যা সমাধানে খলিফাগণ এ সময়ে প্রবর্তিত কুরআনি বিধি বিধানের অনুসরণসহ কুরআনি বিধি বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রাচীন আরবের সনাতনী নিয়ম কানুন ও প্রচলিত বিধি বিধান প্রয়োগেরও চেষ্টা করেন[১৬]।)

কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। কুরআনই আদর্শ ও অলংঘনীয়। নারীর অবস্থান নির্ণয়ে প্রধান নির্ণায়ক হিসেবে কুরআনের যে বক্তব্য আমরা তার ওপরেই নির্ভর করব। প্রায়শই একথা বলা হত যে, ইসলামে যেহেতু নারীর স্থান অনেক নিম্নমানের, সেহেতু তারা কখনোই পুরুষের সমান হতে পারে না। কিন্তু কুরআনে নারীর মর্যাদার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয়, কত ভ্রান্ত এই ধারণা। 'হে

www.pathagar.com

মানবকুল, আমি তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতিতে ও গোত্রে বাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে বুঝতে পার। এটা নিশ্চিত সত্য যে, সে-ই সব চাইতে নম্র ও বিনয়ী, যে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নির্দেশিত কার্যাবলী অনুসরণ করে চলে' [৪৯ ঃ ১৩]।

একমাত্র ব্যক্তি বিশেষের স্তর বিন্যাসের প্রক্রিয়া হিসেবে একজন মানুষকে অপর মানুষ হতে বিশেষভাবে বিচার করার প্রয়াসে জাতি, বর্ণ এবং লিঙ্গেরই পার্থক্য রয়েছে। তা ছাড়া অপরাপর সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী পুরুষ সবাই সমান [৩৩ ঃ ৩৫]।

অকাট্য যুক্তি হলো, নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান নয় [৪ ঃ ৩৪]। যেমন বলা হয় যে, পুরুষের কর্তৃত্বে রয়েছে নারী। আল্লাহ যেমন একজনের ওপর আরেক জনকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। নারীর জন্য তারা [একের সমর্থনে] তাদের সম্পত্তি ব্যয় করে থাকে। এখানে যা বুঝানো হল, তা এই যে, পুরুষই হবে পরিবার প্রধান। নারীর দায়িত্ব হবে শিশু সন্তান প্রতিপালন করা ও গৃহাভ্যন্তরের অন্যান্য সব দায়িত্ব পালন আর পুরুষের দায়িত্ব হবে বাড়ীর বাইরের বিষয়, সে-ই পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী[১৭]। তবে নারী-পুরুষের মর্যাদা যে সমান তার প্রমাণ এই যে, মুহাম্মদ (সা) এর সময়ে নারীরা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতো।

অন্দর মহলকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করার জন্য ইসলামে পর্দা প্রথার প্রবর্তন করা হয়নি। জাহিলি যুগেও এ বিধান প্রচলিত ছিল। এমনকি বিগত শতাব্দীতেও শুধুমাত্র মুসলিম সমাজে নয়, মধ্যপ্রাচ্যের খৃস্টান এবং য়াহুদী সমাজে নারীর পর্দা এবং অন্দরমহলকে অবহেলা করা হতো না[১৮]। প্রাচীন পারস্যে নারীরা সাধারণত পর্দা করে চলত। সমাজে বিশেষ করে উঁচু শ্রেণীতে পর্দা প্রথাকে বেশ সম্মানের চোখে দেখা হত। পর্দা এবং অন্দরমহলের প্রতি শ্রদ্ধা নারীর জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক বিবেচিত হত। নির্জনতার জন্য একজন নারীর স্থান ছিল অনেক উঁচুতে এবং তাকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হত[১৯]।

কুরআনে (৩৩:৫৯) আল্লাহ বলেন, মুহাম্মদ (সা) এর বিবিগণ এবং তাঁদের অনুসারীদের পর্দা প্রথা এজন্যই যে তাঁরা জনসমক্ষে বের হলেও কখনও কোন অসম্মান প্রদর্শন করা হত না[২০]। কুরআনে (২৪ ঃ ৩১) নারীকে যেমন আদর্শবাদী হতে বলা হয়েছে, তেমনি পুরুষকেও সেভাবে চলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ নিয়মে কখনই কারও পার্থক্যের তারতম্য বা বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় না।

মুহাম্মদ (সা) এর বিবিগণ কর্তৃক পর্দা করার এ প্রথাকে উদাহরণ এবং বিশেষ সম্মানের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। আঠার শতাব্দীর শেষাংশে একমাত্র ক্রীতদাস ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত নারী জাতিকে পরিবারের অভ্যন্তরীণ বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল[২১]। একজন ক্রীতদাস এবং একজন মুক্ত নারীকে চিহ্নিত করার সাথে সাথে স্বভাবতই দু'টো আলাদা সমাজ গড়ে ওঠে–একটি নারীর, অপরটি

www.pathagar.com

পুরুষের। এখানে একটা কথা পরিষ্কার যে, কুরআনের কোথাও অভ্যন্তরীণ বন্দীদশা ও পর্দার কথা সমান অর্থে উল্লেখ করা হয়নি। এতে এ-ই প্রতীয়মান হয় যে, এ ব্যবস্থায় স্থানীয় রীতিনীতি এবং চিন্তাধারা নারীর অস্তিত্বকে সাময়িকভাবে হলেও রক্ষা করেছিলো।

পরবর্তীকালে গোটা জাতির অবনতির সাথে সাথে বহু মুসলিম রাষ্ট্রে নারীদের অবস্থানেরও অবনতি ঘটে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের প্রভাবে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে পাপাচারের দূষিত হাওয়া ঢুকে পড়ে। ফলে সমস্ত সমাজ অবক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হয়। নারীর অবস্থান অত্যন্ত নীচে নেমে যায় এবং তারা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকেও বঞ্চিত হতে থাকে[২২]।

মুসলিম নারী

আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তন

বিগত পঞ্চাশ বছরে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সমাজের সামগ্রিক অবস্থা ও প্রথাগত ধারায় বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তনের ফলে শিক্ষা এবং আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে নারী নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এ সময়েও পর্দা প্রথা প্রায় অনুপস্থিত। প্রাচীন যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ছোট পরিবার প্রথা যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে মহিলাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দায়িত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ধাপে ধাপে মহিলারা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। এতে নারীদের পারিবারিক জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়। কিন্তু অন্যদিকে এর কুফলও দেখা দেয়[২৩]। সামাজিক বিবর্তন মুসলিম বিশ্বের নারীদেরকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

মিসরের মুহাম্মদ 'আবদুহ নারীদের সমানাধিকারের কারণ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হন। তার মতে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সব সমাজ সংস্কারকই পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ধারার সাথে তাল মেলাবার জন্য এ প্রথা চালু করেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করেন। জনাব কাসিম আমিন এমনি সমাজ সংস্কারকদের একজন[২৪]। জনাব আমিনের যুক্তি ছিল যে, মুসলমানরা কুসংস্কার আচ্ছন্ন থাকায় মানবিক সুখ সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট কোন ধ্যান ধারণা ছিল না। তিনি মনে করেন, একটি সমাজের সুসংহত ভিত্তির জন্য একজন নারীর দান অতুলনীয় এবং মায়ের ভূমিকা বিশেষভাবে মুখ্য। একজন মহিলা কখনোই সমাজের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবেন না যতক্ষণ না তাকে তৈরী করে নেয়া হয় এবং এজন্যই তাকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সমাজের কর্তব্য। সুতরাং অবশ্যই নারীর সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন করতে হবে এবং তা শুধু উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। কুরআন ও শরীয়ত অনুযায়ী জনাব কাসিম আমিনের বক্তব্য এ-ই প্রমাণ করে যে, নারী স্বাধীনতার প্রশ্নে ইসলামের নির্দেশিত বিধান লংঘন ও পাপাচারের কারণেই নারীর স্থান নীচু স্তরে নেমে এসেছিল।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে বিয়ের ব্যাপারে বর ও কনের বয়সের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় যা ধীরে ধীরে আইনে পরিণত হয়। সম্ভবত মিসরই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ সময় বহু বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ওপর কড়াকড়ি আরোপিত হয়[২৫]। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে এ নীতিমালা বিস্তার লাভ করে ও নারীর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ভ্রমণের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ফলে বেতার ও টেলিভিশনের সূচনাপটে মধ্য প্রাচ্যের মুসলমানগণের একটি বৃহৎ অংশ পাশ্চাত্যের ব্যক্তিগত জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিশেষ করে মহিলাদের ধারা সম্পর্কে সম্যক ধ্যান-ধারণা লাভ করে। শুধুমাত্র নারীর মর্যাদার প্রশ্ন নয়, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের পারিবারিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য পাশ্চাত্যের আদর্শকে অনুসরণ করা হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহিলারা ঘরের বাইরে বিভিন্ন পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করে। পাশ্চাত্যের অনুসৃত এ রীতিনীতির ফলে অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম হয়। অপরদিকে দম্পতিরা যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে[২৬]। ক্রমে ক্রমে আদর্শ যৌথ পরিবার প্রথার বিলোপ ঘটতে থাকে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথায় পিতার প্রাধান্য থাকলেও তার আদর্শের কোন মূল্যই আর অবশিষ্ট থাকল না এবং পরিণতিতে বিশৃঙ্খলা ও বিনাশের সূত্রপাত হয়[২৭]। উপরন্তু বিয়ের ব্যাপারে তরুণ তরুণীরা অভিভাবকদের মতামতকে ক্রমশ কম গুরুত্ব দিতে শুরু করে। বরং নব্য ধ্যান ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা বিয়ের আগেই অবাধ মেলামেশার সুযোগ দাবী করে। এর ফলে বিবাহোত্তর সুখী জীবন যাপনের জন্য যৌথ পরিবারের সজাগ দৃষ্টিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয়। বিবাহ-পূর্ব মেলামেশার ব্যাপারে বর ও কনের যুক্তি হলো, এভাবে উভয়ে উভয়কে জানা ও চেনার সুযোগ পাবে এবং পরবর্তীকালে সুখী জীবন যাপনে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। তাছাড়া তালাক ও একাধিক বিয়ের হিড়িক কমে যাবে[২৮]। এমন কি সরকারী পর্যায়েও এ ব্যাপারে পরোক্ষ সমর্থন দেয়া হয়। দেশের উন্নতিকল্পে সৃজনশীল ভূমিকা পালনের জন্য নারীদের উৎসাহিত করা হয়। নারীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের পথ সুগম করা হয় ও কিছু সংখ্যক নারীকে মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ এখানে মিসর ও ইরাকের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। নতুন মুসলিম দেশগুলিতে সংসদ নতুনরূপে গঠন করা হয়। শিক্ষা ও শ্রমের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা হয়। এ আইনে মানবাধিকার ও সুষম নীতির প্রেরণা হিসেবে নারীদেরকে কাজে লাগানোর সুযোগ থাকে। এসব আইন এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। এ নীতির বাস্তবায়ন এবং আই এল ও কনভেনশন তাদের মর্যাদাকে আরো এক ধাপ উন্নত করে এবং নারীদের শিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ ও শ্রমের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা আরো বৃদ্ধি করে। এটা নিঃসন্দেহে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইউনেস্কো, আই এল ও সহ মুসলিম সদস্য রাষ্ট্রের সহযোগিতায় নারীদের মর্যাদা প্রদানে ইসলামী ঐতিহ্য বজায় রাখার সুপারিশ খুবই বিবেচনার পরিচয় বহন করে। সুশিক্ষা নারীদের ব্যাপারে একটা সুন্দর সমঝোতার জন্ম দিয়েছিল এবং নারীদের অবস্থার উন্নতি সাধন করেছিল।

www.pathagar.com

শ্রম ও অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থা উত্তরাধিকার আইনে প্রতিফলিত হয়। ইসলামী আইন অনুসারে নারী পুরুষের তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তির অধিকারী। কেননা, পুরুষ নারীর ভরণপোষণের জন্য দায়ী। এখানে একটু স্মরণ রাখতে হবে যে, নারী তার আয়ের ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখে ও তার সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে পুরো স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। তাছাড়া এসব বৈধ অধিকার তাকে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতার নিশ্চয়তা প্রদান করে একজন নারী প্রায়ই তার সম্পদের ওপর পুরো এবং পারিবারিক খরচ নির্বাহের নিমিত্তে পরিবারের তহবিলের ওপরেও নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করে। পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা, শিক্ষা এবং প্রযুক্তি এভাবে উন্নয়নের সাথে ক্রমান্বয়ে মুসলিম নারী সমাজের উন্নতির পথকে প্রশস্ত করে দেয়[২৯]।

নারী স্বাধীনতা তথা মুক্তির এ জোয়ার সর্বশ্রেণীর নারীদের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত নারীরা পেশা হিসেবে চাকুরীতে প্রবেশ করে ও নিম্নবিত্ত স্বল্প শিক্ষিত নারীরা শিল্প কারখানায় যোগদান করে। শিক্ষাই নারীদেরকে স্বাধীন পেশা এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে উৎসাহ জোগায়[৩০]।

মোদ্দাকথা, ইসলাম নারীর শ্রমদানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি[৩১]। তবে আজকাল কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারীদের পরিবারে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কারণ কর্মক্লান্ত নারী ঘরে ফিরে এসে পারিবারিক কাজ সম্পাদন ও সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারছে না[৩২]। তাই সামাজিক ও পারিবারিক বিবর্তনের সাথে সন্তান ও পরিবারের সার্বিক মঙ্গলের জন্য উভয় ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

ইসলামী সমাজে নারীর আইনগত অধিকার

মুসলিম পারিবারিক আইন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ইসলামে নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এরূপ আলোচনার সময় অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসার কারণে মুসলিম সমাজের ওপর তাদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও আধুনিকীকরণের প্রভাবে নারীদের সামাজিক অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার ওপরেও আলোকপাত করেছি।

নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার অধিকারের ওপর ইসলামী সমাজে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে।

মুসলিম পারিবারিক আইন বলতে আমরা বুঝি বিয়ে, তালাক, সম্পত্তির অধিকার এবং বহু বিবাহ সম্পর্কে প্রণীত নীতিমালা। শরীয়তের দিক দিয়েও এ আইনের গুরুত্ব অনেক। এখন পর্যন্ত ইসলামী সমাজের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে নির্বিশেষে এ নিয়ম প্রচলিত।

www.pathagar.com

ইসলামে বিয়ে ঃ ইসলামী আইনে বিয়ের পটভূমি

আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সব অনৈসলামী রীতি-নীতির বিলোপ সাধন করা হয় এবং জাতি অথবা ব্যক্তি বিশেষের জন্য ক্ষতিকর এমন সব প্রথা বাদ দেয়া হয়। এন্ডারসনের মতে, "প্রাক-ইসলাম আরবে বিভিন্ন ধরনের বিয়ের প্রথা চালু ছিল। সম্ভবত, এ প্রথাসমূহ পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়ে মূল্যায়ন করা হত এবং আরও একটি তথাকথিত 'সাময়িক ভোগের' জন্য বিবাহ প্রথা চালু ছিল" (আল-মৃতা)। দুই পরিবারের মধ্যে স্থিতিশীলতার নিমিত্ত ঐক্য ও আত্মীয়তা সৃষ্টি এবং কনের প্রজনন ক্ষমতা হারানোর জন্য স্ত্রীর পরিবারে বা বংশে কনের সম্পত্তি প্রদানের নিয়ম থেকেই এ প্রথার সৃষ্টি। আরবে প্রাক-ইসলাম যুগে একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী রাখতে পারবে, তার কোন নিয়ম ছিল না[৩৩]। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে কন্যার বিয়ের জন্য পিতার নিকট থেকে যৌতুক আদায় করা হত।

ইসলামে যৌতুক প্রথার নিন্দা করা হয়েছে। বহু বিবাহ প্রথা সীমিত করে কড়াকড়ি আরোপ করে শর্তাধীনে সর্বোচ্চ "চার স্ত্রী" গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ইসলামী বিয়ের আইনে যৌতুক কন্যারই নিজের সম্পদ এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দেনমোহরসহ প্রাপ্য সবই পরিশোধ করে দিতে হবে। তবে স্ত্রী যদি নিজে থেকে মাফ করে দেয়, সেটা আলাদা ব্যাপার।

বিয়ের অন্তরায়

তিন রকমের আত্মীয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ঃ (১) রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা এবং দুধ মায়ের সাথে সম্পর্কিত আত্মীয়তা[৩৪]। (২) রক্তের সম্পর্ক যেমন ঃ বাবা-মা, সন্তান, নাতি-নাতনী এবং ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। (৩) স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষ থেকে সরাসরি সম্পর্ক থাকতে পারে এমন বিয়েকেও ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। দুধ মায়ের[৩৫] সাথে সম্পর্কিত আত্মীয় যেমন একই মায়ের দুধে নিজের সন্তান এবং পালক সন্তান মানুষ হলে। এ সম্পর্কগুলোর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ইসলামে একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কুরআনেও এসব নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'তোমাদের মধ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে ; তবে যদি তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরষজাত পুত্রের স্ত্রী ও দু'ভগ্নীকে একত্র করা ; পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য ইহা আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থ

www.pathagar.com

ব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে। তোমাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করেছ তাদের নির্ধারিত মোহরানা অর্পণ করবে। মোহরানা নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়[৩৬]। [৪ ঃ ২৩-২৪]

বিয়েতে এসব স্থায়ী অন্তরায় ছাড়াও সাময়িক আরও বহু অন্তরায় রয়েছে। যদিও এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। একজন নারী বিধবা হওয়ার চার মাস দশ দিন পর পুনরায় বিয়ে করতে পারে। কিন্তু একজন তালাক প্রাপ্তা নারী তিন মাস পার হওয়ার পূর্বে বিয়ে করতে পারে না[৩৭]।

জীবনসংগী নির্বাচন

কোন নারীকেই বিয়ের জন্য বল প্রয়োগ করা যাবে না। হানাফী মতে একজন উপযুক্ত জীবনসংগী বেছে নেয়ার ব্যাপারে একজন নারীর পছন্দ অপছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে[৩৮]। পেশা, চরিত্র, আর্থিক স্বচ্ছলতা, ধার্মিকতা ইত্যাদি গুণাবলী জীবন সংগীর থাকা বাঞ্ছনীয়। স্ত্রী যে জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত স্বামীকে যতটুকু সম্ভব তার ব্যবস্থা করতে হবে[৩৯]। জামাতা ও তার ভাবী শ্বশুরের মধ্যে পেশাগত পদ মর্যাদার পার্থক্য একটা বাড়তি প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় এটা মনে করা হয় যে, পুরুষ নারীর মর্যাদাকে উচ্চে তুলে দিতে পারে। মুসলিম নারী সম্পত্তির মালিক হতে পারে। এটা তার একটা বিশেষ সুবিধা। কিন্তু স্বামী তার [স্ত্রীর] সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখে না।

দেনমোহর

ইসলাম ধর্মে দেনমোহর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে[৪০]। বিয়ের নিয়মানুযায়ী স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেনমোহর দিতে হয়। একই পদমর্যাদার অন্য স্ত্রীলোককে দেয়া দেনমোহরের সাথে যেন তার তুলনা করা যায় দেনমোহরের পরিমাণ এমন হতে হবে। দুই কিস্তিতে এ দেনমোহর পরিশোধ করা হয়ে থাকে। বিয়ের সময় প্রথম অংশ নগদ পরিশোধযোগ্য এবং বাকী অংশ ধর্মীয় মতে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কিংবা তালাকের পরে স্ত্রীকে দিতে হয়। শী'আ মতে, স্ত্রী যে কোন সময় চাইলে স্বামী তার দেনমোহরের অর্থ পরিশোধ করে দেবে[৪১]। এ ব্যবস্থায় নারীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তার মর্যাদাকে উন্নীতকরণের পথ খোলা থাকে। কারণ দেনমোহর বাবদ প্রাপ্য অর্থ একজন স্ত্রীর জীবনের পুঁজিস্বরূপ যা তার ভবিষ্যত উন্নতির পথ সুগমে সহায়ক।

ইসলামে বিয়ের শর্তসমূহ

যেহেতু একজন কন্যা তার পরিবারের সম্মান বহন করে, সে কারণেই তাকে

www.pathagar.com

সুশিক্ষিতা, ব্যক্তিত্বসম্পন্না এবং চরিত্রবতী করে গড়ে তুলতে হবে।
বিয়ের বৈধতার প্রশ্নে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে আলোকপাত করতে পারি।

প্রথমত, বিয়ের চুক্তি, প্রস্তাব প্রেরণ ও গ্রহণ এসব উভয় পক্ষেই সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত হতে হবে এবং উপযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে এ চুক্তি আইনগতভাবে সিদ্ধ হতে হবে। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এতীম নাবালিকার অভিভাবক হিসেবে বিয়ের চুক্তি সম্পাদন করতে পারে[৪২]। হানাফী মতে একজন সাবালিকা নিজেই তার স্বামী পছন্দ করার ব্যাপারে চুক্তি করতে পারে[৪৩]।

দ্বিতীয়ত, যতক্ষণ কিছু শর্ত বা চাহিদা পূরণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ের চুক্তি বৈধ হতে পারে না। এগুলো'র মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, উভয় পক্ষ কোন নিষেধের সীমানা পেরিয়ে যাবে না যেমন রক্ত সম্পর্কিত দুধ ভাই, বোন, পালক ভাই[৪৪]। আবার ইদ্দত পালন হয়নি এমন তালাকপ্রাপ্তা নারীকেও বিয়ে করা বৈধ হবে না। পূর্বেই যার চার স্ত্রী আছে এমন লোকের জন্য বিয়ে সিদ্ধ হবে না[৪৫]। একজন মুসলমান নারী কেবলমাত্র একজন মুসলমান পুরুষকে বিয়ে করতে পারে। বর্তমান যুগে একটি বিয়ের বৈধতা কেবলমাত্র সরকারী ধর্মীয় আদালতে রেজিস্ট্রী এবং ডাক্তারী সার্টিফিকেটের সমর্থনেই হতে পারে[৪৬]।

তৃতীয়ত, মুসলিম আইনজ্ঞগণ বিয়ের সেসব গুরুত্বপূর্ণ শর্ত নিয়ে আলোচনা করেন যার ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে যার মাধ্যমে বিয়ের চুক্তিকে বাতিল করে দেয়া যায়। হানাফী মাযহাবে এসব দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় যেখানে নাবালক-নাবালিকাদের তাদের পিতা বা পিতামহ ছাড়া অন্য কেউ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নাবালক নাবালিকা তাদের যৌবন প্রাপ্তির পর ইচ্ছে করলে ঐ জাতীয় বিয়ে বাতিল করে দিতে পারে। একজন প্রাপ্ত-বয়স্কা হানাফী স্ত্রীলোকও এরূপ অসম বিয়েতে আবদ্ধ হয়ে থাকলে, তার স্বগোত্রীয় অভিভাবক স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের জন্য আদালতে আরজি পেশ করতে পারে। এছাড়া বিয়ের পর যখন এক পক্ষ দেখতে পায় যে, অন্যপক্ষের শারীরিক ত্রুটি বা অসুস্থতা অপর পক্ষের সাথে যৌন মিলনে বাধা সৃষ্টি করে বা একসাথে বসবাসে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে বা এমনও যদি হয় যে অপরপক্ষ কোন বিশ্রী বা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত, তখনও এরূপ বিয়ের বিচ্ছেদের জন্য আদালতে অনুরোধ পেশ করা যেতে পারে[৪৭]।

আজকের দিনে বিয়েকে বৈধ করতে হলে উভয় পক্ষের দু'জন করে সাক্ষীর উপস্থিতিতে আদালতে তা রেজিস্ট্রিভুক্ত করতে হবে[৪৮]।

ইসলামে তালাক

নারী পুরুষের বিয়েকে ইসলামে পবিত্র বন্ধন বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তালাক ইসলামে পছন্দনীয় নয়। যেখানে পারিবারিক সম্পর্কের এমন ক্রমাবনতি

www.pathagar.com

হয়ে যায় যে সমঝোতার কোন পথই খোলা থাকে না, কেবল তখনই মাত্র তালাকের প্রশ্ন আসতে পারে। এ সম্পর্কে রাসূল-ই-করীম (সা) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামে তালাক সম্পর্কে কখনই উৎসাহ প্রদান করা হয়নি। তিনি বলেছেন, 'অনুমতিযোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে আল্লাহর কাছে তালাক অত্যন্ত ঘৃণার বিষয়'[৪৯]। তিনি আরও বলেন, 'তালাক কার্যকর হলে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে'[৫০]। হাদীছে আছে, 'যে স্ত্রী কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই তালাক নেয়, সে কোনদিন বেহেশতে যাবে না'[৫১]।

যখন পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে ইসলাম তখন উভয় পক্ষকে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে পুনরায় আপোষের শেষ চেষ্টা করে দেখতে পরামর্শ দেয়। কুরআনুল করীমে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

'তোমরা যদি দু'য়ের মধ্যে ভাঙনের আশংকা কর, তা হলে উভয় পক্ষ থেকে একজন করে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত কর। তারা উভয়ে নিরাপদ হতে চাইলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে দেবেন[৫২]।'

মধ্যস্থতাকারী দম্পতির মধ্যে আপোষের চেষ্টা করবেন। তারা ঘটনার বিস্তারিত বিষয়াদি ছড়িয়ে পড়ার মত বিব্রতকর অবস্থা সরাসরি পরিহার করে চলার ব্যবস্থা করবেন। সেজন্য দম্পতির উভয় পক্ষ থেকেই একজন করে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করতে হবে। তালাকের প্রতি ধর্মীয় নিষেধ ও সামাজিক অসম্মতি ছাড়াও উপরিউক্ত বিধিমালা তালাকের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছে[৫৩]। তালাকের বিধান যদিও রাখা হয়েছে, তথাপি এটাকে আল্লাহর নিকট সকল অনুমোদনযোগ্য কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনমাস ব্যাপী ইদ্দতের মধ্যে যেহেতু একজন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী কোন বিয়ে করতে পারে না, তাই শরীয়তের কঠোর বিধানের তীব্রতাকে এর মাধ্যমে কিছুটা শিথিল করা হয়েছে[৫৪]। সন্তানের পিতা সম্পর্কে সন্দেহ নিরসনের জন্যই শুধু এরূপ ব্যবস্থা রাখা হয়নি বরং স্বামীকে কোন ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে দূরে রেখে বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করার সুযোগদানের জন্যই করা হয়েছে। ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই যাতে তালাককে বাতিল করতে পারে, তাও এর লক্ষ্য। কুরআনে এ ব্যাপারে ইরশাদ করা হয়েছে[২ঃ২২৮-২৩৩] ঃ

> 'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। যদি তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চায়, তবে তাতে তাদেরকে পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের ; কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এ তালাক দু'বার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দেবে অথবা সদয় হয়ে মুক্ত করে দেবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছ, তা হতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয় অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা

www.pathagar.com

হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না। তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই। এসব আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা তা লংঘন করো না : যারা এসব সীমারেখা লংঘন করে, তারাই যালিম। অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সংগম না করবে। অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয় আর তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না। এগুলি আল্লাহর সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ এটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত-পূর্তির নিকটবর্তী হয়, তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দেবে অথবা বিধিমত মুক্ত করে দেবে। কিন্তু তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘন উদ্দেশে তাদেরকে তোমরা আটকে রেখো না। যে এরূপ করে, সে নিজের প্রতি যুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহর বিধানকে ঠাট্টা তামাশার বস্তু করো না এবং আল্লাহর নিয়ামত ও কিতাব এবং হিকমত, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন, তা স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানময়। তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসীদের, উপদেশ দেয়া হয়। এটা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর স্তন্য পান করাবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা। কাউকেই তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয়না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। এবং উত্তরাধিকারীদেরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায়, তবে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই। তোমরা যা বিধিমত দিতে চেয়েছিলে, তা যদি অর্পণ কর তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্য পান করাতে চাইলে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখবে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা[৫৫]।

স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীকে অস্বীকার বা 'তালাক' শব্দটি "ইসলামের পারিবারিক আইনে" একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে কোন বিবাদের সৃষ্টি হলে উভয় পক্ষের নিকট বিশ্বাসভাজন ও বিজ্ঞ বলে পরিচিত এমন একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা করে তা মিটমাট করে ফেলার জন্য ইসলাম নির্দেশ প্রদান করে[৫৬]।

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যদি মিটমাট সম্ভব না হয়, তা হলে তাদেরকে 'আল-খুলা'র সাহায্য নিতে বলা হয়েছে। খুলা এমন একটা পদ্ধতি যার ফলে স্ত্রী কর্তৃক

www.pathagar.com

স্বামীকে অর্থ প্রদান বা সাধারণত তাকে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত প্রদান সাপেক্ষে স্বামী বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে। তবে মোহরানা ফেরত দেয়াটা তেমন জরুরী নয়[৫৭]। 'আল মুরাযা' হলো আরেকটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে স্বামী–স্ত্রী ইদ্দতের সময়ে একটি আপোষ মিমাংসায় উপনীত হয়[৫৮]। 'মুবারা' আরেকটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে স্বামী–স্ত্রী পারস্পরিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অঙ্গীকার ছাড়াই বিয়ে ভেঙে দিতে পারে[৫৯]। তা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার ঠিক পূর্বেই আর্থিক বিষয় তথা মোহরানা ফেরত না দিলে স্বামী তার স্ত্রীকে আবার তালাক দেয়ার হুমকি প্রদান করতো। এভাবে স্বামীরা সব সময় স্ত্রীদের না ঠিকভাবে বিয়ে করত না তাদের মুক্ত করে দিত। এতে স্বামীরা তাদের অধিকারের অপব্যবহার করত। সুতরাং এরূপ দু'বার তালাক দেয়ার নিয়মকে বাতিল করে তৃতীয়বার তালাক দেয়াকে চূড়ান্ত বলে ধরা হয়েছে[৬০]।

কোন স্ত্রীকে তার স্বামী ভরণপোষণ দিতে না পারাই তালাক দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এছাড়া সে যদি তার স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে, নেশাখোর বা মানসিকভাবে বিকল হয় বা অনেক দিনের সংক্রামক রোগে রোগগ্রস্ত হয় বা সে যদি শারীরিকভাবে বা যৌন সংগমে অক্ষম হয় কিংবা তার স্ত্রীকে তার পরিবার পরিজনের সাথে বসবাস করতে বাধ্য করে তাহলে স্বামীর এসব কারণগুলোর জন্য ধর্মীয় আদালত বা কাযী একজন স্ত্রীলোকের তালাকের পক্ষে রায় দিতে পারে[৬১]।

ফিক্‌হ মতে স্ত্রী তার সন্তান-সন্ততিদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সাথে রাখতে পারে[৬২]।

সর্বশেষে একথা বলা যায় যে, মুসলিম ফিক্‌হবিদগণ তালাকের এরূপ পরিস্থিতিতে ইসলামের প্রথম যামানায় মুসলিম স্ত্রীদের রক্ষার জন্য কিছু কিছু পন্থা উদ্ভাবন করেন। মুসলিম স্ত্রীর এ অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয় যে সে তার স্বামীকে বশীভূত করে তালাক দেয়ার ক্ষমতা প্রয়োগে বুঝিয়ে দিতে পারে যাতে স্ত্রী কোন বিশেষ অবস্থা বা এমন কি কোন বাধা ছাড়াই তার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আপন তালাক আপনিই নিতে পারে[৬৩]। এ ছাড়া স্ত্রী তার স্বামীকে এমন কোন শর্তমূলক তালাক উচ্চারণে বাধ্য করতে পারে যা আপনাআপনিই কার্যকর হবে। কেউ কেউ আবার কান্ডজ্ঞানহীন তালাক বা স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত তালাকের বিরুদ্ধে বলে থাকেন যে, মোহরানাকে দু'ভাগে ভাগ করে প্রথম ও অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ বিয়ের পূর্বে প্রদান করতে হবে আর বাকী অংশ যা অপেক্ষাকৃত বেশী তা তালাক বা বৈধব্যকালীন সময়ে প্রদান করতে হবে[৬৪]।

উত্তরাধিকার নির্বাচন

সম্পত্তি যাতে এক স্থানে পুঞ্জিভূত হয়ে থাকতে না পারে এবং বিস্তৃত বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত হয় সেজন্য ইসলামে উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। একজন সুস্থ ও জীবিত ব্যক্তি দানের আদর্শ অনুসরণ করে ইচ্ছামত তার সম্পত্তি ভাগ বন্টন করে

www.pathagar.com

দিতে পারে[৬৫]। তবে তার উইল করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সে তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক উইল করে দিতে বা দান করে দিতে পারবে না[৬৬]। উইল করে দেয়ার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর বাকী দুই-তৃতীয়াংশ বা বৃহত্তর অংশটা শরীয়তের ভিত্তিতে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে[৬৭]।

উত্তরাধিকারের ভিত্তি

কুরআনকে ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের মৌলিক সূত্র গণ্য করা হয়। এসব মৌলিক ভিত্তি কুরআনের স্ত্রী সম্পর্কিত অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন [৪ঃ১১, ১২] ঃ আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন। এক পুত্রের অংশ দু' কন্যার অংশের সমান ; কিন্তু কেবল কন্যা দু'য়ের অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দু'তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ ; সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ ; তার ভাইবোন থাকলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ ; এ সবই সে যা ওসীয়ত করে তা দেয়ার ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর, তা তোমরা অবগত নও। এটা আল্লাহর বিধান ; আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ; ওসীয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ ; তোমরা যা ওসীয়ত করবে তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর যদি পিতামাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে, তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে সম-অধিকারী হবে এক-তৃতীয়াংশে ; এটা যা ওসীয়ত করা হয় তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটা আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

উত্তরাধিকার আইনের উদ্দেশ্য

কুরআনে নারী বিষয়ক অধ্যায়ে দেখা যায় ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে বহু উত্তরাধিকারী রয়েছে। একজন পুরুষ মৃত্যুর সময় জীবিত পিতা, মাতা, বিধবা স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা রেখে যায়। তারা প্রত্যেকে এক একজন উত্তরাধিকারী এবং তারা প্রত্যেকে শরীয়তে নির্ধারিত উত্তরাধিকার সম্পত্তির অংশ পাবে। একই রকম উত্তরাধিকারের বেলায় কারো প্রতি উত্তম এবং কারো প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই উত্তরাধিকারী, যদিও একই পর্যায়ের উত্তরাধিকারের বেলায় স্ত্রী একজন পুরুষের অর্ধেকের সমান অংশ পেয়ে থাকে। এর কারণ হলো, ইসলামী আর্থ-সামাজিক বিধানে পরিবারের ভরণপোষণের পুরো দায়িত্ব অর্পিত হয় স্বামীর

www.pathagar.com

ওপর, স্ত্রীর ওপর নয়। কদাচিৎ যদিও দেখা যায় যে, স্ত্রী তার অধিকার দ্বারা স্বামীর চেয়ে বেশী আয়ের মালিক হয়েছে, তখনো পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব[৬৮] স্বামীর ওপরই ন্যস্ত থাকবে। স্ত্রীর ওপর পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন এভাবে প্রত্যেক গোষ্ঠির সম্পদকে বিলিবন্টন করে দেয়। এর উদ্দেশ্য হলো, জনগণের বিরাট অংশ ন্যায়বিচার পাবে, একজন উত্তরাধিকারী বা সামান্য কয়েকজনই সম্পদের বিরাট অংশের মালিক হবে না[৬৯]।

একথা আমরা চূড়ান্তভাবে বলতে পারি যে, ইসলামে মুসলিম নারীর অর্থনৈতিক অধিকার তাদেরকে সমাজে স্বাধীন ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সম্মানজনক মর্যাদা প্রদান করেছে। একজন নারী তার ভাইয়ের সাথে পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, ভাই ও বোন শরীয়ত মোতাবেক ন্যায়ভিত্তিকভাবে আপেক্ষিক অংশের মালিক হয়ে থাকে। পরিবারের কোন সদস্যই এমনকি তার স্বামীও তার বিয়ের সময় তার যে সম্পত্তি থাকে, তা নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। তা সম্পূর্ণ তারই থাকবে এবং তারই আয়ত্তে থাকবে। বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই নির্ধারিত মোহরানার দেয়-সাধ্য অংশ প্রদান করতে হবে আর মোহরানার যে অংশ বাকী থাকবে সে অংশ বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে প্রদান করতে হবে[৭০]।

ব্যবসা-বাণিজ্য, অংশীদারি কারবার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানী ও অন্যান্য বাণিজ্যিক কর্মকান্ড ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়নি। পুরুষ বা স্ত্রী যে কেউ হালাল ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে, যাতে সম্পদের বিলিবন্টন নিশ্চিত হয়, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় ও মুসলিম জাতির কল্যাণ সাধিত হয়[৭১]।

ইসলামে বহু-বিবাহ

জাহিলী যুগে আরব অধিবাসীদের মধ্যে স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে কোন সীমারেখা ছিল না। একাধিক বিয়ের মাধ্যমে চার স্ত্রী গ্রহণের প্রথা ইসলাম প্রবর্তিত একটি সংস্কার। এর ফলে প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব সাধিত হয়েছে। বহু বিবাহকে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়নি। তবে বিশেষ কারণে অনুমোদন করা হয়েছে এবং সকল স্ত্রীর সাথে সমান ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে[৭২]।

বহু-বিবাহ প্রথা ধীরে ধীরে কমে আসছে। বহু বিবাহকে কখনো গ্রামীণ ও সেকেলে এলাকাগুলোতেও মর্যাদার চোখে দেখা হয় না। উপযুক্ত কারণ যেমন স্বাস্থ্যহীন বা সন্তান ধারণে অক্ষম হওয়া ব্যতিরেকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণকে জনগণও ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। কুরআনের বহু বিবাহ সম্পর্কিত আয়াতের ভাষ্যে বহু বিবাহ পদ্ধতিতে উর্ধে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী সীমিত রাখা হয়েছে[৭৩]।

এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

'তোমরা যদি আশংকা কর যে, এতিম কন্যাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা[৭৪]।'

'তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না। তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড় না এবং অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখ না ; যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৭৫]।'

সকল স্ত্রীর প্রতি নিরপেক্ষ ব্যবহার করতে পারবে, এ নিশ্চয়তা থেকেই বহু বিবাহের অনুমতি প্রদান করা হয়। এও ধারণা করা হয় যে, সে তার ওপর নির্ভরশীলদের ভরনপোষণ করতে সক্ষম হবে এবং বহু বিবাহের কারণে যে নতুন দায়িত্বের সৃষ্টি হবে, তাও সে বহন করতে পারবে[৭৬]। মানুষ যে তার সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না, এটা কুরআনে [৪ঃ১২৯] বলা হয়েছে এবং সে জন্যই শুধুমাত্র একজন স্ত্রী রাখার ওপরই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে[৭৭]।

কোন কোন মুসলিম পন্ডিতের মতে সেই সমাজের জন্য এটা একটা সামাজিক প্রতিবিধান যেখানে পুরুষের চেয়ে নারীরা সংখ্যায় অধিক। জনসংখ্যাগত সমস্যা থেকে যে সামাজিক অনাচারের সৃষ্টি হয় তা থেকে পরিত্রাণের জন্য এটা একটা প্রতিকারের উপায়[৭৮]।

গ্রীষ্মমন্ডলীয় বা আধা-গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলোতে আবহাওয়া, দারিদ্র, অপুষ্টি বা অন্যান্য বহুরকম শিশু রোগের জন্য উচ্চহারে শিশুমৃত্যু ও আন্তগোষ্ঠীয় এবং আন্ত র্জাতিক যুদ্ধের কারণে যেভাবে জনসংখ্যার অবলুপ্তি ঘটে, তার জন্য বহু বিবাহ প্রথাকে একটি প্রাকৃতিক প্রতিদান হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। উল্লিখিত কারণে ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক, দৈহিক ও নৈতিক কারণের জন্য বহুবিবাহ প্রথাকে অনুমোদন করা হয়েছিল। এ অর্থে মানবজাতির স্থায়ী রক্ষণ এবং সামাজিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বহুবিবাহ প্রথা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে[৭৯]।

বহুবিবাহের ফলে কিছু কিছু দুঃখী স্ত্রী ও শিশু স্বাভাবিক ও সুন্দর আবাসস্থল, ন্যায্য মর্যাদা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পায়। এর ফলে পালক গৃহ (Foster Home) বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক গৃহে রূপান্তরিত হয় এবং প্রকৃত পিতাও বৈধ দায়িত্ববান স্বামীতে পরিনত হয়[৮০]।

অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বহুবিবাহকে বোঝা নয় বরং সম্পদে পরিণত করেছে। কৃষি অর্থনীতিতে নারীদের প্রয়োজন রয়েছে। জীবন নির্বাহের খরচ বেড়ে গেলেও স্ত্রীর বাড়তি শ্রম নিয়োগের ফলে আজো সম্ভবত অতিরিক্ত স্ত্রী অযৌক্তিক নয়। মোটের ওপর কৃষিজীবীদের নিকট বহু বিবাহ অর্থনৈতিক সম্পদ এবং একটা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূর্ণ সম্মানজনক পেশা হিসেবে মনে করা হতে পারে[৮১]।
অর্থনৈতিক অবস্থা ও পারিবারিক শক্তি এসব বড় পরিবারের সেকেলে উচ্চ মূল্যবোধের ব্যাপারে বেশ অবদান রেখেছে। যে পরিবারে যত বেশী শিশু, বিশেষ করে পুত্র সন্তান রয়েছে, সে পিতার ও সে পরিবারের তত বেশী মানসম্মান। দরিদ্র পরিবারে শিশুদেরকে একটি অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। তারা বেশ প্রথম থেকেই পরিবারের জন্য আয় উপার্জন করতে শুরু করে[৮২]।

শায়খ আল আজহার শ্যালটাউট মানব সমাজের সামাজিক সমস্যা নিরোধ ও সকল সমাজে বর্তমান বিশেষ কিছু মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বহু বিবাহকে আবশ্যক বলে মনে করেন[৮৩]।

নবী করীম (সা) নিজেই পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর চেয়ে বয়সে বড় বিধবা মহিলা খাদিজাকে (রা) বিয়ে করেন। পঁচিশ বছর অবধি তিনিই ছিলেন তাঁর একমাত্র স্ত্রী। তাঁর মৃত্যুর পরই নবী করীম (সা) পুনঃ বিয়ে করেন। ছোট মুসলিম জাতিটি মদীনার নিকট বসতি স্থাপন করার পর যখন দেখল যে, তাদের চারদিকে অনবরত শত্রুদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হচ্ছে তখনই নবী (সা) একাধিক বিয়ে করেন। এসব যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে পুরুষের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছিল। এ ছাড়া মক্কা থেকে শরণার্থীর সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিল যাদের অধিকাংশই ছিল মহিলা। বিধবা ও অবিবাহিতা মেয়েদের সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় মুসলমানদের সমস্যা বৃদ্ধি পায়। এরূপ জরুরী অবস্থায় নারীদের নিরাপত্তার জন্যই নবী করীম (সা) বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন[৮৪]।

নবী করীম (সা) নিজেই এর দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি এমন বহু বৃদ্ধা বিধবা রমণী বিয়ে করেছিলেন যাঁদের স্বামী ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি তাঁদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, শিশুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন ও তাদের পিতার অভাব দূর করে দিয়েছিলেন[৮৫]।

ইসলামের বহু বিবাহ প্রথার "সীমাবদ্ধ অধিকার" এর অপব্যবহার তালাক পদ্ধতি কোন কোন লোক ব্যবহার করায় মুসলিম নারীর প্রতি অবিচারের মাধ্যমে বড় ধরনের যাতনা সৃষ্টি হয়। যুগ যুগ ব্যাপী চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে উত্তরণের জন্য মানুষ বহু বিবাহ প্রথার অপব্যবহার করে আসছিল। কিন্তু একই সময় দেখা যায়, বহু বিবাহ প্রথা মুসলিম জাতিকে স্ত্রী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক থেকে রক্ষা করেছে[৮৬]।

আজকাল দেখা যায়, বড় বড় শহরের ধনিক শ্রেণীর মধ্যে একটি নতুন ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ আইনের মাধ্যমে পরিচালিত বৈবাহিক সততা হারানোর ফলে উদ্ভূত নতুন সামাজিক অপকর্ম বহুবিবাহ প্রথার স্থান দখল করেছে[৮৭]।

কোন কোন মুসলিম দেশের নতুন সংবিধানে বহুবিবাহ প্রথাকে সীমিত বা নিষিদ্ধ

www.pathagar.com

করা হয়। তা পরিহার করার নিমিত্তে আজকাল বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীতে বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীতে বিপুল সংখ্যায় তালাক ও পুনঃবিবাহ বহুল প্রচলিত দেখা যায়[৮৮]।

আলোচনার সারমর্ম ও উপসংহার

উপসংহারে আমরা একথা বলতে পারি যে, ইসলাম পুরুষের সাথে নারীর সমান অধিকারের ব্যবস্থা করেছে। নারীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত কুসংস্কার প্রতিহত করে তাদের সামাজিক অধিকার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করেছে। ইসলামী আইনে নারী একজন দায়িত্বপূর্ণ স্বাধীন সত্তা বিশেষ। তার পূর্ণ নাগরিক অধিকার রয়েছে এবং তার সাথে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। তরুণী অবস্থায় তার প্রতি যত্ন নিতে হবে এবং নারী হওয়ার কারণে কখনও তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা চলবে না। তার ভাইয়ের ন্যায় তার শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত। একজন কন্যার প্রতি সুনযর প্রদান করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করার সাথে সাথে মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতির কথাও বলা হয়েছে। কন্যা যখন প্রাপ্তবয়স্কা হয় তখন তার স্বাধীনতা পূর্ণভাবে স্বীকৃত। তার ব্যক্তিত্ব কখনও তার পিতা বা স্বামীর নিকট বিলিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়নি। সে বিবাহিতা হোক আর অবিবাহিতাই হোক, সে তার ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। সম্পত্তির অধিকারহেতু সম্পদের তত্ত্বাবধানও নিজ ইচ্ছামত করতে পারে। সে একইরূপ নৈতিকতা ও বাধ্যবাধকতার আওতাভুক্ত। বিবাহে তার সম্মতি চূড়ান্ত। তার শ্রমের জন্য সে পুরো ও সমপরিমাণ সম্মানী পাওয়ার অধিকার রাখে। তার প্রতি যদি তা না করা হয়, তবে অবিচারই করা হবে। পূর্বে নারীদের বিরুদ্ধে যেসব সংস্কার ছিল, তাতে মেয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করলে জীবিত কবর দেয়া হত। স্ত্রীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হত এবং স্বামী মারা যাওয়ার পর বিধবা স্ত্রীর মতামতের ওপর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হত না। ইসলামে এসব প্রথাকে নিন্দা করা হয়েছে।

উত্তম বৈধ ভিত্তির মাধ্যমে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করা হত। একতা এবং শান্তির ওপর ভিত্তি করে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম মৃত ব্যক্তির কন্যা বা তার মা, বোন বা বিধবা স্ত্রীর অনুরূপ উত্তরাধিকার ক্ষমতা নারীর জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম নারীকে বিয়ের মাধ্যমে তার স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা আদায়ের অধিকারও প্রদান করেছে, যা তার প্রতি সম্মানেরই প্রতীক। এটা তাকে স্বামীর স্বতঃস্ফূর্ত সম্মানের মাধ্যমে জয় করার নির্দেশই প্রদান করে। তবে স্ত্রী তার এ অধিকার আদায়ের জন্য কোন বল প্রয়োগ করতে পারবে না, যেমন আরবে ইসলামপূর্ব যুগে কোন কোন সমাজে পরিলক্ষিত হত। স্ত্রী যদি উপার্জনও করে, তবু স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর ওপর ন্যস্ত। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও ইদ্দত পালনের সময়ে তার ভরণ পোষণের অধিকার লাভ করতে পারে। তার অধীনে যেসব সন্তান সন্ততি থাকে তাদের ভরণ-পোষণ ও তাদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহও তাদের পিতার দায়িত্ব।

সমালোচকগণ ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে বোন ভাইয়ের তুলনায় যে সম্পত্তির

www.pathagar.com

অর্ধেক অংশ পেয়ে থাকে–এ বিধির দোষারোপ করেছেন। ইসলামে নারীর অধিকারের সাধারণ প্রেক্ষাপটে নারীর উত্তরাধিকার বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায়, নারী যতটুকু অধিকার ভোগ করছে, পুরুষ ততটুকু করছে না। এছাড়াও এমন বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলা হয়, যাতে উত্তরাধিকারকে সমান অংশে বিভক্ত করার কথা রয়েছে। এই বক্তব্যটি উভয় প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অসংগতিপূর্ণ। সক্রিয়ভাবে হোক বা প্রচ্ছন্নভাবে হোক, প্রত্যেকে একদিকে যেমন স্বামী আরেকদিকে পিতা। তার প্রয়োজন ছাড়াও পরিবারের ভার তার ওপর ন্যস্ত। অপরপক্ষে তার বোন এসব বোঝা থেকে মুক্ত। এমন কি তার জীবিকা নির্বাহের খরচ এবং তার পরিবারের খরচ বহনও তার পরিবারের পিতা, ভাই বা স্বামীর দায়িত্ব।

বহুবিবাহ প্রথা মুসলিম সমাজে বিরল হলেও পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলামের এ প্রথা বেশী পরিচিত। সেখানে বহু বিবাহ প্রথার অর্থ ও তাৎপর্য তিরোহিত ও ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। একথা সত্য যে, ইসলাম সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বহু বিবাহ প্রথার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু তাকে উৎসাহিত করেনি। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ ইসলামে সকল স্ত্রীর সাথে সমান ব্যবহার করার ন্যায় শরীয়তের নীতি প্রয়োগের ওপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

ইসলামে বিয়ে এবং তালাক পদ্ধতি সহজ বলে মনে হলেও এর মধ্যে গভীর প্রতিশ্রুতি এবং গুরুতর দায়িত্ববোধ ছাড়া সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আইনগত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী সমাজে বিয়ে প্রায় চিরন্তনভাবে স্থিতিশীল। বৈবাহিক বন্ধনকে ইসলামে একটি পবিত্র বন্ধন হিসেবে দেখা হয়। যখন উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে, তখন তারা উভয়েই অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় চাপের সম্মুখীন হয়। ফলে তারা এ বন্ধনকে রক্ষার জন্য সম্ভাব্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

সূত্র ঃ

1. Qur'an 49:13
2. Philip Hitti: History of the Arabs (London, St. Martin's Press, 1951), p. 28.
3. Robertson Smith: Kinship and marriage in early Arabia (Cambridge, University Press, 1903), pp. 92-94.
4. Joseph Schacht: "Pre-Islamic background of family development of jurisprudence" G.M. Khadduri and H. Liebesny (eds.): Law in the Middle East (Washington, Middle East Institute, 1955,pp.28-57.
5. Reuben Levy: The social structure of Islam (London, Cambridge University Press, 1971), pp. 91-92.
6. Qur'an 17:31
7. Ibid 16 (The bee), 58-59.
8. Ibid, 6 (Cattle), 141.
9. H. Al-Elsheikh: The place of women in Islam (Jeddah, 1975), p. 11.
10. Arthur Jeffrey: "The family in Islam" Ruth N. Anshen (ed.): Family:

www.pathagar.com

Its function and destiny (New York, Harper and Brothers, 1949), pp. 58-59.
11. Levy, op.cit.,pp.95-98
12. Thomas Arnold: The preacher of Islam (London, Constable Co., 1913), p.8.
13. Abdul Rauf: The Islamic view of women and the family (New York, Robert Speller, 1977), pp. 50-52.
14. Hamilton Gibb: Mohammadanism (Oxford University Press, 1970), pp. 22-23.
15. Schacht, op. cit., pp. 28-33.
16. Ibid, pp. 34-35.
17. See Abdul Rauf, op. cit., pp.65-67.
18. Raphael Patai: Golden river to golden road (Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1967), p. 117.
19. F.M. Jamaly: Social Structure in Iraq (Baghdad, 1945), p. 36.
20. Jeffrey, op. cit.,p. 57.
21. Gustave E. Von Grunebaum: Medieval Islam (Chicago, University of Chicago Press, 1969, P. 175.
22. A. Maududi: The family law of Islam (Lahore, 1968), p.4.
23. Ruth Woodsmall: Women and the New East (Washington, The Middle East Institute, 1960), pp. 39-58.
24. The two books of Qasim Amin are: Tahreer al-Mara (Cairo, 1899), and Al-Mara al-Jadida (Cairo, 1901).
25. J.N.D. Anderson: "Law reform in Egypt: 1850-1950" Revolution in the Middle East, edited by P.J. Vatikiotis (London, Allen and Unwin, 1972), pp. 165-166.
26. Jacques Berque: The Arabs: Their history and future New York, Praeger, 1964) p. 188.
27. Peter Masnfield: The Arabs (London,penguin Books,1977),pp.545-546.
28. Morroe Berger: The Arab world today (New York,Doubleday,1964),pp. 124-125.
29. Abdul Rauf, op.cit,pp. 140-150.
30. See UNESCO/ILO: Studies on employment and vocational training for women in the Arab countries. Expert meeting in Kuwait (ETT.AR/41) (Paris, Sept. 1969).
31. Abdul Rauf, op. cit.,p. 124.
32. Ruth F. Woodsmall: Eastern women today and tomorrow (Baslon, Central Committee on the United study and of Foreign Mission, 1933)p.32.
33. J.N.D. Anderson: Islamic law in the modern world (New York

www.pathagar.com

University Press) 1959, p. 45.

34. Mahmud Shaltout: Al-Islam Agida wa Sharia (Islam, faith and practice) (Al-Shuroaq, Beirut), pp. 141-169.
35. All children nursed by the same woman, whether or not they are blood relations are thereafter considered brother and sister and can never intermarry.
36. Qur'an 4 (Women), 23-24.
37. Mohammed Jawad Maghniya: Al-Ahwal al-Shakhsiyyah Ala al-Mathhib al Khomsa (Law of personal status according to the five sects of Islam) (Beirut, Dar Al-Ilm, 1964),pp. 22-39.
38. Ibid, p. 25.
39. Mohammed Abu-Zahra: "Family law", in Law in the Middle East., edited by Majid Khadduri and Herbert Liebesny (Washington, Middle East Institution, 1955), pp. 132-178.
40. Shaltout, op. cit., p. 153.
41. Maghniya, op. cit., pp. 56-65.
42. Abu-Zahra, op. cit., p. 132-133.
43. Shaltout, op. cit., p. 152.
44. Qur'an, 4: 32-34.
45. Maghniya, op. cit.,p. 24.
46. Kharufah, Ala Al-Din: Sharh Qonun Al-hwal Al- Shakhsiyyah (Commentary on the law of personal status) Baghdad, 1962), p. 199.
47. Maghniya, op. cit., p. 15.
48. Kharufah, op. cit., pp. 195-225.
49. Ibn-Majah: Sunan (Cairo, Halabi Press, 1953), 1, p. 651.
50. Al-Sharani Abdul Wahhab: Al-Mizan, p. 651
51. Ibn-Majah, op. cit., 11, p. 662.
52. Qur'an, 4: 35.
53. Abdul Rauf, op, cit., pp. 120-123.
54. Maghniya, op. cit., pp. 145-167.
55. Qur'an, 2: 228-233.
56. Shaltout, op. cit., p. 172.
57. Ibid, p. 173. See Maghniya, op. cit., p. 138.
58. Maghniya, op. cit., p. 159.
59. Anderson, op. cit., pp. 50-60.
60. Qur'an, 2: 232, and 15, 1,2.
61. Shaltout, op. cit., p. 173.
62. Maghniya, op. cit., pp. 93-115.
63. Ibid, pp. 17-18. See also Abdul Rauf, op. cit., p. 120.
64. Yousuf al-Qurthawi: Al Halal wal Haram Fil Islam (Permitted and pro-

www.pathagar.com

hibited things in Islam (Beirut, 1973), p. 199. See also Maghniya, op. cit., p. 93.-115.
65. Shaltout, op. cit., pp. 242-244.
66. Maghniya, op. cit., p. 220-229.
67. Qur'an, 4: 11,12.
68. Shaltout, ot. cit,. p. 244.
69. R. Frye and Zafrullah Khan: Islam and the West (Harvard, University Press, 1962), p. 17.
70. M. Ghalwash: The religion of Islam (Cairo, 1972), p. 96.
71. Frye, op. cit., p. 18.
72. G.A. Parwez: Islam: A challenge to religion (Lahore, 1968), pp, 335-354.
73. Abdul-Rauf, op, cit., pp. 116-119.
74. Qur'an, 4:3.
75. Ibid, 129.
76. Shaltout, op. cit., pp. 179-187.
77. Ibid, p. 182.
78. G.A. Parwez, op. cit., pp. 342-345.
79. Ibid, p. 341.
80. Ibid, p. 342.
81. William Goode: "Changing family patterns in Arabic Islam", in World revolution and family patterns (New York, Free Press, 1963.
82. Ibid, pp. 115-120.
83. Shaltout, op. cit., pp. 179-196.
84. G.A. Parwez, op. cit., p. 343.
85 Ibid, p. 344.
86. Shaltout, op. cit., p. 189.
87. Abdul-Rauf, op. cit., p. 119.
88. Yousuf al-Qurthawi, op. cit., pp. 184-186.

www.pathagar.com

কুরআন ঃ বিখ্যাত আল আযহার সংস্করণ অনুসারে রেফারেন্সগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। অনুবাদের বেলায় মুহাম্মদ মারমাডিউক পিকথলকৃত *"The Meaning of the Glorious Quran"* ব্যবহার করা হয়েছে। [সালবিনী, স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৭৬]।

হাদীস ঃ নিম্নলিখিত ক্লাসিক্যাল সংকলনগুলোর নাম উল্লেখযোগ্য ঃ আবু দাউদ ; সুবাইম্যান ইবন আল আশাথ। সুনাম [বৈরূত, পুনঃপ্রকাশ] ৪ খন্ড। মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, বুখারী, সহীহ [কায়রো, হালাবী প্রেস, ১৯৫৩], ৪ খন্ড। ইবন মাযাহ, মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ আবু আবদুল্লাহ। সুনান [কায়রো, হালাবী প্রেস, ১৯৫৩] ২ খন্ড।

গ্রন্থ ঃ আবদুর রউফ, মুহাম্মদ. *The Islamic View of Women and the Family* [নিউইয়র্ক, রবার্ট স্পেলার এন্ড সন্স, ১৯৭৭]।

আবু জোহরা ঃ মুহাম্মদ. *'Family law' in the Middle East.'* সম. মজিদ খাদ্দুরী ও হারবার্ট লাইবেসনি [ওয়াশিংটন, মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউশন, ১৯৫৫]।

আল আক্কাদ, আলবাস মাহমুদ. আল-মারাহ ফিয়াল কুরআন, *Women in the Quran.* (কায়রো, ১৯৭১)

আল-এল-শেখ, এইচ. *The Place of Woman in Islam* [জেদ্দা, ১৯৭৫]।

আমিন কাসিম. তাহরীর আল-মারা [কায়রো, ১৮৯৯]।

এন্ডারসন, জে. এন.ডি. *Recent Development in Shariah law* [লন্ডন, ১৯৫২]।

আন্দ্রি মেকুল *L'Islam et son civilisation* [প্যারিস, *Librairie Armard Colin,* ১৯৭৭]।

আর্নল্ড, টমাস. *The Preacher of Islam* [লন্ডন, কনস্টেবল কোং, ১৯১৩]।

বেল, লেডী (সম.). *The Letters of Gertrude Bell.* [লন্ডন, য়ারনেস্ট বীন, ১৯৭৭]।

বার্ক, জেকস. *The Arabs : Their History and Future* [নিইউয়র্ক প্রেজার, ১৯৬৪]।

বার্জার, মরো. *The Arab World* [নিউইয়র্ক, ডাবল ডে এন্ড কোং, ১৯৬৪]।

বোসরাপ, †q÷vi, *Women's Role in Economic Development* [নিউইয়র্ক, সেন্ট মার্টিন্স প্রেস, ১৯৭০]।

কাস্কড, ডব্লিউ. *Western Impact and Civilization in Unity and Variety in Moslem Civilization* [শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৫]।

চার্চিল, চার্লস ডব্লিউ. *'The Arab World' Women in the Modern World* [সম. বাপায়েল পাতাই, পৃঃ ১০৬-১২৭, নিউইয়র্ক, দি ফ্রি প্রেস, ১৯৬৭]।

ফ্রাই, আর ; খান, জাফরুল্লাহ. *Islam and the west* [হার্ভারড্ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬২]।

www.pathagar.com

গলওয়াশ, এম. *The Religion of Islam* [কায়রো, ১৯৭২]।
গীব, হ্যামিল্টন এ. আর. *Modern Trend in Islam,* শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪৭], *Whither Islam* [লন্ডন, কলোন লিঃ, ১৯৩২] ।
Mohammadanism [অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭০]।
গোল্ডজিহার, এল. *Le dogme et la loi de l'Islam* ফেলিক্স আরিন কর্তৃক অনূদিত [প্যারিস, নতুন সংস্করণ, ১৯৫৮]।
গোডে, ইউলিয়াম R. *'The Changing Family Pattern in Arabic Islam' World Revolution and Family Patterns* [নিউইয়র্ক, দি ফ্রি প্রেস, ১৯৬৩]।
হামিদুল্লাহ, এম. *Introduction in Islam* [প্যারিস, ১৯৫৮]।
হিট্টি, ফিলিপ. *History of the Arabs* [লন্ডন, সেন্ট মার্টিন্স প্রেস, ১৯৫১]।
জামালী, এফ. এম. *Social structure of Iraq* [বাগদাদ, ১৯৪৮]।
জিওফ্রে, আর্থার. *'The family in Islam'* ; রুথ এন, এনশেন [সম.] *The Family: Its Function and Destiny,* [নিউইয়র্ক, হার্পার এন্ড ব্রাদার্স, ১৯৪৯]।
খাদ্দুরী, মজিদ. *'Marriage in Islamic law : The Modernist Viewpoints', The American Journal of Comparative Law* [খন্ড ২৬, নং-২, বসন্ত, ১৯৭৮, পৃঃ ২৩৩-২১৮]।
খারুফাহ, আলা-আলদীন. *Sharh Qonun Al-ahwal Al Shakhsiyyah, [Law of Personal Status* এর উপর ভাষ্য, বাগদাদ, ১৯৬২]।
লেডেন, কার্ল. *The Conflict of Traditionalism and Modernism in the Moslem Middle East* [টেক্সাস ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮]।
লেভী, রিউবেন. *The Social Structure of Islam* [লন্ডন, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭১]। ম্যাগনীয়া, জাওয়াদ মুহাম্মদ. আল-আহওয়াল আল শাখসীয়া 'আলা আল মাসাহিব আল খোমসা [Law of personal status according to the five sects of Islam] (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালয়িন, ১৯৬৪]।
ম্যান্সফিল্ড, পিটার. *The Arabs* [লন্ডন, পেংগুইন, ১৯৭৭]।
ম্যাথু, রোডরিক ডি. *Education in Arab Countries of the Middle East* [ওয়াশিংটন, জর্জ বন্টে, ১৯৫০]।
মওদুদী, এ. *The Family law of Islam* [লাহোর, ১৯৬৮]।
পারভেজ, জি. এ. *Islam: A Challenge to Religion* [লাহোর, ১৯৬৮]
পাটাই, রাফায়েল. *GoldenRiver to Golden Road.* [ফিলাডেলফিয়া, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়া প্রেস, ১৯৬৭]।
কারযাভী-আল্, ইউসুফ. আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম [Permitted and prohibited things in Islam] [বৈরুত, ইসলামিক অফিস, ১৯৭৩]।
রজেনথাল, ইরউইন, আই. জে. Islam in the Modern National States [লন্ডন, ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৫]।

www.pathagar.com

ছাচ্‌ট, জোসেফ. 'Pre-Islamic Background of Family Development Jurisprudence'
খাদ্দুরী, মজিদ ও লাইবেসনি, হার্বাট. [সম.] ঃ *Law in the Middle East* [ওয়াশিংটন, দি মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউট, ১৯৫৫]।
শ্যালাউট, মাহমুদ. আল ফাতাভী [কায়রো, আল আজহার ইউনিভার্সিটি, ১৯৬৫], ২য় সংস্করণ। আল ইসলাম 'আকীদা ওয়া শরীয়া [বৈরুত, দারুল শুরোখ) শ্যালাউট, আল ইমামুল আকবর ও শায়খ আল আজহার]।
স্মিথ, ডব্লিউ. রবার্টসন. *Kinship and Marriage in Early Arabia* [ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সীটি প্রেস, ১৯০৩]।
স্টার্ন, গারট্রড. Marriage in Early Islam [লন্ডন, রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৩৯]।
ইউনেস্কো/আই. এল. ও, *Studies on Employment and Vocational Training for Women in the Arab countries. Expert Meeting in Kuwait* (ETT/AR/49) [প্যারিস, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]।
ইউনাইটেড নেশন্স, ইউনেস্কো. *Report on the Relationship between Educational Opportunities and Employment Opportunities for women.* [প্যারিস, জুলাই, ১৯৭৫]।
ভন গ্রুনেবম্, গুস্তাভ ই. *Medieval Islam* [শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস, শিকাগো, ১৯৬৯]
ওয়ার্ডেনবোর্গ, জে. জে. L'Islam dans Le miroir de L'occident, [প্যারিস, দি হেগ, ১৯৬৯]।
ওয়াট, এইচ. মন্টোগোমারী. *Islam and the Integration of Society* [লন্ডন, ১৯৬৬]।
ওডস্মল, রুথ, এফ. *Moslem Women Enter a New World* [লন্ডন, জি, এলেন এন্ড আনইউন, ১৯৩৬] *Eastern Women To day and Tomorrow* [বসলন, সেন্ট্রাল কমিটি অন দি ইউনাইটেড স্টাডি অব ফরেন মিশন, ১৯৩৩] *Women and the New East* [ওয়াশিংটন, মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউট, ১৯৬০]।

www.pathagar.com

ইসলাম ও শ্রমিক

ইসমাইল আর আল-ফারুকী*

আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিলো সে পৃথিবী আবাদ করবে, এর অফুরন্ত সম্পদ কাজে লাগাবে আর সেই সংগে আল্লাহর ঈপ্সিত নৈতিক মূল্যবোধকে বাস্তবায়িত করবে। আল্লাহ মানুষকে পরিশ্রম এবং উৎপাদন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কর্মী তার কর্মের প্রতিদান অবশ্যই লাভ করবে। সে প্রতিদান বস্তুগতভাবেও যেমন লাভ করবে তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবেও লাভ করবে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, মানুষ যতটা পরিশ্রম করবে ততটাই অর্জন করবে। শ্রমের তুলনায় সে কমও পাবে না বেশীও পাবে না। তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী যারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে আর তাদের পারিপার্শ্বিক জগতে সবার জন্য সুখ ও শান্তি স্থাপন করে। ইসলাম বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা। ইসলাম মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বলে মনে করে এবং পৃথিবীকে স্বর্গের অনুরূপ করে গড়ে তোলার জন্যই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার পন্ডিতদের মতে আল্লাহর রাজত্বে মানুষ আল্লাহ্র দাস মাত্র। আল্লাহ্র হুকুমবরদারী করার অর্থ হবে মানুষের জন্য প্রকৃতি প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য ও পার্থিব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা। মানব জাতির এ শ্রমের মাধ্যমেই ধার্মিকতা, পুণ্য, আশীর্বাদ ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহ মানব জাতির কাছে এটাই আশা করেন। তিনি এরশাদ করেন, "আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন তা থেকেই পরকালকে অন্বেষণ কর (যা শেষ বিচারের দিন সঠিক মূল্যবোধ) এবং এ বিশ্বে তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তার প্রতি অনাগ্রহ প্রদর্শন করো না এবং আল্লাহ যেমন তোমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন তুমিও অন্যের প্রতি সেরূপ করুণা প্রদর্শন কর, পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না" (২৮ ঃ ৭৭)।

বিশ্বের মঙ্গল কামনায় ইসলামের এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে উৎপাদনমূলক ক্রিয়াকর্মে ইসলামের কতকগুলো নীতিমালা রয়েছে। কর্মনীতির ভিত্তি হিসেবে ইসলাম সেগুলোকে মর্যাদা দেয়।

কাজ শুধু সম্মানজনকই নয়, কাজ ইবাদতও

আল্লাহ বলেন, "তার চেয়ে ভাল লোক আর কে হতে পারে, যে লোকদের আল্লাহর দিকে ডাকে এবং সৎকাজ করে ও বলে আমি মুসলিম" (৪১ ঃ ৩৩)। তিনি আরও বলেন, "(তোমরা) আল্লাহর কাছে রিযিক চাও" (২৯ ঃ ১৭, ২ ঃ ১৮৭, ৬২ ঃ ১০)। ইসলামের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যেমন সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত কিংবা ধন বণ্টন কার্যাদির মধ্যেই ইবাদতের অর্থ নিঃশেষিত হয় না। ইসলামের এসব আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও বৈধ উপায়ে নিজের জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য ও সমাজের

* ড.ইসমাইল আর আল-ফারুকী টেম্পল ইউনিভার্সিটি, ফিলাডেলফিয়া, আমেরিকা

www.pathagar.com

অন্যান্যের জন্য কাজ করা ইবাদতের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। রাসূল (সা) শ্রমের মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে বলেন, "জীবনের শেষ মুহূর্তে তোমার হাতে যদি একটি গাছের চারাও থেকে থাকে তাহলে সেটা রোপণ করে যাবে। নিজ হাতের শ্রমার্জিত খাদ্যের চাইতে উত্তম খাদ্য আর কিছুই হতে পারে না" (বুখারী)। 'আল্লাহর নিকটই রিযিক চাও' রাসূল (সা) যখন একথা বলেন, তখন তাকে কোনটি উত্তম জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দিলেন, "যা তোমার হাতের দ্বারা উপার্জন কর, আর বিক্রয় থেকে তুমি সৎ উপায়ে যা অর্জন কর।" তিনি আরও বলেন, "দিবাবসানে যে তার শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে হাতের কাজ শেষ করে বাড়ী ফেরে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে ... যে হাতে আছে কঠিন শ্রমের চিহ্ন, চুম্বনের উপযুক্ত সেই হাত।" (মুস্তফা আল সিবাই, ইসতিরাকিয়াত আল ইসলাম, কায়রো, আল্ দার আল কাইমিয়্যা, ১৯৬০, পৃঃ ৯৬) নবী করিম (সা) রাসূল হওয়ার পূর্বে নিজের হাতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং নবী হওয়ার পরেও গৃহে ও গৃহের বাইরে তিনি নিজ হাতে নিজের জীবিকার্জন করেছেন। দরিদ্র জনসাধারণ তাঁর নিকট এলে তিনি দান দক্ষিণার ওপর নির্ভর না করে কাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উপদেশ দিতেন। রাসূল (সা.) এর এ আদর্শের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে উমার (রা.) কাজ করতে করতে মরে যাওয়াকে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার সমতুল্য বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন, "কাজ মানব জাতির জন্য এমনই এক আশীর্বাদ যে, তার প্রতি সবার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত" (৩৬: ৩৫)।

সব উৎপাদনমূলক কাজই শ্রম এবং ইসলামের কর্মনীতির আওতাভুক্ত

ইসলাম কোন ধরনের কাজের মধ্যে পার্থক্য করে না। শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য বলতে অযোগ্যতাকেই বোঝায়। যারা দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত আর সরকারী ও বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত তাদের সব কাজই শারীরিক ও মানসিক শ্রমের অন্তর্ভুক্ত। তাদের স্বনিয়োজিত ও অন্যের দ্বারা কর্মে নিয়োজিত এ দু'য়ের মধ্যেও ইসলাম বৈষম্য সৃষ্টি করে না। আরবী পরিভাষায় "আমল" ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যেমন সবক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য, তেমনি খলিফার নিকট আজারা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়, গৃহকাজে নিয়োজিত চাকর থেকে শুরু করে কলকারখানার শ্রমিক পর্যন্ত সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এদেরকে এক বচনে আজির এবং বহুবচনে উজার বলা হয় যার বাংলা অর্থ হলো বিবেচনার জন্য ভাড়া করা মজুর। একই কর্মনীতি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ব্যাংকার, কসাই, কাঠ মিস্ত্রি, কারখানা শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, কর্পোরেশন বা সরকারী কর্মচারী, খলিফা এবং তার উযীর সবার জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ ইসলাম সমাজসৃষ্ট পেশা ও নিয়োগের ব্যাপারে সব শ্রেণীবিভাগকেই অস্বীকার করে। শাসক আর শাসিত, নিয়োগকারী ও নিয়োজিতদের মধ্যেকার পাশ্চাত্য শ্রেণীবিন্যাস খুবই নিন্দনীয়। ইসলাম শুধু মেধা ও ব্যক্তিগত অনুরাগের মাধ্যমে শ্রেণীবিন্যাস করাকেই স্বীকৃতি দান করে থাকে। কিন্তু দ্রব্য ও

www.pathagar.com

সেবাজাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবার জন্য সার্বজনীন কর্মনীতিই প্রযোজ্য। কঠিন অগ্নিপরীক্ষার প্রারম্ভিক যুগ থেকেই ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের মতবাদ স্বীকৃত হয়ে আসছে। এ দুনিয়ায় আল্লাহর দানের অংশ নিতেই সকল মানুষ কর্তব্যবন্দী। পৃথিবীতে মানব জাতির ইতিহাস সৃষ্টিতে সব মানুষই সেই একটি আইন কাঠামোর আওতাভুক্ত।

প্রত্যেক শ্রমিকই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য দায়ী

ইসলাম সকল কাজকেই নিয়োগকারী ও নিয়োজিতদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত মনে করে। এতদ্ব্যতীত, একজন স্বনিয়োজিত ব্যক্তিও আল্লাহর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ, যদি তার নিজের জন্যও হয় অথবা তার পৃষ্ঠপোষক বা সমাজের অন্য কেউ হয়, যারা তার উৎপাদনের সুবিধাভোগ করে থাকে। চুক্তির দু'টো দিক রয়েছে। এক. দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন, দুই. বিনিময়ে পুরস্কার বা প্রতিদান। কর্ম সম্পাদনে নিষ্ঠা ও সততার জন্য প্রত্যেকেই সমান দায়িত্বহীনতার অপরাধের অংশীদার, কেননা সেটা স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির বরখেলাপ। আল্লাহ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যেন আমরা আমাদের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি পালনে সম্মান দেখাই, ওয়াদা পালনে যত্নবান হই এবং সম্পাদিত সকল চুক্তি বাস্তবায়নে নিষ্ঠাবান হই। আল্লাহ স্পষ্টই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, "তোমাদের আমল সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে" (১৬ ঃ ৯৩)। একই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে রাসূল (সা.) বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন মেষপালক, নিজের মেষপালের জন্য নিজেই দায়ী থাকবে ... মালিকের গৃহভৃত্যের দায়িত্ব তার মালিকের গৃহের ওপর, নেতার দায়িত্ব তার অনুসারীদের ওপর। (বুখারী ও মুসলিম)। উমার (রা.) এর মতে "পরবর্তী দায়িত্ব বহনকারীর বোঝাই সবচেয়ে বেশী ভারী।" (বুখারী ও মুসলিম)

পারিশ্রমিক ছাড়া কোন কাজ নেই এবং সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের সকল সৎকর্মই যেমন পুরস্কৃত হবে, তেমনি তার অসৎকর্মের জন্যও রয়েছে শাস্তি (৯৯ ঃ ৭-৮)। ইসলাম বিশেষভাবে এই শিক্ষা দেয় যে, পার্থিব কাজের জন্য সে তার প্রাপ্যের কমবেশী পাবে না (১১ঃ১৫)। প্রত্যেক শ্রমিকই তার শ্রম অনুসারে সুবিধা পাবে, এতে তার প্রতি কোন অবিচার করা হবে না (৪৬ ঃ ১৯)। কুরআনুল করীমে আরো বলা হয়েছে, "শ্রমিকের প্রাপ্য প্রদানে কমতি করোনা" (১১ ঃ ৮৪, ২৬ঃ ১৮৩)। ইসলামী আইনে এ নির্দেশও রয়েছে যে, কোন শ্রমিক কোন কারণে অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য হলেও তাকে প্রাপ্য পরিশোধ করতে হবে। ন্যায় বিচার এটাই প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে, যেকোন কাজের পুরস্কারের বেলায় বেশীও দেয়া হবে না আবার কম দেয়ার ব্যবস্থাও থাকবে না। ইসলামী ন্যায়শাস্ত্রেও এরূপ ব্যবস্থা রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজের জন্য সমান সমান পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, অসম কাজের জন্য অবশ্যই অসম পারিশ্রমিক দিতে হবে।

www.pathagar.com

যেহেতু মানুষের মেধা এবং দক্ষতা সবার সমান নয়, তাই সবার উৎপাদন ক্ষমতাও সমান হতে পারে না। বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের জন্য একই পরিমাণ পারিশ্রমিক প্রদান করা যেমন অন্যায়, তেমনি একই ধরনের সমান কাজের জন্য অসমান পারিশ্রমিক দেয়াও অন্যায়। পারিশ্রমিকের বেলায় এমন বৈষম্য সৃষ্টি করা হলে শ্রমিক আলস্য প্রদর্শন করবে এবং তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাবে বিনিয়োগকারী ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সবচেয়ে ক্ষতিকর কথা হলো, শ্রমিকের প্রতি এমন বৈষম্যমূলক ব্যবহার অসন্তোষের সৃষ্টি করবে এবং ন্যায়বিচারের প্রতি মানুষের যে আস্থা রয়েছে তার প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হবে। অথবা এমনও হতে পারে যে, যখন তারা দেখবে তাদের ন্যায়বিচারের প্রতি খোলাখুলি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে, তখন তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং সামাজিক শৃংখলার তথাকথিত বেড়াজাল ছিন্ন করতে বিন্দুমাত্রও পরোয়া করবে না। ইসলাম যেমন নিয়োগকারীকে অবজ্ঞা করে শ্রমিককে লালন করতে চায় না তেমনি শ্রমিককে অবজ্ঞা করে নিয়োগকারীকেও লালন করতে চায় না। ইসলাম উভয় পক্ষের জন্যই ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এটা সমাজের প্রত্যেকের জন্যই প্রাচুর্য ও সম্মানের সাথে বাঁচার নিশ্চয়তা বিধান করে। অদক্ষ এবং দক্ষ শ্রমিক, খাল খননকারী, গভর্নর-মন্ত্রী বা খলিফার মধ্যেকার বৈষম্যের প্রতি ইসলাম বিশেষ মনোযোগ দিয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম তাদের প্রত্যেকের ওপর নিয়োগকারী এবং সমাজ উভয়ে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে তার প্রতি সমান গুরুত্ব দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিশ্রমের জন্য নিয়োগকারীর প্রতি শ্রমিকের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই, যেহেতু উভয়পক্ষের চুক্তির ভিত্তিতেই শ্রমিক তার শ্রম দান করেছে এবং শ্রমিক বাধ্যবাধকতাই পালন করেছে মাত্র (৪১ ঃ ৮)। এভাবে ইসলাম আইন এবং কর্ম নীতির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমিকের শ্রমের মর্যাদা, সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

শ্রমিকের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করে রাষ্ট্র

শ্রমিকের পারিশ্রমিক–যা তার প্রাপ্য তা বন্ধ করে রাখা বা অন্যভাবে বিনষ্ট করা রাষ্ট্র ও আল্লাহর কাছে সমান অপরাধ। আল্লাহ বলেন, "পুরুষ হোক কি স্ত্রী (যেকোন শ্রমিকের) কারো কাজকে (প্রাপ্য) আমি বিনষ্ট করবো না" (৩ : ১৯৫)। রাসূল (সা) বলেছেন, "শ্রমিকের প্রাপ্য তার গায়ের ঘাম শুকোবার পূর্বেই দিয়ে দাও"। আবার সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "আমি নিজেই অভিযোগকারী হবো যে নিয়োগকারী শ্রমিকের প্রাপ্য ঠিকমত দেয় না।" রাষ্ট্র এর তত্ত্বাবধান করবে যে, শ্রমিকের ন্যায্য পাওনার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে, শ্রমিক তার প্রাপ্যই গ্রহণ করেছে বা তার কমবেশী করা হয়নি। অতিরিক্ত যা গ্রহণ করা হয় তা থেকে পারিশ্রমিক পৃথক করে নিতে হবে এবং অতিরিক্ত যা গ্রহণ করা হবে তাকে 'পুরস্কার' হিসেবে পরিগণিত করা হবে। শ্রমিককে যতটুকু কম দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে। এ স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের দ্বারা রাষ্ট্র শ্রমিকের পারিশ্রমিকের অন্যায় দাবীর মুখে, যা শ্রমের সাথে সমানুপাতিক নয়, তা থেকে নিয়োগকারীর নিরাপত্তার

www.pathagar.com

বিধান করেছে। শ্রমিকের পারিশ্রমিক তার মৌল প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট না হলে নিয়োগকারীর ওপর দায়িত্ব না বর্তিয়ে সংশ্লিষ্ট সমাজের ওপর দায়িত্ব বর্তাবে।

সামর্থ অনুযায়ী কাজ ও বিশ্রামের অধিকার

ইসলামের শিক্ষা, "আল্লাহ কারো ওপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা' তার সাধ্যাতীত" (২ঃ ২৮৬)। আমাদেরকে আল্লাহ এরূপ প্রার্থনা করতে শিখিয়ে দিয়েছেন, "আল্লাহ, আমাদেরকে শক্তি সামর্থের অধিক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিও না" (১৭ ঃ ৭)। রাসূল করীম (সা)ও কখনো কর্মচারী বা দাসদাসীকে সামর্থের বেশী দায়িত্বের নির্দেশ দেননি। "তাদের সামর্থের অধিক কাজ আদায় করতে চাইলে তাদেরকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত কর।" এ ধরনের সহযোগিতাকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের মতোই তারা গণ্য করে থাকে, যা অন্য কোন পদ্ধতি যেমন যান্ত্রিকীকরণ ও শ্রমিক সমাবেশের দ্বারাও সম্ভব হতে পারে। রাসূল করীম (সা) আরো বলেন, "মানুষের যেমন নিজের প্রতি নিজের দায়িত্ব রয়েছে তেমনি তার শরীর, তার স্ত্রী (পরিবার), তার চোখ (মানসিক বা নান্দনিক সন্তোষ) -এর প্রতিও কিছু কিছু দায়িত্ব রয়েছে।" ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিকদের বিশ্রাম নেয়ার, নিজের বন্ধুবান্ধব ও পরিবার-পরিজনের প্রতি যত্ন নেয়ার এবং আমোদ প্রমোদ করার অধিকার থাকবে। মৌল চাহিদা মেটানোর জন্য যাতে শ্রমিক সারাক্ষণ চিন্তা করে তার শক্তি সামর্থ নিঃশেষ না করে তার প্রতি ইসলাম সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

শ্রমিকের সুন্দর জীবন যাপনের অধিকার

আল্লাহ মানুষকে মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন (৫১ঃ১৯, ৭০ঃ২৫)। সমস্ত ফেরেশতা ও সৃষ্ট জীবের ওপর তাকে স্থান দিয়েছেন। মানুষের প্রতি এ সম্মান শ্রমিকের নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্য অপ্রতুল পারিশ্রমিকের মাধ্যমে ভূলুণ্ঠিত করা যাবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করে দিতে বাধ্য। এরূপ সাহায্যকে দান না বলে অন্যের সম্পদকে বণ্টনের একটি দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হবে (মোহাম্মদ আল মুবারক "আরা ইবনে তাইমিয়াহ, "আল আমল ওয়াজিব ইজতেমাই, আল ইজবর)"। সমাজ ও রাষ্ট্র এরূপ সাহায্য বিতরণ করে দিতে বাধ্য না থাকলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের তা বিতরণ করে দেয়া উচিত। রাসূল (সা) বলেন, "কেউ মরণের সময়ে সম্পত্তি রেখে গেলে উত্তরাধিকারীরা তার মালিক হবে। কেউ মরণের প্রাক্কালে সম্পত্তি না রেখে মরে গেলে আমিই হবো তাদের পিতা, তাদেরকে প্রয়োজনে আমার কাছে আসতে দাও।"

কর্ম নির্বাচনের স্বাধীনতা ও সমাজের দায়িত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের কর্ম নির্বাচনের স্বাধীনতা রয়েছে। আল্লাহ সব মানুষকে বিবেক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে সমাজের মঙ্গলের স্বার্থে স্বাধীনভাবে কাজ

www.pathagar.com

বাছাই করতে পারে। আল্লাহ মানুষকে কার্যব্যপদেশে বিভিন্ন স্থানে খলিফা হিসেবে প্রেরণ করেছেন যেন মানুষ ন্যায়নিষ্ঠভাবে কাজ করে। নিয়োগ ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য নির্ভর করে প্রয়োজনীয়তা ও মেধার ওপর। পারস্পরিক স্বার্থ আর সামাজিক অগ্রগতিও এ বৈচিত্র্যের ওপরই নির্ভর করে। এভাবে সমাজ (মানব গোষ্ঠি বা জাতি) মানবজাতিরই অংশ। সমাজের একের সাথে অপরের পার্থক্য পরিপূরক বৈ কিছু নয়। এটা অবৈধ বৈষম্যমূলক কিছু নয় যেমনটা গোষ্ঠীবাদ, প্রাদেশিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদ বা জাতি শ্রেষ্ঠত্ববাদে রয়েছে।

ইসলাম এ নিশ্চয়তা বিধান করে যে, সমাজের যে যে কাজের উপযোগী সে সে কাজ করবে আর যে যে কাজের উপযোগী নয় সে সে কাজ করবে না। মুসলিম শাস্ত্রবিদগণ সমাজের সকল কাজকে ফরযে কেফায়া বলে অভিহিত করেছেন। যেমন সমাজের সবার ওপর কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে সমাজের বেশ কয়েকজন পালন করলে সমাজের প্রত্যেকের দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। আবার সমাজের কেউ যদি অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে তাহলে প্রত্যেকেই দায়িত্ব পালন না করার জন্য দোষী হবে। এমন ত্রুটি থেকে মুক্তি পেতে হলে ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজের নিজস্ব প্রয়োজনে তার সদস্যদেরকে তাদের পছন্দমাফিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলতে হবে। পছন্দ অনুসারে সমাজের সদস্যদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের এমন হস্তক্ষেপ ইসলামী আইনমতে বৈধ যদি সমাজ অস্তিত্ব রক্ষার্থে তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা রয়েছে যে, সে তার নাগরিকদেরকে নিজ প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্রের কল্যাণে বাধ্য করতে পারে। এমন কি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কারণে তার নাগরিকদেরকে সেনাবাহিনীতেও ভর্তি করতে পারে (২ ঃ ২৬৮)। এমনকি রাষ্ট্র যদি কাউকে কাজে নিয়োগ করে থাকে যার কোন প্রয়োজন ছিলনা বা তারা যোগ্য ছিলনা, সেক্ষেত্রে তা সুবিধাবাদের আওতায় পড়ে। এমন যদি হয় তাহলে তা আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রাসূল ও বিশ্বাসীগণের নিকট আল্লাহদ্রোহি বলে গণ্য হবে।

শ্রমিক ও সমাজ

পূর্বে আলোচিত কাজের প্রকৃতি অনুসরণই হবে সমাজের প্রধান দায়িত্ব। কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কাজের এমন প্রকৃতি প্রতিষ্ঠা ছাড়াও যাকাত, সদ্‌কা, কাফ্‌ফারা, নাদাহুর, ওয়াসিয়া, সম্প্রসারিত পরিবার, ওয়াকফ-এর ন্যায় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে সমাজের সদস্যগণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে। একটি স্বর্ণযুগের প্রত্যাশায় বা জনগণের মঙ্গলের নিমিত্তে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৈধ উৎসাহ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে ইসলামী সমাজের এমন সব প্রতিষ্ঠান ছিল যেগুলো মসজিদ, স্কুল, কলেজ, পাবলিক লাইব্রেরী, হাসপাতাল, মুসাফিরদের জন্য সরাইখানা এবং ভুখানাঙ্গাদের জন্য হোস্টেল, পুল ও রাস্তাঘাট, সরকারী জলাশয়, অক্ষম, বৃদ্ধ ও অন্ধদের জন্য আশ্রয়স্থল, বন্দীদের জন্য সেবা, দেওলিয়াদের জন্য তহবিল, গরীব

www.pathagar.com

কৃষকদের জন্য বীজ, যন্ত্রপাতি, সাধারণের ব্যবহারের জন্য বৃক্ষরোপণ, কুরআন অধ্যয়ন ও গবেষকদের সহায়তা, রমাযানে দরিদ্রদের খাওয়ানো, রোগীর মানসিক চিকিৎসা, হাসপাতালের রোগীদের জন্য থিয়েটার, গান ও বাদ্যযন্ত্র, বন্যপশুর মুক্তি ও ক্রয়ের জন্য অর্থ সাহায্য ইত্যাদি সহযোগিতা প্রদান করত। এমন সমাজে, যেখানে মানুষের মঙ্গলের জন্য সকল ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে মানুষ মানুষের জন্য উদ্বিগ্ন থাকবেই। কাজেই এ সমাজের জন্য রাষ্ট্রের অহেতুক চিন্তা ছিল না। তখন পারস্পরিক দায়িত্ববোধে তেমন দৃঢ় উচ্চতর বা নির্ভেজাল থাকারও প্রয়োজন ছিল না। সংক্ষেপে বলতে গেলে ইসলামী আইন বা নীতিশাস্ত্রের প্রভাবে মানুষের এতবেশী মানবতাবাদী হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু এসব প্রতিষ্ঠান লক্ষ লক্ষ মানুষের কল্যাণেই পরিচালিত ছিল যারা স্বর্ণ, উদ্বৃত্ত বার্লি বা তেল যা কিছু পারত তাই এসব প্রতিষ্ঠানে দান করত।

এ ধরনের সমাজ পুনরায় সৃষ্টি করা সম্ভব এবং এটাই হোক আমাদের সকল পরিকল্পনা ও শিক্ষা সংস্কৃতির লক্ষ্য। ইতোমধ্যে যেসব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্বই নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা সেখানে ইসলামই এসব মুসলিম সমাজকে গুরুতর অপরাধে অপরাধী ঘোষণা করতে পারে। মূলতঃ তারা অপরাধী নয়। বলাবাহুল্য বর্তমান বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ্ আজ ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়াতে ডান ও বামপন্থী বিপ্লবীদের আত্মঘাতী রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম সরকারের হাতে একটিই মাত্র সমাধান রয়েছে যা এক্ষুণি বাস্তবায়িত করার জন্য পরিকল্পনা নিতে হবে। যেমন প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিম্নলিখিত কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশে অন্যান্য উম্মাহ্র সাথে সংগতি রেখে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

শিক্ষা

শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া মুসলিমগণ মনে নিতে পারে না। অশিক্ষা ও অজ্ঞতার জন্য সমাজের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কোন উপযুক্ত কারণ নেই। সামর্থ অনুসারে প্রত্যেক মানুষই সমাজের প্রয়োজনে জীবনের প্রথম দিকে সব ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করবে। এটা নিশ্চিত যে, এ পর্যায়ে শিক্ষার বস্তুগত মান খুব উঁচু স্তরের না হলেও খুব নিচু স্তরের হবে না। তবে এটা ভাবা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সবচেয়ে ভাল শিক্ষার সাথে এর তুলনা করা যাবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জনগণকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলা। শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে মুসলমানদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সরকারী সুযোগ সুবিধা, বিদ্যালয়ের সকল আবশ্যকীয়তা, বিনামূল্যে বস্ত্র, খাদ্য এবং প্রয়োজনে আশ্রয় পাওয়ার অধিকার থাকবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় ছুটি বলতে কিছু নেই। এখানে ফযর থেকে দিনের শুরু আর লেখাপড়া, শরীর চর্চা, আমোদ প্রমোদের মাধ্যমে এশার সাথে দিনের শেষ। শিক্ষার বাইরেও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে ছাত্রদের নিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে কাজের জন্য খাঁটি শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করে

www.pathagar.com

দেশরক্ষা ও চাষাবাদে নিয়োগ করা হবে। সে সমাজে এমন সুবিধাদির ব্যবস্থা থাকবেনা সে সমাজ অপরাধী বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে সে সমাজও অপরাধী। এ ধরনের কাজ করতে ব্যর্থ সে সমাজ অপরাধের দোষে দোষী। আর যে সমাজ এ কাজ সম্পাদনে অপারগ সে সমাজ বিপ্লব ও বিশৃংখলার উপযুক্ত।

উৎপাদন ও কর্মে নিয়োগ

বিশ্ব মুসলিম দরিদ্রতা ও অভাব সহ্য করতে পারে না। কুরআনে দারিদ্র ও অভাবকে "শয়তানের প্রতিষ্ঠান" (২ ঃ ২৬৮) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এহেন অনগ্রসরতা ও দারিদ্রের করাল গ্রাস থেকে মুসলমানদের মুক্তি পেতে হলে কঠোরভাবে সূচীবদ্ধ কাজে অংশগ্রহণে উদ্যোগী হতে হবে। প্রাথমিকভাবে পেশাগত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রাজুয়েশন নেয়ার পর তাদেরকে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োগ করতে হবে। তাদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত কাজে নিয়োগ করার সাথে আধুনিক প্রশিক্ষণ ও বর্ধিত ক্ষমতা অর্জনের সুবিধা প্রদান করতে হবে। সে সাথে তাকে তার পরিবার পরিজনের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ভোগের পর উৎপাদনের যে অংশ অতিরিক্ত থাকবে তা অন্ততঃ বর্তমান বংশধরদের সাধারণ কোষাগারে (কমনওয়েলথ) চলে যাবে, ততদিন পর্যন্ত যতদিন সমাজ দারিদ্র, অভাব ও নির্ভরশীলতা দূর করে ভবিষ্যতের সকল উম্মাহ্র জন্য উন্নত জীবনযাত্রা নির্বাহে প্রচুর মূলধনী সম্পদের ব্যবস্থা করতে না পারে।

বিশ্বের কোন কোন এলাকায় মানুষের প্রচেষ্টার সন্নিবেশকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের খাতিরে মুনাফার পুনঃ বিনিয়োগকে ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনীতির সাধারণ ব্যবস্থাপনা বলা যাবে না। এর সাথে সমগ্র উম্মাহর জন্যও বর্তমান অবস্থা স্বাভাবিক নয়। বস্তুত, পরিস্থিতিটা খুবই দুঃখজনক। এখানে ঐক্য ও সংহতির অভাব রয়েছে। রয়েছে উম্মাহ্র মৌলিক চাহিদা না মেটানর করুণ পরিণতি। অন্যেরা যেখানে সম্পদগুলো লুটে নিচ্ছে আর ধ্বংস করছে সেসব সম্পদ যা থেকে মুসলিম উম্মাহ্ কিছুটা উপায় করে নিতে পারত। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হবে। অনুপযুক্ত সরকারগুলোর বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে, যেখানে তারা অর্থনীতিতে চাংগা হয়ে ওঠা পর্যন্ত বৈপ্লবিক পথ বেছে নেবে। যেখানে কোন নিয়ন্ত্রণের বা পুনরুদ্ধারের সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে না। আর এজন্য প্রয়োজন সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয় মেধা যা অবিলম্বে মুসলিম দেশগুলোকে আয়ত্ত করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি মুসলিম দেশগুলোর মেধা আছে কিন্তু তারা হয় অলস না হয় তাদের মেধা ব্যবহৃত হচ্ছে না। বা অমুসলিম দেশগুলোর প্রয়োজনে সে মেধা ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যবস্থাপক বা উপব্যবস্থাপককে এটা জানতে হবে যে, "সে যদি প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদন বাড়াতে না পারে তাহলে সে হবে ব্যক্তিগতভাবে অপরাধী এবং ইসলামী আইন অনুসারে তার এ অপরাধ আল্লাহ্, রাসূল ও উম্মাহ্র প্রতি অপরাধের সমতুল্য।" এ শিক্ষা প্রত্যেক ব্যবস্থাপক ও মুসলমানকে আয়ত্ত

www.pathagar.com

করতে হবে। যারা শাসক ও শাসিত তাদের উভয়কেই এটা দেখতে হবে। শাসকগণ অসমর্থতার জন্য ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য থাকবে বা অক্ষমতার জন্য তার ফল ভোগ করবে। আর জনগণকেও তা দেখতে হবে যেন শাসকগণ তাদের দায়িত্ব পালন করেন এবং জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে কি অযোগ্য শাসকের হাত থেকে যোগ্য শাসকের হাতে বা জনগণের প্রতিনিধির হাতে জরুরী অবস্থায় প্রভূত ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব? অথবা জরুরী অবস্থা অতিক্রম করছে এমন অবস্থাইবা কিভাবে নির্ধারণ করা যাবে? এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে যে, যুদ্ধের সময়েও বৃটেনের প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র চার্চিলকে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছে। শরীয়ত এবং উম্মাহ্‌র স্বার্থে ইসলামী আদর্শের প্রতি আনুগত্যের বোধই কেবল এ প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর হতে পারে। মুসলমানদের এটাও একটা আদর্শিক সম্বল। জাতীয়তাবাদ, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববাদ, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি সবই তাদের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। যখন ইসলামের প্রতি আনুগত্য বৈপ্লবিক চেতনার সৃষ্টি করবে তখনই শরীয়তের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা এবং সবচেয়ে পরাক্রমশালী একনায়কদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে।

লেখকের এ যুক্তির একটি মৌলিক দিক রয়েছে, যার প্রতি লেখক সত্য-অসত্য চিন্তা না করেই বশীভূত হয়ে পড়েছেন। প্রথানুযায়ী সঠিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা একজন শ্রমিক তার চাকরি জীবনের ৩৫-৪০ বছরের গড়পড়তা উৎপাদনের সাহায্যে শিশুকাল, যৌবনাবস্থা ও বৃদ্ধ বয়সের জন্য পুঁজি বিনিয়োগের নিমিত্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারে। নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করছে এমন প্রত্যেক মুসলিম শিশুকে এ শিক্ষা দিতে হবে। এটা ধরে নেয়া যায় যে, প্রত্যেক শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করবে তার প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পুঁজি দ্রব্যের ওপর। এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই যে, আজ যে মুসলিম জাতি জন্মগ্রহণ করলো তার শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা একেবারে শূন্য থেকেই শুরু করতে হবে। তবে একথাও সত্য যে, তার যাত্রা শুরু করতে হবে শূন্য অবস্থা থেকেই। মুসলিম জাতির বর্তমান দারিদ্রাবস্থা সে শূন্যতাই প্রমাণ করে।

এভাবে সমগ্র উম্মাহ্‌কে দরিদ্রতার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হলে দায়িত্ব শুধু প্রকৃতি (প্রাকৃতিক সম্পদ) কিংবা মানুষ বা শ্রমিক হিসেবে মুসলমানদের ওপর বর্তাবে না বরং বর্তাবে পুরো ব্যবস্থাপনায় যারা জড়িত তাদের এবং শাসকদের ওপর। অপরপক্ষে কর্তৃত্ব পরিবর্তন করে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উম্মাহ্‌র অগ্রগতি ও মুক্তির চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন।

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বে শ্রমিক উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি এলাকা

মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি শ্রমিক এলাকায় বিভক্ত। একটি দেশে এ অবস্থা একাধিক শহর বা এলাকায় পরিলক্ষিত হবে। কোন শহর, প্রদেশ ও দেশে শ্রমিকদের কেন্দ্রীভূত হওয়ার দু'টো কারণ থাকতে পারে ১. দেশান্তরগমন ও ২. শিশুমৃত্যু হারের হ্রাস প্রাপ্তি। দেশের অভ্যন্তরে দেশান্তর গমনই শ্রমিক কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রাথমিক কারণ। এক দেশ থেকে অন্যদেশে শ্রমিক কেন্দ্রীভূত হবার কারণ হল জনসংখ্যার প্রাকৃতিক বৃদ্ধি, এক দেশের সাথে অন্যদেশের সীমান্ত সংলগ্নতা, দেশান্তর গমন ও অভিবাসন। প্রথম প্রথম উপনিবেশবাদী শাসন আমলে দেশের অভ্যন্তরে কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থ রক্ষার্থে অস্তিত্বহীন সীমানা সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রত্যক্ষভাবে কায়েমী স্বার্থবাদীদের বা ঔপনিবেশিকদের স্বার্থ রক্ষা হোক বা না হোক জাতীয় সরকারগুলোও এ পন্থা অবলম্বন করে। মিসর, নাইজেরিয়া, মরক্কো, তুরস্ক, ইরান, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া শ্রমিক উদ্বৃত্ত দেশ। অন্যান্য সব মুসলিম দেশ শ্রমিক ঘাটতির দেশ। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মিসর ও ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা বন্টনে যেমন ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তেমনি আলজেরিয়া, তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তানে জনসংখ্যা বন্টনে এ সমস্যা আরও কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে।

সম্পদ ও সংগঠনের সমস্যা

ক. উদ্বৃত্ত শ্রমিক এলাকা

শত শত বছর ধরে দুনিয়ায় সামন্তবাদীদের শাসনই কায়েম ছিল। ফলে ভূমিতে উদ্বৃত্ত কৃষি-শ্রমিকদের বিনিয়োগের সুযোগ তেমন একটা ছিলনা। বস্তুতঃ তার অবস্থা ছিল দিন এনে দিন খাওয়া থেকেও নিম্ন পর্যায়ের। খুব কম ক্ষেত্রেই সে ছিল তার চাষকৃত জমির মালিক। সামন্তপ্রভু ও ফটকা ব্যবসায়ীরা বাৎসরিক চাষাবাদে মূলধন জোগাত আর তাদের ধার্যকৃত মূল্যে বা অন্য ফটকা ব্যবসায়ীদের দ্বারা নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের ফসল এবং অন্যান্য মূলধন ক্রয় করে নিত। বেশীর ভাগ শ্রমিকই ছিল কিশোর। মেশিনের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। শ্রমিকরাই ছিল সম্পদ। তাদেরকে ক্ষণস্থায়ী ভিত্তিতে শহরাঞ্চলে চাকরি দেবার কথা বলে প্রলুব্ধ করা হতো। এতদসত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহে সামান্য খয়রাতের জন্য প্রাচুর্যের স্থান পৌর এলাকায় তারা পাড়ি জমাতো।

কৃষি শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন কোনদিন হবে না যে পর্যন্ত সামন্তবাদীদের ভূসম্পত্তিকে ব্যবস্থাপনাযোগ্য আকারে না আনা হবে এবং শ্রমিকরা জমির মালিক না হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এটাই খুব উৎকৃষ্ট পন্থা। দ্বিতীয় উপায় কৃষিকাজকে এমনভাবে পুনঃসংগঠিত করতে হবে, যাতে (সমবায় পদ্ধতি) উৎপাদন মজুদ, বিপণন, পরিবহণ ইত্যাদি সব ব্যবস্থা ফটকা ব্যবসায়ীদের

www.pathagar.com

থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে। এসব কাজ করতে গেলে যে মেধার প্রয়োজন তা এখন গ্রামাঞ্চলে নেই। সুতরাং শহরবাসীদের গ্রামে পাঠানর জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যথাসময়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও পেশাগত) সংস্কার গ্রামদেশে পর্যাপ্ত জনশক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম হবে।

পৌর এলাকার শ্রমিকদের অবস্থা কৃষি শ্রমিকদের চেয়ে মোটেও ভাল নয়। কেননা উপনিবেশিক শক্তি ঔপনিবেশিক আমলের শ্রমিক সংগঠনগুলোকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। শ্রমিক সংগঠনগুলো ক্ষমতাসীনদের নিকট রীতিমত হুমকিস্বরূপ ছিল। তবে সবচেয়ে খারাপ কথা এই যে, সব শ্রমিক সংগঠন (মিসর, লিবিয়া, ইরাক, ইত্যাদি) সোস্যালিস্ট ইউনিয়নে পরিণত হয়েছিল। সোস্যালিস্ট ইউনিয়নে রূপান্তরিত হওয়ার পর শ্রমিকদের মংগল সাধনের পরিবর্তে দু'টো কারণে এদের অবস্থা আরো অবনতির দিকে যেতে থাকে। প্রথমতঃ সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে শ্রমিক সংগঠনে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ইউনিয়নগুলোকে বাধ্য করা হয়েছিল যেন উচ্চ বেতন ও উন্নততর সেবার জন্য আন্দোলন করা হয়। এতে এমন পরিস্থিতি হয়েছিল যে মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিএনপি) কোন তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। শহরতলীর শ্রমিক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার নিম্নমান শহুরে জীবনকে দূষিত করে তুলেছিল। বিশেষ করে এর প্রভাবে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাদিসহ সকল সেবামূলক কাজ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। এর পরিণামে লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্যদ্রব্যের আমদানী, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণের জন্য শহুরে নিয়মের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিল। এসব নিয়ম কখনো পর্যাপ্ত ছিল না এবং আরো অধিক মাত্রায় মানুষ শহরে চলে যাওয়ার দরুণ অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ফলে আজকের মুসলিম বিশ্বের কোন দেশ বা শহরের লাখো জনতা জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের রাজনীতির শিকারে পরিণত হয়েছিল। যাদের নিকট থেকে এসব মুসলিম দেশ খাদ্য আমদানী করে থাকে এমন বিদেশী শক্তি তাদের নব্য উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে তাদেরকে শোষণ করতে থাকে।

এসব দেশের উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকরা তাদের দেশের অবনতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থায় কষ্টভোগ করছে। উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এসব দেশের জনগণের মঙ্গল ও অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি। কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ জনবিস্ফোরণ ও অশিক্ষিত গ্রাম্য জনগণের শহরে প্রবেশের দরুণ শ্রমিকদের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা এবং সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের অভাবের দরুণ সব দেশের অবস্থা ক্রমেই অধঃপতনের দিকে যাচ্ছিল। হতাশা যতই বাড়ছিল অবস্থা ততই মন্দ থেকে মন্দের দিকে যাচ্ছিল। জাতীয় রাজনীতির সফলতার বিনিময়ে শিক্ষিত শ্রমিকগণ তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে পারতো। কিন্তু দুর্নীতিবাজ নেতৃত্ব, প্রশাসনিক রাজনীতিকরণে অসততা, অপেক্ষাকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিরুৎসাহিতকরণ, কল্পণাপ্রবণ নাগরিক ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিরুৎসাহিত করার ফলে তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটেনি। মেধাসম্পন্ন

www.pathagar.com

ব্যক্তিগণ হতাশার দরুণ দেশ ছাড়ার পথ খুঁজছিল। উচ্চ শিক্ষিত লোক যারা দেশের টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রচলিত পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতম ফসল, তারা অন্যত্র উন্নত ভাগ্যের সন্ধান করছিল। উদ্বৃত্ত শ্রমিকের দেশের প্রত্যেকটিতেই এ অবস্থা বিরাজ করছে। এ হীন অবস্থা জনগণকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিছে।

একথা ঠিক যে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ব্যতীত এসব উদ্বৃত্ত শ্রমিক অধ্যুষিত দেশের ভাগ্যে কোন পরিবর্তন ঘটান সম্ভব নয়। আমাদের দরিদ্র মুসলিম বিশ্বকে এটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, অভ্যন্তরীণভাবে স্বল্প ব্যয়ে শিল্প কারখানার উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাতে পারব কিনা। মিসর, বাংলাদেশ ও জাভার মতো দেশে উদ্বৃত্ত শ্রম-জনশক্তিকে এভাবে শিল্পখাতে নিয়োগ করা যায় কিনা সে ব্যাপারে এখনো সন্দেহ রয়েছে। তবে এসব দেশে কিছু অগ্রগতি অবশ্যই সম্ভব যদি একটি দূরদর্শী ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা যায়।

উদ্বৃত্ত শ্রমকে শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত করে উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণে প্রয়োগ করা যেতে পারে। শ্রমিক জনগণের অল্প অংশই মাত্র এসব দেশের অবকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজন হতে পারে যা দেশের জন্মগত সম্পদ প্রাপ্তির সুলভ অবস্থার ওপরই নির্ভরশীল। এ অবকাঠামো নির্মাণের দ্বারা দেশের কৃষি, শিল্প ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির বেশ কিছু অংশকে কাজে লাগানো সম্ভব। এর ফলে যে অর্থ উপার্জিত হবে তা পুঁজিঘন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত শ্রম শক্তিকে অধিকতর কর্মে নিয়োগ সম্ভব হবে। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, মিসরের মতো দেশে গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের এখনো কোন ব্যবস্থা না হওয়া এবং গ্রামগুলো ভেঙে আবার নতুন করে পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা। বেকারদের বাধ্যতামূলক কর্মে নিয়োগেই রয়েছে এর সমাধান। ইসলামী আইন এর জন্য প্রশংসার দাবীদার যা আমাদেরকে ফেরাউন ও মেসোপটেমীয় সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্পদের যেখানে স্বল্পতা বেগার খাটা শ্রমিকের মাধ্যমে সেখানে উদ্বৃত্ত শ্রম সমস্যার সমাধান সম্ভব।

খ. ঘাটতি শ্রমিকের এলাকা

সুদূর অতীতে মুসলিম বিশ্বের যেসব দেশে শ্রমিকের অভাব ছিল, স্বল্প আয় ও স্বল্প জনসংখ্যা ছিল সে–সব দেশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অতীতের মতো এসব দেশের জনগণও শুধুমাত্র কোন প্রকারে বেঁচে থাকত। আরব উপদ্বীপে ইউরোপের উপনিবেশ কায়েম হওয়ার ফলে এসব দেশের জনগণ দারিদ্র ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এসব দেশে কোথাও জনগণের অভিবাসনের অধিকার ছিল না। আবাদযোগ্য যেসব জমি ছিল তাতে সত্যিকারভাবে কোন চাষাবাদ করা হতো না এবং এসব জমির উৎপাদনই ছিল দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড। এসব দেশের ভেতরে বা বাইরে কদাচিৎ আন্দোলন হত। খনিজ সম্পদের আবিষ্কার অতি সাম্প্রতিক ঘটনা।

www.pathagar.com

এ থেকে অর্জিত উপার্জন দ্বারা এসব দেশ মান্ধাতার আমলের অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব হল সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পূর্ত কর্মসূচীর মতো সম্প্রসারিত কর্ম ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ শক্তির ব্যবস্থা করা। তবে মজার ব্যাপার এই যে, আয় বাড়ার সাথে সাথে তাদের দেশগুলো শ্রমিক ঘাটতির দেশে পরিণত হল। তাদের দেশীয় জনগণ এতই অপ্রতুল হয়ে উঠে যে, শিল্পায়ন, পুনর্গঠন, পূর্ত কর্মসূচী, কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার এবং প্রশাসনের মতো বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে তাদের বর্ধিত আয় তাদেরকে তেমন সুবিধা প্রদান করতে পারেনি। বলা যায় যে, তাদের বর্ধিত আয়ই তাদের "শ্রমিক ঘাটতির" মূল কারণ। তাদের নতুন অর্জিত আয় তাদেরকে "বিদেশী খেদাও" এর মতো ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেছিল। দেশের সরকারকেও সংবিধানের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে এভাবে জনসমাগম রোধ করে নিজস্ব সম্পদ রক্ষায় ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সম্পদ প্রাপ্তির পূর্বে তাদের নাগরিকত্ব আইন নামে কোন আইন ছিল না। তখন যে কেউ চাইলেই নাগরিকত্ব পেয়ে যেত যখন সে ধন সম্পত্তির মালিক হয়ে যেত। বিদেশী হিসেবে নাগরিক অধিকার (Naturalization Law) আদায় করে নিত। তবে এটা যে কোন দেশ, যারা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মনে করে থাকে, তাদের চাইতেও বেশী "বিদেশী খেদাও" –এর অনুসারী হয়ে উঠেছিল।

১. উল্লিখিত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার প্রত্যেক ক্ষেত্রে ছিল শ্রমিক ঘাটতি। তাদের জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিদেশ থেকে লোক আমদানী করা হত আর কিছু কিছু প্রতিশ্রুতিশীল জনশক্তিকে অধ্যয়নের জন্য বিদেশে পাঠান হত। দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব দেশের বিভিন্ন কর্মসূচী বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। মিসরেরই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি ছিল, যদিও ১৯৫২ সালের বিপ্লবের পর মিসরের শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। এর শিক্ষা ব্যবস্থায় কতকগুলো সুপ্ত দুর্বলতা ছিল। তার সাথে রাজনৈতিক নির্যাতন তাদেরকে অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে বাধ্য করেছিল। দারিদ্রের কারণে মানুষের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। দেশের এহেন অবস্থা অভিবাসীদের জন্য দুর্নামের কারণ ঘটায়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বিরাজমান পরিস্থিতিতে একজন মিসরবাসী একটি ধর্মপ্রচারক দলের সাথে মহৎ উদ্দেশে হলেও দেশ ত্যাগ করতে পারতনা। ব্যক্তি হিসেবে এটা ছিল তার দুর্ভাগ্য। দ্বিতীয়তঃ চাকরিতে বিনিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের যেমন উচ্চ প্রশিক্ষণ ছিল না, তেমনি দক্ষতারও যথেষ্ট অভাব ছিল। সিনিয়রদের চাপের মুখে চাকরিতে লোক নিয়োগের ভালমন্দের ব্যাপারে অন্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল। শীগ্‌গীরই ঘাটতির দেশগুলোতে অন্যদেশ থেকে দক্ষতা ও প্রশংসনীয় আনুগত্যসম্পন্ন শ্রমিকদের আগমনের ফলে ঘাটতি পূরণ হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয়তঃ দেশীয় বা বিদেশী অযোগ্য কর্মচারীদের নির্দেশনার ফলে দেশীয় কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে কাডার সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হয়েছিল, খামখেয়ালির ফলে তা' ভেস্তে যায়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভাব দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে, যতদিন অনুপযুক্ত

www.pathagar.com

কর্মচারীরা কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নিজেদেরকেই যোগ্য মনে করে। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে পরিণামে অযোগ্যতাই বৃদ্ধি পায়।

২. অন্যভাবে দেখলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শ্রমিক ঘাটতির দেশগুলোতে ওপরে আলোচিত বিষয়গুলো থাকা সত্ত্বেও সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ভেস্তে যায়। কারণ এসব দেশের লোকদের মাথাপিছু আয় যতটা হওয়া উচিত তাদের অর্জিত আয়ের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশী। এ বিপুল পরিমাণ আয় থাকায় সে দেশ সব সময়ই বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে থাকে। যেসব কর্মসূচীতে বিদেশী শ্রমিক আমদানীর চাহিদা রয়েছে সেসব কর্মসূচীতে উৎসাহ দিতে হয়, যতক্ষণ না এসব দেশের সর্বশেষ লোকটি কর্মে পূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়। প্রতিশ্রুতিশীল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও লিবিয়া, সউদী আরব, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমীরাত কিংবা ওমানের মতো দেশে বিদ্যমান সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যদি একযোগে প্রশিক্ষণে নিয়োজিত হয়, তবুও এসব দেশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের চাহিদা মেটাতে পারবে না। শুধু যদি লিবিয়া, সুদান ও কুয়েতেই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চালু করা হয় এবং সব দেশের লোকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তাহলে কি ঐ সব দেশের বিপুল চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে ? অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন কর্মসূচীর কোন আলামতও দেখা যাচ্ছে না।

৩. শ্রমিক ঘাটতির দেশগুলোতে কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে ও কৃষিকাজের জন্য কিছু নতুন জমি উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও এসব দেশে কৃষিশিল্পে অগ্রগতির জন্য জাতীয় ভিত্তিতে কিছু উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। কৃষির উন্নয়নে যেসব কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত সামান্য ও গৌণ। এর কারণ শুষ্ক আবহাওয়ার দরুণ নব আবিষ্কৃত সম্পদ খাদ্য ও দ্রব্য আমদানীতে ব্যবহার সহজ ছিল না। আবার ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পশ্চিমা দেশগুলোর ন্যায় যোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়নি। ফলে একটা হীনমন্যতা জন্মে এবং কৃষ্টির উন্নয়নে কর্মসূচীগুলো ক্ষুদ্র ও নগণ্য হতে থাকে। অতিরিক্ত আয়ের বাইরে কোন শ্রমিক-ঘাটতির দেশই জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য অর্থনীতি, জনসংখ্যা বা দেশের সার্বিক কৌশলগত দিক থেকে কোন পরিকল্পনা দাঁড় করাতে পারে নি।

৪. এসব দেশের মৌলিক ত্রুটির একটি হল দূরদৃষ্টির অভাব। ফলে তারা জাতিগঠনে এ পর্যন্ত কোন শক্তিশালী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়নি। তাদের অর্জিত অধিক পরিমাণ উদ্বৃত্ত আয় পশ্চিমা দেশগুলোর উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের অনুন্নয়নের এটাই হল কারণ। বিপুল পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ শূন্য করা হচ্ছে। বিনিময়ে তাদেরকে দেয়া হচ্ছে কাগজী মুদ্রা। তা আবার অর্থ প্রদানকারী দেশকেই একটি চেক বা হুন্ডির মাধ্যমে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর চেয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে সরকারীভাবে নীরব প্রতারণা ও জাতীয় সম্পদের অপচয়ের মতো উদাহরণ দ্বিতীয়টি থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

৫. তবে সব শ্রমিক ঘাটতি দেশই যে উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতার জন্য দায়ী তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কিছু কিছু দেশের (ইরান, ইরাক, আলজিরিয়া, সুদান, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া) বিপুল জনসংখ্যা রয়েছে যেগুলো যথোপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে শ্রমিক ভারসাম্যের জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এরূপ বিশেষ জাতীয় সংগতির জন্য কর্মচারী প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন করতে হবে। দুঃখের বিষয় যে, দূরদর্শিতা ও যোগ্যতার অভাবে উল্লিখিত দেশগুলোর কোনটিই গণভিত্তিক কর্মসূচী প্রণয়নে সক্ষম হয়নি। এসব প্রত্যেকটি কারণে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও নব্য উপনিবেশবাদী শক্তিচক্রের ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্ট আরো জটিল অবস্থা সৃষ্টি করে। এসব দেশ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সংহতির ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

রাজনৈতিক সমস্যা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের ঘাটতি শ্রমিক ও উদ্বৃত্ত শ্রমিকের দেশের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। জাতি-গঠনের সার্বিক অসুবিধা থেকেই প্রত্যেকটি দেশের জন্য সমান অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক আমলের নেতৃত্বে দেশ শাসন করা হচ্ছিল অথবা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মধ্যপন্থী অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের শাসনের মুলোৎপাটন করা হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক নেতাই মিসরের আবদুন নাসের, পাকিস্তানের আইয়ুব খান, ইন্দোনেশিয়ার সুয়েকর্ন ছাড়া উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু জাতিগঠনে তাদের ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে (১৯৫৬ সালে সিরিয়া থেকে মিসরের বিচ্ছিন্নকরণ, আইয়ুব খানের ১৯৬২ সালের সংবিধান ঘোষণা) তাদের জনপ্রিয়তাও ম্লান হয়ে আসছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যত মুসলিম দেশ রয়েছে প্রত্যেকটির রাজনৈতিক দুর্বলতা হল প্রতিটি সরকারই পুতুল সরকারের মতো। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনুপযুক্ততা, দূরদর্শিতার অভাব এবং নেতৃত্বের দুর্বলতা –এসবই ঐসব দেশের সরকারের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বলতে গেলে মুসলিম দেশগুলোর দুর্বলতা তাদের মধ্যেকার অনৈক্য, অভ্যন্তরীণ জাতীয় অসংহতি এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের মধ্যেই নিহিত। এসব বিষয়ের অনুপস্থিতির দরুণ কোন সরকারই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। সেজন্য প্রতিটি মুসলিম সরকারই মসনদ থেকে বিতাড়ন ও প্রথম সুযোগেই জনগণের রোষের মুখে পতিত হওয়ার ভয়ে তাদের সকল শক্তি গদিতে টিকে থাকার পেছনে ব্যয় করেছে। সব মুসলিম দেশেরই নীলনকশা তৈরী হয়েছে লন্ডন বা প্যারিসে। আর প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরেই এক বা একাধিক ভিন্ন মতাবলম্বী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশের বাইরে এক দেশের সাথে অন্য দেশের সীমান্ত বিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে সব সময়ের জন্য জনগণকে এসব ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। এভাবে গুপ্ত পুলিশের দমনমূলক নীতি, প্রতারণাপূর্ণ নির্বাচন এবং পররাষ্ট্রের হাত থেকে নিরাপত্তার জন্য দেশের সকল জাতীয় শক্তি ব্যবহারে চাপ প্রয়োগই এসব

www.pathagar.com

মুসলিম দেশের শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা। এখন দেখতে হবে দেশের এমন রাজনৈতিক পরিবেশ শ্রমিক অবস্থার ওপর কেমন প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

১. উদ্বৃত্ত শ্রমিকের দেশগুলো প্রধানত বেকারত্বের জন্য শ্রমিক অভিবাসনের বিপক্ষে। তাদের এ যুক্তি সত্য হলেও একেবারে যৌক্তিক নয়। কেননা বেকারত্বকে বেগার খাটানো পদ্ধতিতে দূর করা সম্ভব। শ্রমিক ঘাটতির দেশগুলোতে অভিবাসিত শ্রমিকদের নেচারালাইজেশন পদ্ধতি নাগরিকত্ব পাওয়াকে কঠিন করে রেখেছে। অভিবাসিত পিতামাতার শিশু ও নাতি-নাতনী কোন অধিকার ছাড়া "বিদেশী" হিসেবেই থেকে যায়। অভিবাসিত পিতামাতা যেমন সংশ্লিষ্ট সমাজে সেবার কোন সুবিধা পায় না, তেমনি অভিবাসিত পিতামাতার সন্তান সন্ততিরাও উচ্চমূল্য বা বিনামূল্যে কোনভাবেই ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ছাড়া সাধারণ শিক্ষার সুবিধা পায় না। শ্রমিক উদ্বৃত্ত দেশগুলো অভিবাসিত নাগরিকদের নিকট থেকে উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক সুবিধা, যোগ্য ও দক্ষ কাডার ভিত্তিক সহায়তার মতো কোন সুবিধা পায়না। আবার শ্রম উদ্বৃত্ত দেশগুলো স্থায়ীভাবে নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক কিংবা ডাক্তার ও নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানীর ন্যায় কোন সেবা অভিবাসিত শ্রমিকদের নিকট থেকে আশা করে না।

২. শ্রমিক ঘাটতির দেশগুলো অভিবাসিত শ্রমিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রদত্ত সেবা ভোগ করে থাকে। অভিবাসনদানকারী দেশ অভিবাসিত শ্রমিকের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করে তাতে অভিবাসিত শ্রমিকদের মনে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়। এতে সে চাকরির জন্য অবস্থানের সময় নিয়োগকারীর প্রতি ও অভিবাসিত দেশের প্রতি শত্রু হয়ে পড়ে। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাজে খামখেয়ালী প্রদর্শন করতে সে মোটেও তোয়াক্কা করে না। সুযোগ পেলেই অলসতা প্রদর্শন করে কাজে বিলম্ব ঘটায়। অভিবাসিত দেশের বিরুদ্ধে সব সময়ে সে সদা প্রস্তুত অস্ত্র হিসেবে নিয়োজিত থাকে। অন্তর্ঘাতমূলক কাজে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী হিসেবে তাকে সহজে নিজ তালিকাভুক্ত করতে পারে ও সবসময় সহযোগী পায়। বিশেষ করে কোন আগ্রাসনকারীর জন্য সে যোগ্য দোসর হয়। সে আগ্রাসনকারী বিদেশী হলে তো কথাই নেই। বিশেষ করে আরব উপসাগরীয় দেশগুলোতে খৃস্টান মিশনারী ও অভিবাসিত শ্রমিকদের মধ্যেই এরূপ স্পষ্ট আলামত পরিলক্ষিত হয়। এভাবে নিজ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাবোধ অভিবাসিত শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে আনা ছাড়াও দেশের জন্য হয় জঞ্জালস্বরূপ। আর দেশের অস্থির রাজনীতি তাকে করে তোলে রাষ্ট্রের নিশ্চিত শত্রু।

৩. যেহেতু অভিবাসিত কর্মচারীদের বিপুল সংখ্যক একই ভাষাভাষী মুসলিম দেশের মধ্যে চলাচল করে থাকে, সেহেতু মুসলমানদের বিভিন্ন রাজনৈতিক সত্তার মধ্যে মাইগ্রেশন নীতি, উত্তম ক্রসফার্টিলাইজেশন, সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। এসব মুসলিম ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্বের ঝান্ডাতলে অপর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবেলা করতে পারবে।

www.pathagar.com

তবে এর প্রতিক্রিয়াও থাকতে পারে এবং এসব কর্মচারী বিশ্ব ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদের মধ্যে আবার বিচ্ছিন্নতা বোধ ও ছাড়াছাড়ির ধারা সূচিত করবে।

৪. রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবেই সুদান ও লিবিয়ার সাথে মিসরের, মরক্কোর সাথে আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া ও মৌরিতানিয়ার, সিরিয়ার সাথে লেবানন, জর্দান ও পালেস্টাইনের এবং ইরাকের সাথে সিরিয়ার সংযুক্তি সম্ভব হয়নি। শ্রমিক উদ্বৃত্তি ও শ্রমিক ঘাটতি দু'টির মধ্যে ঐক্য সাধনই উৎকৃষ্ট সমাধান। মিসরের সেচযোগ্য ভূ-ভাগ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। তবুও সুদানের সাথে ইউনিয়ন গঠন করলে নীল উপত্যকা ছয়গুণ জনসংখ্যার খাদ্যের সংস্থান করতে পারত। এছাড়া পারত সমস্ত মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করতে। সার্বিকভাবে ধরতে গেলে দেখা যাবে মুসলিম বিশ্বে শ্রমিক ঘাটতি বিরাজমান। সার্বিকভাবে বা আঞ্চলিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে এবং এর অবিশ্বাস্য পরিমাণ সম্পদরাজি পুরোপুরি ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে পারলে দেখা যাবে মুসলিম বিশ্বের সম্পদ ভারত, চীন ও আফ্রিকার মতো দেশের উদ্বৃত্ত শ্রমের পুরোটাই আত্মস্থ করতে পারছে। ইসলাম বিশ্বজনীন, এর মধ্যে কোন কালো ধলোর প্রশ্ন নেই। সুতরাং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ভিনদেশী সভ্যতার মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দু'তিন প্রজন্মেই কোটি কোটি আদম সন্তানের জন্য একটি বিশ্বরাষ্ট্র সৃষ্টি করা যাবে, যেখানে সবাই একই 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনির অধীনে উৎপাদন থেকে শুরু করে জীবনের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

চিরাচরিত সমাজ কাঠামোর ওপর শ্রমিক অভিবাসনের প্রভাব

মুসলিম দেশ থেকে মুসলিম দেশে

মুসলিম দেশগুলোর সমাজ কাঠামো খুবই মজবুত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এবং একটি দেশ থেকে অন্যটির পার্থক্য খুব কম। যেসব শ্রমিক ঘাটতির দেশে মুসলিম শ্রমিক মাইগ্রেট করে সেখানেও মজবুত ও রক্ষণশীল ঐতিহ্যগত সামাজিক কাঠামো রয়েছে। সেজন্যই সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক কালে সম্পদে মুসলিম দেশগুলোর উন্নয়ন সাধিত হয়নি। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে যারা দেশত্যাগ করে অন্য মুসলিম দেশে চাকরির জন্য আসে তারা পরিবার পরিজন নিয়ে আসে না। (আমরা কেবল পুরুষ শ্রমিকের কথা বলছি যারা তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই চাকরির উদ্দেশে আসে) তারা নিজেদেরকে ক্ষণস্থায়ী মনে করে এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ উপার্জনের জন্যই সেখানে যায় আবার দেশে ফিরে আসে। তাদের অর্জিত আয় কখনো কখনো তাদের পরিবার পরিজনের নিকট পাঠানো হয়। "বিদেশী খেদাও আন্দোলনের" প্রতি সতর্কতা এবং সামাজিক বিধিনিষেধের দরুণ বিদেশী শ্রমিকদের সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসের জন্য আবাসস্থল গড়ে তোলার সম্ভাব্যতা তেমন একটা থাকে না। কেউ কেউ আবার স্ত্রী সাথে নিয়ে আসে। যদিও বিদেশের মাটিতে স্ত্রীদের অনেকের সাথে মিলেমিশে থাকার অভ্যাস কমই থাকে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন বিচ্ছিন্নতার দরুণ আন্তঃবিবাহ বা পাণি প্রার্থনার মতো ব্যাপার খুব কমই ঘটে।

www.pathagar.com

আবার কোন কোন অমুসলিম দেশে সে দেশের নাগরিক না হলে বিবাহ হতে পারবে না বলে সংশ্লিষ্ট দেশের সংবিধানে বিধিনিষেধ রয়েছে। সরকারী বিদ্যালয়ে তার সন্তান সন্ততির ভর্তি সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, সমাজ সেবায় অংশ প্রদানে অস্বীকৃতি, সকল জিনিসের দুর্মূল্য ইত্যাদি কারণে বিদেশী শ্রমিকরা তাদের সন্তান সন্ততিকে সাথে করে আনতে চায় না। খুব কমসংখ্যকই বাড়ীঘর নির্মাণে অধিক খরচের কথা ভেবে স্ত্রী পুত্র সাথে নিয়ে আসে। তবে উচ্চ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় বিদেশী শ্রমিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি পূরণে তেমন কোন বিধিনিষেধ থাকে না। অনেক সময় অভিবাসিত শ্রমিক-এর চাইতে সংশ্লিষ্ট দেশ ও তাদের জনগণই ধর্মীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত থাকে বেশি। মাইগ্রেশন আর সংশ্লিষ্ট দেশের রক্ষণশীলতার জন্য অভিবাসিত শ্রমিক ধর্ম কর্মে নিয়োজিত থেকে কিছুটা শান্তি পেতে চেষ্টা করে। সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মতো অবস্থার মধ্যে সে ইতোপূর্বেও তার নিজ দেশে বসবাস করেছিল। চাকুরীর শর্ত আর আর্থিক দিক থেকে সুযোগ এলেই শ্রমিক নিজ দেশে তার স্ত্রী পরিজনের নিকট চলে যায়। সে তার স্ত্রী পরিজনের সাথে দেশে এসে দেখা করাকেই বেশি পছন্দ করে থাকে। কেননা, তার পরিবার পরিজনের পরিবেশ তার কাছে বেশী প্রিয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য শ্রমিক দেশে এসে সবার সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে চায়।

কাঠমিস্ত্রী, ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষজ্ঞ সরকারী কর্মচারী বা ডাক্তারের মতো মানসিক শ্রমের পেশায়ও একই অবস্থা। আয় উপার্জনে পার্থক্য অভিবাসিত কর্মচারীদের মধ্যে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করে না। উপসাগরীয় দেশগুলোতে ভারত, নিকট প্রাচ্য, কোরিয়া, আমেরিকা ও প্রাচ্যের অনেক অমুসলিম দেশের শ্রমিক রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব দেশের শ্রমিকদের নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে দেয়া হয় না এবং সেসব দেশের সামাজিক পরিবেশের সাথেও মিশতে দেয়া হয় না। দরিদ্রতর শ্রমিকরা (ভারতীয় হিন্দু ও খৃষ্টান) মুসলিম প্রতিবেশীদের ন্যায় দৃঢ় সামাজিক কাঠামোও তাদের সাথে নিয়ে আসে। পাশ্চাত্যের মিশনারীরা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ঘরশত্রু বিভীষণ (fifth column) হিসেবে খুব সাবধানে কাজ করে থাকে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশে অন্যান্য অভিবাসিতের ওপর তাদের প্রভাব নগণ্য। তবে নিকট প্রাচ্যের দেশগুলো থেকে আগত শ্রমিকগণ একই ভাষাগত ঐতিহ্যের জন্য সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধা ভোগ করে। তবুও সংশ্লিষ্ট দেশে অভিবাসিত শ্রমিকদের ওপর পারস্পরিক সামাজিক প্রভাব খুব নগণ্যই বলা চলে।

মুসলিম দেশ থেকে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে

মুসলিম দেশের অভিবাসিত শ্রমিকদের সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলিম দেশের যেমন সম্পর্ক দেখা যায় পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সাথে মুসলিম অভিবাসিতদের সাথে তার কোন সাদৃশ্য নেই। আয়ের বৈষম্য, ইসলামের প্রতি আনুগত্য অথবা শ্রমিকের জন্মভূমি বা দেশের সমাজ কাঠামো এই বৈসাদৃশ্যের কারণ নয়। এর একমাত্র কারণ পাশ্চাত্য সমাজের প্রকৃতি।

www.pathagar.com

যে দেশের অভিবাসিত শ্রমিকই হোক না কেন পরিকল্পনা, প্রেষণা, লক্ষ্য ও উদ্দেশের দিক থেকে সকল দেশের শ্রমিকের একটিই উদ্দিষ্ট, নিজকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বেশি উপার্জন। পাশ্চাত্যের কোন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে যাওয়াকে কারো চোখেই ভাল দেখায় না এবং খুব কম মুসলমানই এ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে এসব দেশে বসতি স্থাপন করেছে।

১. কম শিক্ষিত বা প্রশিক্ষণহীন মুসলিম শ্রমিক

মুসলিম শ্রমিকদের তিনটি কারণে অল্প প্রশিক্ষণ বা প্রশিক্ষণহীন অবস্থায় ইউরোপীয় দেশগুলোতে পাড়ি জমাতে দেখা যায়। ১. উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে ফ্রান্সের উপনিবেশবাদ। এ উপনিবেশবাদের দরুণই উপনিবেশগুলোর সাথে ফ্রান্সের স্থায়ী সহযোগিতার আশায় এক দেশ থেকে আরেক দেশে শ্রমিকরা পাড়ি জমায়। শ্রমিকরা তাদের কর্মে নিয়োগ ও বর্ধিত আয়ের আশায় প্রলুব্ধ হয়েছিল। ২. ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো বিশ্বযুদ্ধের পর এসব দেশে যে শ্রমিক আগমন ঘটছিল, সেই অভিবাসিত শ্রমিকদের উৎসাহিতও করতে পারেনি আবার তাদের অভিবাসনকে বন্ধও করতে পারেনি। ৩. ১৯৫০ এর দশকে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির দরুণ কোন কোন পেশায় তাদের দেশীয় শ্রমিকদের যোগান নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় বহির্দেশীয় শ্রমিকদের আগমন ঘটছিল। ক্ষয়িষ্ণু জনসংখ্যা ও প্রশিক্ষণের অভাবে কায়িক শ্রমের মান নিম্নপর্যায়ে নেমে এসেছিল। ন্যাটোতে (NATO) অন্তর্ভুক্তির ফলে তুরস্কের শ্রমিকদের অভিবাসনের দ্বার খুলে গিয়েছিল। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে মিসরের পরাজয় এবং ফলস্বরূপ দেওলিয়া হয়ে পড়ার দরুণ সে দেশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিক দেশ থেকে বিদেশে পাড়ি জমাতে লাগলো । আর পাশ্চাত্যের শ্রমিক ঘাটতির দেশগুলো তাদেরকে আনন্দের সাথে লুফে নিল।

ক. প্রথম অভিজ্ঞতা থেকেই বিদেশী মুসলিম শ্রমিকদের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশগুলো সম্পর্কে হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঝলকানিতে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে এসব ঝলকানি তাদের আত্মসম্মান ও সামাজিক প্রশান্তির ভিত্তিতে কঠিনভাবে নাড়া দিত, যেগুলো তারা কখনো ভুলতে পারতো না।

খ. কোন অভিবাসিত শ্রমিক পাশ্চাত্যে বসবাসরত স্বজাতির কোন সমাজে থাকলে সাময়িকভাবে হলেও পাশ্চাত্য আগ্রাসন থেকে বাঁচতে পারবে। যদি সে একা তার সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে থাকে, তাহলে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপযুক্ততা অর্থাৎ তার ব্যবহারের প্রতি পাশ্চাত্যবাসীর উদাসীনতা, পাশ্চাত্য নারীর অবাধ মেলামেশার অনুমোদন এবং পাশ্চাত্যের আমোদ প্রমোদের আকর্ষণীয় মাধ্যম তাকে নিশ্চয়ই গ্রাস করে ফেলবে। যে সব শ্রমিক তাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছে ও তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, তাদের আর কোনদিন সে অবস্থা থেকে ফিরে আসা সম্ভব হয়নি।

গ. শ্রমিকদের নিজ দেশের পরিবার পরিজনের প্রতি যে আকর্ষণ থাকে তা বিদেশে

www.pathagar.com

গেলেও অপরিবর্তিত থেকে যায়। আয়ের একটা বিরাট অংশই সঞ্চয় করে পরিবার পরিজনদের জন্য দেশে পাঠিয়ে দেয়।

ঘ. কোন অভিবাসিত শ্রমিক তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে এলে পাশ্চাত্য শহরের রুক্ষ আবেশ থেকে কিছুটা রক্ষা পেতে পারে। এক্ষেত্রে সে দম্পতি স্বদেশী অন্য দম্পতির খোঁজ নিয়ে তাদের জন্য একটি ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে নেয়।

ঙ. যখন কোন অভিবাসিত শ্রমিক একা একা এসব দেশে আসে তখন সে ঐ দেশের সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে মেলামেশা করতে বাধ্য হয়। ফলে, পাশ্চাত্য দেশীয় পারিবারিক জীবনের সাথে সংশ্রবের দরুণ বিবাহ শাদী ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানের সংগে সে পরিচিত হতে থাকে।

চ. নতুন সম্পর্ক সৃষ্টির পরও আপন দেশের সাথে শ্রমিক, জাতিগত ও পারিবারিক বন্ধন পূর্বের ন্যায় ঠিকই বজায় রাখে এবং উপার্জিত অর্থও পূর্বের মতো দেশে পাঠাতে থাকে। কিন্তু সন্দেহ নেই, নতুন সম্পর্ক ধীরে ধীরে পুরনো সম্পর্ককে ক্ষয় ও দুর্বল করতে থাকে।

ছ. অনেকদিন থেকে সংশ্লিষ্ট দেশে বাস করার ফলে এবং নতুন সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে বন্ধু বান্ধব ও সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি পাওয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব অন্যান্য মুসলিম অভিবাসিতদের ওপরও পড়তে থাকে। এভাবে ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন জীবন নির্বাহে তার মধ্যে আস্থা ও মর্যাদা বোধের সৃষ্টি হতে থাকে। যদি কোন পাশ্চাত্য দেশীয় মহিলা ভিনদেশী কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে সে মহিলাই পছন্দমত একটি ভিন পরিবেশের ব্যবস্থা করে নেবে ও প্রয়োজনীয় খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত ভিন্ন সাংস্কৃতিক সমস্যারও সমাধান করবে। অন্য কোন দেশের শ্রমিক যদি কোন পাশ্চাত্য মহিলাকে বিবাহ করে বাড়ী ফেরে, তাহলে নিজকে সম্প্রসারিত পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবে।

জ. সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের এ সফল প্রক্রিয়াই নতুন সম্পর্কের মেয়াদ ও গভীরতা নির্ধারণ করবে। যদি কোন শ্রমিক নতুন পরিবেশে নিজকে খাপ খাওয়াতে না পারে, দীর্ঘদিন বসবাসের পরে সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি বা বিয়ে করার পরও যদি সে নতুন পরিবেশে নিজকে আপন ভাবতে না পারে, তাহলে তার নব্য সংস্কৃতিবোধ নিশ্চয় আজ হোক কাল হোক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, এ জাতীয় প্রতিক্রিয়ার পর ঐতিহ্যগত সামাজিক কাঠামোতে ভাঙ্গন ধরায় মানুষ আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে নিজকে ঠেলে দিয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ঘৃণার ফলে শ্রমিকদের সামাজিক, নীতিগত, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববোধের মাধ্যমে মানুষের বিবেক বুদ্ধির পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাতন্ত্র্য বোধের এ সমস্যার উন্মেষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে।

www.pathagar.com

ঝ. যখন স্বাতন্ত্র্যবোধের সমস্যা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আদৌ সমর্থন করে না, তখন তা বিপন্ন স্বাতন্ত্র্যের পুনর্জাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যায়। এ ধরনের চেতনা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকলে পরিবার, নিজ বাড়ী, নিজের দেশের প্রতি তার দুর্বলতা এবং একাকিত্ব বেড়ে যায়। সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতি থেকে সে তখন নিজেকে মুক্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে। আবার অনেক সময় সে পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র বিরোধী হয়ে ওঠে এবং নিজস্ব কৃষ্টি ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট দেশে বিস্তারের চেষ্টা করে অথবা অবিলম্বে দেশে ফিরে আসে।

ঞ. গত দু'দশক ধরে ইউরোপীয় দেশগুলোতে প্রচুর মসজিদ, সমাজকেন্দ্র ইসলামী কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসবের উপস্থিতির একমাত্র কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি মানুষের ঘৃণাবোধ ও চেতনার উন্মেষ। ফলে বিকৃত সভ্যতায় ভেসে যাওয়া মানুষ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা যাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধের বেদীমূলে আঘাত হেনেছে এমন শিক্ষিত শ্রমিকদের দ্বারা যদি একাজ শুরু করা যেত তাহলে চমৎকার ফল পাওয়া যেত। এ চেতনাবোধের ফল হত এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলামী চেতনার উন্মেষ হওয়াতে সেখানে সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম ও আদর্শবোধের সৃষ্টি হত।

২. উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুসলিম শ্রমিক

নেপোলিয়নের মিসর অভিযানের পর তার নিজের লোকজনের সুপারিশে মিসরীয়দের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ফ্রান্সে পাঠানো হয়েছিল। সমগ্র নিকট প্রাচ্যে যীশুর ধর্মাবলম্বীরা ফ্রান্সিকান্স, ডোমিনিকান্স, ফ্রেন্ডস, প্রোটেস্ট্যান্ট ও ধর্মপ্রচারক দলসমূহ বিভিন্ন স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিল। এদের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্ব সহজেই মুসলমানদের সংস্পর্শে এসেছিল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুসলিম যুবকদের মনে পাশ্চাত্য আদর্শের ধারণা সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের মনে এ আশা জাগিয়ে ছিল যে, নিজ দেশের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্যের স্বনামধন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। মুসলিম বিশ্বের জাগরণের ফলে মুসলিম ছাত্ররা পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রশিক্ষণ লাভে অনুপ্রাণিত হচ্ছিল। আর তাদের বাপ-মা-অভিভাবকরাও সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের সন্তান সন্ততিদের সাহায্য করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেন ফ্রান্সের শিক্ষার্থী প্রবেশের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে বসে। এরপর থেকে বৃটেন ভারতের মতো তার নিজস্ব কলোনী হতে মুসলিম ছাত্র পেতে থাকে। দু'টো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সম্প্রসারিত বৃটিশ কলোনীতে ম্যান্ডেটভুক্ত অঞ্চল থেকে মুসলিম ছাত্রের বৃটেনে প্রবেশ মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গিয়েছিল। সে সময় খুব কমসংখ্যক মুসলিম ছাত্রই অধ্যয়নের জন্য আমেরিকা ও কানাডায় গিয়েছে। অধিকাংশই ইউরোপে থেকে অধ্যয়ন করছিল। এতে মুসলিম দেশগুলো নিয়ন্ত্রণভুক্ত ঔপনিবেশিক সরকারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাড়তি সুবিধা পেত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বন্যার জোয়ারের মতো সব পাশ্চাত্যের দরজা খুলে গেল। নবসৃষ্ট ক্ষুদ্র মুসলিম দেশসমূহ বিপুল সংখ্যায় তাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ট ছাত্রদেরকে পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাতে লাগল। এসময়ে একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই আড়াই লক্ষ ছাত্র অধ্যয়নের জন্য পাড়ি জমায়। মুসলিম ও পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রীপ্রাপ্ত অসংখ্য মুসলিম যুবক চাকরি ও বসবাসের জন্য পাশ্চাত্যের দেশগুলোয় যেতে থাকে। পঞ্চাশ ও ষাট দশকের পূর্বে উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুসলিম যুবকেরা তেমন বেশি বিদেশে যেত না। এর পূর্বে মুসলিম দেশগুলো তাদের উচ্চ শিক্ষিত গ্রাজুয়েটদের নিজের দেশে কাজে লাগাতে পারত। এসব দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের হাওয়া বইছিল। নিজস্ব সরকার ও প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে তারা মরণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দেশ গড়ার কাজে পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষিত গ্রাজুয়েটদের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার সাথে সাথে তারা দেশের ডাকে মাতৃভূমিতে ফিরে এল। বিংশ শতাব্দীর স্বাধীন দেশগুলো সরকারী কাডার শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রয়োজন অনুভব করছিল। এসব দেশ উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীদের আত্মীকরণ করতে গিয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাদের পক্ষে আর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হচ্ছিল না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো (যেমন মিসর) কোন কাজের ব্যবস্থা করতে না পারলেও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েটদের সরকারী কর্মচারী তালিকার অন্তর্ভুক্ত করছিল। রাজনৈতিক কারণে আমলাতান্ত্রিক সরকারগুলো তাদেরকে আত্মীকৃত করে নিচ্ছিল। কিন্তু এর পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজন না থাকলেও হু-হু করে আমলাতন্ত্র বিকাশপ্রাপ্ত হচ্ছিল। এমনকি এ দু'দশকে শাসকদের অযোগ্যতা (১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ, ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের সাথে যুদ্ধ, সিরিয়া এবং ইরাকে বার-ংবার সামরিক অভ্যুত্থান) এবং সেই সংগে সমাজতন্ত্রের দেউলিয়াপনা, পাশ্চাত্যকরণ, তথাকথিত 'উন্নয়ন' কৌশল এবং সামাজিক সংগঠন হিসেবে জাতীয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

এভাবে নীতিভ্রষ্ট হয়ে আবদুন নাসের প্রথমবারের মতো যারা দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে চায় তাদের জন্য মিসরের দ্বার খুলে দিলেন। শত শত উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক দেশ ছেড়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে ভাগ্যান্বেষণে চলে গেল। ইরানও মিসরের মত একই পথ অনুসরণ করার দরুণ তাদের উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক পশ্চিমা দেশগুলোতে পাড়ি জমাল। হিসেব করলে দেখা যাবে যে, দু'তিন মিলিয়ন উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুসলিম শ্রমিক এসব পশ্চিমা দেশগুলোতে কাজ করছে। এখন আমাদের দেখতে হবে এভাবে দেশ ছেড়ে বিদেশে অভিবাসনের ফলে ঐতিহ্যগত সামাজিক কাঠামোগুলোতে কেমন প্রভাব পড়ে ?

ক. যেসব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে তাদেরকেও উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিবাসিত শ্রমিকদের সাথে হিসেব করা যেতে পারে। ১. কেননা যারা একবার ছাত্র হিসেবে এসব দেশে পাড়ি জমিয়েছিল, তাদেরকে উচ্চশিক্ষিত সুপ্ত

www.pathagar.com

অভিবাসিত শ্রমিক হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। ২. ক্ষণস্থায়ী ছাত্র ও অভিবাসিতের মধ্যে তেমন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

খ. পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক যেমন ধারণা পোষণ করে, যারা উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক নয় তারাও তেমনি ধারণা পোষণ করে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে উভয়ের কাছেই সমানভাবে বিষয়টি চোখ ধাঁধানো মনে হয়।

গ. প্রশিক্ষণে অশিক্ষিতদের তুলনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে দ্রুত সংস্কৃতিবোধের ধারণা জন্ম নেয়। তার শিক্ষার মান যেমন তাকে এগুলোর প্রতি উৎসাহিত করে তুলতে সমর্থ হয়, তেমনি তার জন্য এগুলো বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা বলেও মনে হয়।

ঘ. পশ্চিমা সমাজ বিভিন্ন উপায়ে ঐসব প্রশিক্ষিত মুসলিম অভিবাসিতদের প্রলুব্ধ করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারদের আবাসন এলাকা এবং দেশের ক্লাবের মতো স্থানগুলো দেশের এসেম্বলিং লাইন বা কনস্ট্রাকশন শিল্প এলাকাগুলোর চাইতেও অধিক যৌন আবেদনের ধ্বংসাত্মক নরকস্থান। উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিবাসিত দেশের মধ্যেই এ যৌন আচরণ বেশি পরিমাণ অনুপ্রবেশ করতে পারে, কেননা পশ্চিমা দেশগুলোর মুসলিম ছাত্ররা সাধারণত অবিবাহিত হিসেবেই গমন করে।

ঙ. একই পেশাগত সঙ্গীর রোমান্স, বিয়ে ও সামাজিক সংমিশ্রণের পশ্চিমা ভাবধারা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের মাধ্যমে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাইতে উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের স্বাতন্ত্র্যবোধের সমস্যা দ্রুত সৃষ্টি হতে থাকে।

চ. সৌভাগ্য যে, ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি রক্ষণশীলতা, সুদূর অতীত ও বর্তমানের ভাবধারায় আমূল পরিবর্তন ও ইসলামী চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় অনেক উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিবাসিত শ্রমিক এবং ছাত্র তাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিল। পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলামী স্বাতন্ত্র্যবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুসলিম ছাত্রদের আন্দোলন নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় সফলতা অর্জন করেছে।

ছ. এ জাতীয় আন্দোলনে কিছুটা যে হাংগামা হবে না তা নয়। তবে পশ্চিমা দেশগুলোকে শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য সমস্যার মোকাবিলা করতে যে বিপুল সংখ্যক ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক যোগ দিচ্ছে এটা তার তুলনায় তুচ্ছ বৈ নয়। মুসলিম বিশ্বের সব স্থানেই আজ গ্রাজুয়েটদের মধ্যে এ সমস্যা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জ. স্বজাতি ও পরিবারের প্রতি আনুগত্য যেখানে রয়েছে সেখানে এ জাতীয় ভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে না। উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করে, তেমনি অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকও সে ব্যাপারে সচেতন। প্রত্যেকেই তাদের উপার্জিত অর্থ বাড়ীতে পাঠায়। মাঝে

www.pathagar.com

মধ্যে আত্মীয় স্বজনদের দেখতে বাড়ী আসে ও দেশের রাজনৈতিক উত্থান পতনে তার দেশের জনগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করে। কখনো কখনো সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য হলেও তার দেশের জনগণ তথা উম্মাহ্‌র পাশে সে সব সময়ই উপস্থিত থাকে।

ঝ. অনেক সময় পাশ্চাত্য দেশীয় মহিলাদের বিয়ে, নাগরিকত্ব লাভ এবং পশ্চিমা বিশ্বের স্থায়ী নাগরিকদের সাথে ওয়াদা করতে গিয়ে দেখা যায় ঐতিহ্যগত সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন। তবু সন্দেহ করার কোন কারণ নেই যে, উচ্চ প্রশিক্ষিত কর্মচারী কখনো বাড়ী ফেরার ইচ্ছে ত্যাগ করতে পেরেছে। কর্মচারী বা শ্রমিকেরা সবসময় তাদের উপার্জিত অর্থ নিজ দেশে পাঠাতে চেষ্টা করে।

ঞ. ছাত্র বা উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক যারা পশ্চিমা দেশগুলোতে স্ত্রী পরিজনসহ বাস করে অথবা যদি পশ্চিমা কোন মহিলাকে বিয়ে করে, তাহলে সে যে সমাজ কাঠামো থেকে এসেছে সেটাই সে সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। পরিকল্পনা সবক্ষেত্রে না হলেও অন্ততঃ তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কার্যকরী হয়। সমস্যা হল সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে তার যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাকে নিয়ে। কেননা তার জন্য এটা একটা অজানা সমস্যা। তবে আমাদের যা অভিজ্ঞতা তা থেকে নিশ্চিত হতে পারি যে, ঐ সব ছেলেমেয়েরা পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গড়ে উঠবে। পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম বংশধরদের জন্য একটা হুমকির কারণ হয়ে থাকবে যে পর্যন্ত না মুসলিম শ্রমিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কম্যুনিটি সেন্টারের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা ও নতুন বংশধরদের জন্য ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত সমাজ কাঠামো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ আলোচনার প্রথমাংশে ("কাজের আদর্শ") কুরআন, হাদীস, ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস ও মুসলিম মনীষীদের আলোচনা থেকে যথাসম্ভব প্রমাণাদিসহ পেশ করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য অংশে তা করা সম্ভব হয়নি। তবে লেখক নতুন বিষয়ই উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। লেখকের জানামতে মুসলিম অভিবাসিত শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মুসলিম বিশ্ব বা পশ্চিমা বিশ্বে কোন জরীপ বা গবেষণা হয়েছে কিনা সন্দেহ। প্রফেসর ইসমাইল আর আল-ফারুকী মুসলিম অভিবাসিতদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিষয়ে ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘের "এসোসিয়েশন অব মুসলিম সোস্যাল সায়েন্টিস্টস"-এর সহযোগিতায় একটি জরিপ কাজ পরিচালনা করেন।

---

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা

মুহাম্মদ আহমদ সাকর*

ইসলামে রাষ্ট্রকে এমন একটি মৌলিক ও প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা সুশৃংখল সামাজিক জীবন সংগঠন, বৈধ লক্ষ্যসমূহের সার্থক রূপায়ন, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন এবং বিশ্বাস ও আদর্শের সংরক্ষণ ও বিস্তারের জন্য অপরিহার্য। রাষ্ট্র সম্পর্কিত ইসলামী ধ্যান-ধারণা পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী ধারণা হতে মৌলিকভাবে আলাদা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, প্রথম দিকে রাষ্ট্রকে অর্থনীতি হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধারণা করা হত। কিন্তু এ ব্যবস্থায় চরম অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়ার পর রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে বড় অর্থনৈতিক মন্দার পর অর্থনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। তারপরও রাষ্ট্র পুঁজিবাদী সমাজ এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাদের আর্থ-সামাজিক ভিত মজবুত করার হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়। তার মূলে রয়েছে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার অপরিবর্তনীয় দর্শন ও সম্পদ কুক্ষিগত করার মাত্রাতিরিক্ত লিপ্সা। সেই সাথে সামাজিক মূল্যবোধ ও আচরণের রীতিনীতি বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে গৃহীত হওয়া। ফলে, গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের উৎপাদন বৃহৎ সংস্থাসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আর সংস্থাসমূহ বাজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছোট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ সকল ছোট প্রতিষ্ঠান দিনের পর দিন ছোট থেকে আরও ছোট হচ্ছে।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মূল যন্ত্র রাষ্ট্র পুঁজিবাদী একচেটিয়াদের নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করে। এভাবে উৎপাদন ও বিভিন্ন আয়ের উৎস এমনভাবে বণ্টিত হয় যাতে গুটিকয়েক সম্পদশালী ব্যক্তির হাতে সমস্ত ধন সম্পদ পুঞ্জীভূত হয় এবং অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল জনগোষ্ঠী দারিদ্র ও দুঃখকষ্টের কবলে পতিত হয়। এভাবে যতই দিন যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ততই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সম্পদের পাহাড় গড়ে দেয়। অন্যদিকে তাদের নিজেদের আয় আনুপাতিক হারে কমতে থাকে। আর স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র একচেটিয়াদের স্বাধীনতার হাতিয়ার মাত্র। এর মাধ্যমে পুঁজিপতিরা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ঢেলে সাজায়।

রাষ্ট্র সম্পর্কিত সমাজতান্ত্রিক ধারণা হতেও ইসলামী ধারণা স্বতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ হতে রাষ্ট্র হলো বুর্জুয়াদের শাসন শোষণ অক্ষুণ্ন রাখার একটা সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠান। সমাজতন্ত্রীদের মতে, সমাজে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এবং প্রতিটি ব্যক্তি

---

*ড. মুহাম্মদ আহমদ সাকর–ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনোমিকস্ এন্ড স্টাটিসটিকস্, জর্দান ইউনির্ভাসিটি, জর্দান। রিসার্চ প্রফেসর, কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা, সৌদি আরব

www.pathagar.com

তার প্রয়োজনের তুলনায় ভোগ এবং সামর্থানুযায়ী উৎপাদন করলে সমাজ হতে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটির আপনা হতেই বিলুপ্তি ঘটবে।

মুসলিম সমাজের বিভিন্ন কার্য পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'রাষ্ট্রের' ধারণা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। বস্তুতঃ ইসলামী আইনে (ফিক্‌হ) রাষ্ট্রের মত কোন একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পর্যাপ্ত বাস্তব বিশ্লেষণমূলক ব্যবস্থা রয়েছে, যার অভাবে চতুর্দিকে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বার্থ বিনষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দেয়। কখনো যদি রাষ্ট্র তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয় এবং এর ফলে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দেয়, তখন মতভেদ ও হাঙ্গামা পরিহার করে একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দেয়া উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ হলো সমাজের জন্য স্থিতিশীল অগ্রগতি অর্জন করা[১]। ইসলামী ধারণায় স্থিতিশীল শব্দের অর্থ হল, রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত নীতি ও পদ্ধতি এমনভাবে পরিচালিত হবে যাতে পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক যে কোন অগ্রগতি, পরিপূর্ণ অবস্থায় অর্জিত হতে পারে। এর অর্থ, রাষ্ট্র এমন সামাজিক সঙ্গতিসম্পন্ন হবে, যেখানে এক দিকে ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে সমাজের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনের বেলায় রাষ্ট্র অত্যন্ত সতর্কতা, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির সাথে কাজ করবে। ইসলামী রাষ্ট্র মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যমকে স্বাধীন সমাজের মত যথাযথভাবে উৎসাহিত করবে। এক্ষেত্রে জনকল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। তাদের মাঝে একটি হচ্ছে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আলোচনা বা শূরা নীতি গ্রহণ করবে। এরূপ আলোচনা ইসলামী সমাজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষকে তা নিজ কর্তব্য পালন ও সমাজ উন্নয়নের স্বার্থে রাষ্ট্রকে সহযোগিতা দানের জন্য রাষ্ট্রের তরফ থেকে আহবান স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে অন্য কোন সমাজে সম্পদ, মেধা, প্রতিদান অথবা সুযোগ কোনটাই বিশেষ কোন পদ্ধতি অনুযায়ী বন্টন করা হয় না। বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে এ পার্থক্য অবশ্যই সমাজে উৎসাহ সৃষ্টি, সৃজনশীলতা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আনয়নে গঠনমূলক ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এ পার্থক্য যদি তার সঙ্গত সীমা অতিক্রমে সমর্থ হয়, তাহলে সমাজে যেসব শ্রেণীর কোন শক্ত ভূমিকা নেই অথবা যে সকল শ্রেণী তাদের নিজেদের ক্ষমতায় কেবলমাত্র অর্ধপথ অতিক্রম করেছে, তাদের অগ্রযাত্রার বাধা প্রতিহত করার জন্য এ শক্তি বিশেষভাবে কাজে লাগবে[২]।

এ ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র ঐ সকল শ্রেণীকে সহায়তা প্রদান ও তাদের যথাযথ পাওনা নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়। অধিকন্তু, প্রতিযোগী ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নীতি সব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিল্প উৎপাদন এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিশেষজ্ঞ সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে না। ইসলাম রাষ্ট্রকে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়না। বরং সমাজের চাহিদা মোতাবেক শিল্প উৎপাদন ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আইনের গন্ডির মধ্যে থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজস্ব নীতিসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা দান করে।

www.pathagar.com

সূচনা মুহূর্ত হতে ইসলাম মানব সমাজের যাবতীয় কার্যাবলীকে আঞ্চলিক ও সার্বজনীন -এ দু'ভাবে দেখে আসছে। মানব জীবন ও এর উন্নতি সাধনে রত ইসলামের আদর্শ আঞ্চলিকতা এবং সার্বজনিনতায় আরো নমনীয় ভূমিকা পালন করে। এরূপ একটি ধর্মই কেবল মানুষের জন্য উপযোগী জীবন বিধান রচনা ও জীবনের প্রতিটি স্তরকে এর আদর্শে গড়ে তুলতে সক্ষম। তাই ইসলাম মানব সমাজের যেমনি প্রাথমিক অথবা অনগ্রসর অবস্থায়, ঠিক তেমনি সমাজের অত্যাধুনিক ও জটিলতর পর্যায়ের জন্য সমভাবেই উপযোগী। এর ব্যাপকতা, সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চাহিদা ও জটিলতর বাহ্যিক দিকের সাথে সঙ্গতি রক্ষায় যথার্থ। এর অর্থ এ নয় যে, পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতির সাথে তাল মিলানোর জন্য আদর্শের পরিবর্তন ঘটবে। এখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সে সম্পর্কে ইসলামের মৌল নীতিকে বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষমতা মোটামুটি দু'টি সম্ভাব্য খাতের ওপর নির্ভর করে।

১. পরিবর্তিত অবস্থায় জনসাধারণের কল্যাণ নিশ্চিত করণ ;

২. কল্যাণের ধারণা, এর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি উভয়ই ইসলামী আইনে বিধিসিদ্ধ।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক অবস্থায় এর চাহিদা ছিল সীমাবদ্ধ। স্বাভাবিক ভাবেই তখন রাষ্ট্রের নীতি কেবলমাত্র ঐ সকল চাহিদা পূরণের ওপর স্থির ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমাজের চাহিদা বহু গুণ বেড়েছে। ফলে ইসলামী সমাজের ওপর ইসলামী আইনের গন্ডির মধ্যে থেকে পরিবর্তিত অবস্থায় উদ্ভুত সমস্যা মোকাবিলা করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমিকা যতই ব্যাপক ও প্রসারিত হোক না কেন, এর উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি মালিকানাকে সংরক্ষণ ও উৎসাহ দান, খাজনা আদায়ের ধারা সংরক্ষণ ও ভোক্তাদের প্রয়োজনানুপাতে আয় ও উৎপাদিত সামগ্রী বন্টনের ক্ষেত্রে মূল্যের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্ধিত করা এবং সমাজের চাহিদা মোতাবেক সার্থক অর্থনৈতিক বিনিয়োগ।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা হল চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী একটি সার্থক নীতি। লোক প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার প্রমাণ হল উৎপাদন ও ভোগের ভারসাম্য রক্ষা এবং এমন আয় বন্টন ব্যবস্থার প্রচলন, যেখানে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত হয়। এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে সকলেই এ অগ্রগতির সুফল সমানভাবে ভোগ করতে পারে। অর্থনৈতিক জীবন বিঘ্নিত হলে সমাজ ভারসাম্য হারাবে, সমাজের কতকগুলি শ্রেণীর স্বার্থ বিনষ্ট হবে এবং সমস্ত সুবিধা ও আয় একটি ক্ষুদ্র দলের লোকদের হাতে জমা হবে।

ইসলাম কখনোই চায়না যে, এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজের সমগ্র সম্পদ সরাসরি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকুক। কারণ, পূর্ণ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল মানুষের সামগ্রিক স্বাধীনতায় বাধা দান। ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ভারসাম্য অর্জন, ব্যক্তি স্বাধীনতায় সামঞ্জস্য বিধান এবং জনসাধারণের সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষণ। ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

১. অর্থনৈতিক সম্পদের সুষ্ঠু বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দায়িত্বসমূহের মধ্যে রয়েছে উৎপাদন উপকরণের প্রয়োজনীয়তা মেটানো, যাতে অর্থনৈতিক উৎপাদনের উদ্বৃত্ত বাড়ানো যায়। এক্ষেত্রে জনসম্পদ ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের পূর্ণ ব্যবহারই হল এর প্রধান দায়িত্ব। এজন্য আইন পাশের মাধ্যমে নিরাপদ আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মৌলিক সামাজিক অবকাঠামো (যেমন সড়ক, বন্দর, বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ ও অন্যান্য সেবামূলক বিষয়সমূহ)[৩] উন্নয়নের ফলে ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থাসমূহে শিল্প, কৃষি ও নির্মাণ খাতের ন্যায় নতুন নতুন উৎপাদন খাত সৃষ্টি হলে প্রচুর বৈদেশিক পুঁজির মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাদি বন্ধ হয়ে যায়। কেবলমাত্র রাজধানী শহর ও কিছুসংখ্যক বড় শহরে ভারী শিল্প সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। গ্রামাঞ্চলসহ অন্যান্য ছোট শহরে পুঁজি বিনিয়োগ এবং দেশের সমগ্র এলাকা ও মুসলিম ভূখন্ডের সমস্ত মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক সুবিধা বন্টন নিশ্চিত করা দরকার। তাছাড়া অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যেমন সুদমুক্ত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সংস্থা ও সমবায় প্রতিষ্ঠা[৪] করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রবৃদ্ধি হারের লক্ষ্যমাত্রা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ হওয়া উচিত। তবে এ উৎসাহব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি সম্ভাব্য উচ্চতম উৎপাদন হারের চেয়ে কম হলেও তাকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করতে হবে। সমাজের কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিবেচনাসমূহ মনে রাখা দরকার।

ক. উৎপাদনের কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক সম্পদ ভোগের ক্ষেত্র নিরুৎসাহিত করা উচিত। এর জন্য উৎপাদন ও ভোগের যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনে উৎপাদন যন্ত্র ও দীর্ঘস্থায়ী সামগ্রী যাতে দ্রুত শেষ না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করা দরকার। এরকম ব্যবস্থা সমাজের শক্তি ও সম্পদ দ্রুত নিঃশেষের মাধ্যমে ভবিষ্যত বংশধরদের বঞ্চিত করে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, 'তুমি তোমার হাতকে গ্রীবার সাথে আবদ্ধ করে রেখনা (কৃপণের মত) এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও কর না ; তা হলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।

খ. উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় পণ্য সামগ্রী ও জনসেবার কাঠামো (যেমন, গৃহ নির্মাণ অথবা প্রয়োজনীয় পোষাক তৈরী) বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত করা দরকার। অনুরূপভাবে, বেসরকারী খাতেও দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিলাস-দ্রব্য উৎপাদন বর্জন করা দরকার।

গ. কারিগরী উৎপাদন পদ্ধতির (বিশেষ করে জনশক্তির ক্ষেত্রে) সাথে এমনভাবে সঙ্গতি স্থাপনের প্রয়োজন যেন উন্নত কারিগরী জ্ঞানের সুযোগ নতুন কর্ম-সংস্থানে সহায়ক হয়। কারণ, ইসলাম বেকারত্বকে সামাজিক দুর্নীতি হিসাবে চিহ্নিত করে ও তীব্রভাবে এর বিরুদ্ধাচরণ করে।

www.pathagar.com

২. সরকারী ব্যয় ও জনস্বার্থ

উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায় এই যে, অর্থনৈতিক সম্পদের এক বিরাট অংশ দেশের গুটিকয়েক সরকারী কর্মকর্তার স্বার্থে ব্যয়িত হয়। সরকারী কর্মকর্তারা মনে করেন যে, সরকারী তহবিল কারো সম্পত্তি নয়। তাই এ অর্থ ব্যবহারে কোন বাধা নিষেধ নেই। আসলে এ অর্থ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এবং সবচেয়ে উপযোগী খাতে ব্যয় করা দরকার।

জনস্বার্থ রক্ষার খাতিরে দেশে এমন একটি নির্বাচিত প্রশাসন দরকার, যা হবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, বিচক্ষণ ও কর্তব্যপরায়ণ, আল্লাহর ভয়ে ভীত, দক্ষ ও সক্ষম।[৫]

৩. মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশে একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বাজারে হস্তক্ষেপ

ইসলামী রাষ্ট্রের উন্নয়ন পদ্ধতি পুঁজিবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হতে সম্পূর্ণ আলাদা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো সম্পদের একত্রীকরণ ও একচেটিয়াত্বের প্রাধান্য। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করে। পক্ষান্তরে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ব্যক্তি মালিকানা, গঠনমূলক প্রতিযোগিতা, উন্নত উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদিত সামগ্রী, যা কম খরচে উৎপাদিত হয় এবং ন্যায্য মূল্যে বিক্রি হয়–এমন সুযোগ রয়েছে। এ কারণেই বর্তমান ইসলামী সমাজকে ঔপনিবেশিক শোষণের প্রধান হাতিয়ার একচেটিয়া পুঁজির প্রভাবমুক্ত রাখা একান্ত অপরিহার্য। ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে বাজারের মূল্য প্রক্রিয়া (চাহিদা ও সরবরাহের ওঠানামা) বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী, সেবা ও উৎপাদনের উপাদান সরবরাহ করে থাকে। তাই কোনক্রমেই মূল্য প্রক্রিয়ার ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়, যাতে বাজারে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়। তবু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় মূল্য নির্ধারণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা দরকার। কারণ, সে সময় অসাধু ব্যবসায়ীরা সরবরাহ কমানো-বাড়ানোর মাধ্যমে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক মুনাফা লাভ করতে চায়। তেমনিভাবে মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির (যেমন- খাদ্যশস্য, কাপড়, গাড়ী ভাড়া, বিদ্যুৎ, ওষুধ বা বাড়ী ভাড়া) মূল্য নির্ধারণে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বিশ্লেষণের দিকে নযর দেয়া উচিত।[৬]

৪. বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ এবং দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার মান নির্ণয় ও বিশেষীকরণ

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিক্রেতা ও উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী ক্রেতাদের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলার অধিকার আছে। তবে এক্ষেত্রে ইসলামী বিধান এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নির্দেশিত বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন-কলার বিধি-নিষেধ মানতে হবে। অতিশয়োক্তি ও পণ্যকে আকর্ষণীয় করার নামে পণ্যের ওপর ভূয়া গুণাবলী আরোপ করা কখনই ইসলামী রীতিসম্মত নয়। তাছাড়া বাণিজ্যিক সুবিধা

www.pathagar.com

লাভের জন্য অশ্লীলতা বা মানুষে মানুষে সৃষ্ট বৈষম্যবোধকে ব্যবহার করাও ক্ষতিকর। এতে সমাজে উৎপাদনের তুলনায় ভোগের মাত্রা বেড়ে যায়। ইসলামী রাষ্ট্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হল স্বাস্থ্য রক্ষায় উপযোগী পণ্য উৎপাদন ও সঠিক ওজন নিশ্চিত করার স্বার্থে উৎপাদনের মান নির্ণয় ও বিশেষীকরণ করা। ইসলামে এ ব্যবস্থাকে হিসবা বলা হয়। এরূপ সুনির্দিষ্ট ও অদ্বিতীয় ব্যবস্থা বর্তমান সমাজেও বিরল। তাছাড়া অন্য সমাজের কোথাও এরূপ উন্নত ব্যবস্থা নেই।[৭]

৫. ন্যায্য শ্রমনীতি ও শ্রম আইনের বাস্তবায়ন

ইসলামী সমাজে উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদনের মান, যোগান ও চাহিদা পরিস্থিতি এবং উত্তরাধিকারী ও অর্জিত দক্ষতার ওপর নির্ভর করে শ্রমের হার নির্ধারিত ও পরিবর্তিত হয়। ইসলামী সমাজের রীতি হলো নিয়োগকারী তার পছন্দসই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে এবং শ্রমিক তার নিজের প্রয়োজন ও পছন্দ অনুসারে শ্রম প্রদান করবে। উৎপাদন ও শ্রমিকদের যোগান ও চাহিদা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে মজুরীর হার বাড়তে বা কমতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হল, কলকারখানার কর্ম পরিস্থিতি তত্ত্বাবধান করা যাতে মজুরী কমানোর জন্য উৎপাদকদের শ্রমিক খাটানোর ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার বিরাজ না করে।[৮] আবার এমন অবস্থাও যাতে সৃষ্টি না হয় যে, বাজারের অবস্থা বা শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার কথা বিবেচনা না করেই শ্রমিক ইউনিয়নগুলো মজুরী বাড়ানোর ন্যায় একচেটিয়া চাপের সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসায়ে ইসলামী রাষ্ট্র শ্রমিকদের সর্ব নিম্ন মজুরী নির্ধারণ করতে পারে। তবে সর্ব নিম্ন মজুরীর হার কোনক্রমেই সর্ব নিম্ন আয়সীমার নীচে নামবেনা। সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্র যথাযথ আইন ও বিধি বিধান জারী করবে। এ বিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দৈনিক কর্ম-ঘন্টা, ছুটির দিন, বাৎসরিক মজুরী, শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংরক্ষণ, শ্রমিকদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ ও চিত্ত বিনোদনের সুযোগ দান ও শিশু শ্রম পরিহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করবে।[৯]

৬. সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টন নিশ্চিতকরণ ও সবার জন্য সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা

ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাস করে এমন যেকোন সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য অবশ্যই দেখা দেবে। এ পার্থক্যের কারণেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃজনশীলতার জন্য উৎসাহের সৃষ্টি হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সাধিত হয়। এটা সম্ভব না হলে অর্থনৈতিক জীবনে গতিশীলতা, বহুমুখিতা ও নমনীয়তার অভাব দেখা দেয়। যা হোক সম্পদ ও আয় বন্টনে চরমপন্থী নীতি সমাজে ভারসাম্যহীনতা ও বিপদ বয়ে আনে, ঘৃণা ও শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সঠিক সামাজিক আচরণ, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও সম্পদের প্রতি যত্নের বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করে। অধিকন্তু আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর কাছে এই সম্পদ পুঞ্জিভূত ও কুক্ষিগত হওয়ার কারণে সমাজে সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রেও চরম পার্থক্য দেখা যায়। একটি বিশেষ শ্রেণীর

www.pathagar.com

হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার ফলে বিরাট জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারে না কারণ তাদের ক্রয় ক্ষমতা দুর্বল[১০]। সম্পদ ও আয় একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে জমা হওয়ায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও বিত্তবান ও প্রভাবশালীদের প্রভাব বেড়ে যায় এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।[১১] আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্য ইসলামী ব্যবস্থায় বিশেষ বিধিবিধান আছে। এগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক. যাকাত প্রদান, উত্তরাধিকার প্রথা, সকল প্রকার দান, কাফফারা প্রদান এবং ওয়াকফ বিধান উল্লেখযোগ্য ;

খ. রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল বিধানসমূহ ;

ক. উত্তরাধিকার আইন

যাকাতের ব্যাপক পরিধি এবং সম্পদ ও আয়ের অসংখ্য পথ হতে আদায়কৃত যাকাতের বিপুল পরিমাণ অর্থ পুনরায় অভাবী ও নিঃস্বদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, 'সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফির (পর্যটক) দের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' (৯ঃ৬০)।

উল্লেখযোগ্য যে, যাকাত নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করার জন্য দেয়া হয়। সুতরাং প্রত্যেককে এই পরিমাণ যাকাত দেয়া উচিত, যেন তার অভাব দূর হয় এবং তার জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়। যদিও যাকাতের পরিমাণ বর্ধনশীল করের পরিমাণের সাথে তুলনা করা হয়, কিন্তু বর্ধনশীল কর হতে এটা অনেক ব্যাপক। অর্থাৎ যাকাত শুধু ব্যবসার আয় বা অন্যান্য বর্ধনশীল আয়ের ওপরই নির্ধারিত হয় না, বরং জমাকৃত সম্পদের ওপরেও ধরা হয়। কিন্তু আয়কর কেবলমাত্র অর্জিত আয়ের ওপরেই ধরা হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক আদায়যোগ্য রাজস্বকে অনেকে বর্ধনশীল আয়কর ব্যবস্থার (Progressive Income Tax) একটি ব্যবস্থা মনে করেন। কিন্তু এটা ইসলামের যাকাত ব্যবস্থায়ও আছে। কারণ, যাকাত পূর্ববর্তী বছরের সঞ্চিত ধনের ওপরও নিয়মিত ধার্য করা হয়।

ইসলামের বিধানানুসারে উত্তরাধিকার বন্টন ব্যবস্থায় বিরাট সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক সুবিধাভোগী সম্পদ ভোগ করবে। ইসলামী আইনে উপার্জিত বন্টনের ক্ষেত্রেও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বহু সুবিধাভোগী উপকৃত হতে পারে। কাফ্ফারা ও ওয়াক্ফ বিধানও একই রকম কার্যকরী।[১২]

খ. সরাসরি পদ্ধতিতে বন্টন

সমাজের প্রয়োজন মিটানর স্বার্থে ইসলামী আইনে যাকাত ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কর, যেমন - প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, মৃতের দাফন কর, বাড়তি মূল্যের ওপর আয়

www.pathagar.com

কর এবং মূলধনের ওপর মুনাফার কর (বর্ধনশীল বা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য) ধার্য করার অধিকার আছে। তবে এ অর্থ শাসকদের নিজেদের ব্যবহারের স্বার্থে নয়। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা)-এর বাণী স্মরণ রাখা প্রয়োজন ঃ 'নিজ অর্থের ওপর অধিকার প্রত্যেকের আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা যাকাতের অর্থ হিসাবে দাঁড়ায়।'

৭. রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থান এবং ব্যবসা পরিচালনার জন্য সব রকমের সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করে। তাই বেকারত্বের বিরুদ্ধে ইসলামের সংগ্রাম শাশ্বত। তাছাড়া রাষ্ট্র সব মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকের জন্য সুন্দর জীবন, আবাসস্থল ও চিকিৎসা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দেয়। রাসূল (সা)-এর বাণী, 'যদি কোন এতিম রাস্তায় পড়ে থাকে, তার দায়িত্ব আমাদের (অর্থাৎ আমরা তার যত্ন নেব) কিন্তু যদি কোন অর্থ পথে পড়ে থাকে, তার মালিক হবে এ অর্থের প্রকৃত স্বত্বাধিকারী'। আদায়কৃত যাকাতের অর্থে যদি সমাজের চাহিদা না পূরণ করা যায়, তবে ঐ রাষ্ট্রের সরকারের অধিকার আছে সম্পদশালী ব্যক্তিদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা। ইসলামী ধারণা অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্র হলো কল্যাণ রাষ্ট্র[১৩]। তবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের নামে দেশের সঞ্চয় ও উন্নয়ন ব্যাহত[১৪] করা হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অভুক্ত থাকবে এবং দুঃখ কষ্টে দিনাতিপাত করবে-ইসলামে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ইসলামী ধারণায় মানুষ একটি মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা, উন্নয়নের মূলধন যার মাধ্যমে এবং যার জন্য উন্নয়ন সাধিত হয়। তাছাড়া, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহ পাওয়া যায় এবং সমাজ বিশৃংখলা, ভাঙন, ভেদাভেদ ও ভারসাম্যহীনতার বিরুদ্ধে আরো সুদৃঢ় হয়।[১৫]

৮. পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন

ইসলামী বিধান কেবল রাষ্ট্রকে কৃষি এবং শিল্প উন্নয়নে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের অধিকারই প্রদান করে না বরং সমাজে পেশাগত ও একাডেমিক দক্ষতা বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত অগ্রসরতার সাথে পা মিলিয়ে চলার ব্যবস্থাও নির্দেশ করে। এ সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যর্থতাকে ইসলাম পাপ মনে করে।

তবে উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতা সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। সমাজে যদি বেসরকারী খাত শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অধিক সক্রিয় থাকে তাহলে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ে। তখন রাষ্ট্র কেবলমাত্র নীতি নির্ধারণ, তদারকী, তথ্য সংগ্রহ, দেশী বিদেশী বাজার সম্পর্কে খবরাখবর প্রদান ও অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু যখন বেসরকারী খাত ক্ষুদ্রতর হয়ে কেবলমাত্র সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্র সে ক্ষেত্রে সমস্ত ভারী শিল্প ও কৌশল এবং সামরিক শিল্পের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একটি সক্রিয় সরকারী খাত থাকে। তবে পরিকল্পনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন বেসরকারী খাত ও ব্যক্তি মালিকানায় উৎসাহ প্রদান সীমিত হয়ে না পড়ে।

www.pathagar.com

৯. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বৈদেশিক সম্পর্ক সংরক্ষণ

বর্তমান সমাজে মুদ্রাস্ফীতি একটি ভয়াবহ অর্থনৈতিক সমস্যা। দেশের অর্থনীতিতে এর অনেক প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া আছে। তবে এখানে এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা না করে কেবলমাত্র এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মুদ্রাস্ফীতিতে দেশের শ্রমিক-কর্মচারী ও ক্ষুদ্র জমির মালিকদের জীবন যাত্রার মান ক্রমশ খারাপ হয় এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে উৎপাদন ও দীর্ঘকালীন উন্নয়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, বাজারে মুদ্রাস্ফীতি থাকার দরুণ ভবিষ্যৎ ব্যয় নির্ধারণ খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। অধিকন্তু, মুদ্রাস্ফীতি প্রশাসনের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দেয়। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হল মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং মুদ্রাস্ফীতি দূর করা বা কমানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকারের উচিত দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা এবং "ঋণ সৃষ্টির" ক্ষেত্রে যথাযথ বিধিনিষেধ আরোপ করা। তবে, সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটলে ঋণ প্রসারের ভয়াবহতা কমে যাবে। তারপরও ঋণ বৃদ্ধি বন্ধ করা দরকার। কারণ,ঋণ অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে ব্যাংকসমূহকে অবৈধ আর্থিক ক্ষমতা দান করে। অতিরিক্ত ঋণ বন্ধ করার পদক্ষেপ হিসাবে পুঁজি যোগানদারের মধ্যে আয় বন্টন উল্লেখযোগ্য। আর্থিক নীতি ও সাধারণ বাজেটের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। উদাহরণস্বরূপ সরকারী ব্যয় এমনভাবে সমন্বয় করা উচিত যা অর্থনৈতিক মন্দা দূর করতে সহায়ক হয় এবং অযৌক্তিক ব্যয় বৃদ্ধি সংকুচিত করে[১৬]। বিদেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈদেশিক নীতি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে, যেন দেশে উৎপাদিত পণ্য রফতানী ও আমদানীর বিকল্পনীতি, সুষম শুল্কনীতি এবং সুদৃঢ় বাণিজ্যিক ভারসাম্যের সহায়ক হয় এবং অন্যান্য দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুসংহত করে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পর্ক জোরদার করে।

১০. মুসলমানদের মধ্যে অর্থনৈতিক সংহতি অর্জনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ

মুসলিম জাতির শত্রুরা সব সময় চেষ্টা চালাচ্ছে যেন মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করার মাধ্যমে তাদের দুর্বল করে রেখে নিজেদের ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে। তাদের এ চেষ্টার মূলে রয়েছে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ জিইয়ে রাখা এবং মুসলমানরা যেন একটি কার্যকরী অর্থনৈতিক কাঠামো দাঁড় করাতে না পারে সেজন্য চেষ্টা করা[১৭]।

ইসলাম সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের এক আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশকারী, এক নবীর (মুহাম্মদ (সা) নির্দেশ মান্যকারী এবং একই আইনের আওতায় এক অখন্ড জাতিসত্তা হিসাবে চিন্তা করে। সুতরাং ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এমন প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক সংহতি স্থাপনের বিষয় গভীরভাবে অনুধাবন করা দরকার। কারণ,

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক সংহতির অবশ্যম্ভাবী আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংহতি ক্ষুদ্র বাজারের সমস্যা দূর করে, বৃহৎ শিল্প ও উন্নত প্রযুক্তি চালু করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে উৎপাদন উপকরণের (প্রাকৃতিক মানব সম্পদ ও আর্থিক) সমন্বয় সাধন এবং দৃঢ় ও নমনীয় অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব হয়। এর দ্বারা মুসলিম অঞ্চলসমূহের চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সুযোগ ও বিদেশের মাটিতে মুসলমানদের বিনিয়োগ রোধকল্পে উৎপাদন ব্যবস্থার বিশেষীকরণে সহায়তা হবে[১৮]। এটা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের তাদের নিজেদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দক্ষতা নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করতেও আগ্রহী করে তুলবে। কেবলমাত্র তখনই মুসলিম জাতি খাদ্য ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে যথার্থ নিরাপত্তা লাভ করবে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। অর্থনৈতিক সংহতি মুসলিম বিশ্বকে অস্ত্রের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রদান করবে। অর্থনৈতিকভাবে সুসংহত মুসলিম বিশ্ব এর শিল্প ক্ষেত্রগুলির যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর দক্ষ জনশক্তি পুনর্বিনিয়োগের জন্য প্রাপ্ত বিরাট পুঁজিকে ব্যবহার করে মুসলিম জাতি একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র, সাঁজোয়া যান, ক্ষেপণাস্ত্র, বিমানবহর তৈরীতে সক্ষম হবে, তেমনি পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রেও চাহিদা পূরণ করতে পারবে। ঠিক তখনই মুসলিম বিশ্ব পুরোপুরি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করবে, বৃহৎ শিল্পের দেশসমূহ হতে অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হবে এবং একটি সুন্দর জীবন যাত্রা নিশ্চিত করতে পারবে।

টীকা

১. মুহাম্মদ আহমদ সাকর-এর *Al-Aqtisad Al-Islami-Mafahim wa Murtakazat* (কায়রো, Dar al-Nahda al-Arabiyya, ১৯৭৮), পৃঃ ৬৭-৬৮ দ্রঃ

২. মুহাম্মদ এন সিদ্দিকী ঃ Some Aspects of the Islamic Economy (Delhi, Markazi, Maktaba Islami, ১৯৭২), পৃঃ ৪১-৫৩ দ্রঃ

৩. ইমাম ইবন তাইমিয়া মনে করেন যে, সমাজের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জনসাধারণের জন্য কর্মসংস্থান করাও ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের দায়িত্ব। তাঁর মতে, জাতির প্রয়োজনে ব্যবসা ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য জনসাধারণকে বাধ্য করাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং তারা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবসা অথবা অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত না হতে চায়, তার জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করাও সরকারের দায়িত্ব। দ্রঃ *Hisba Fi al-Islam,* পৃঃ ২৭০।

৪. উৎপাদন এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা ও সামাজিক পুঁজির ব্যাপারে রাষ্ট্রের যথার্থ দৃষ্টিদানের পর্যাপ্ত প্রমাণ ইসলামের ইতিহাসে আছে। খলীফা উমর (রা) বলেন, 'আল্লাহর শপথ, ইরাকের ভূখন্ডে যদি কোন মাদী গাধাও বিপথগামী হয়, শেষ বিচারের দিনে তার জন্য উমরকে জবাবদিহি করতে হবে, কেন তাকে

www.pathagar.com

সৎপথ দেখানো হলো না'। খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয মুসলিম গভর্নরদের চাষীদের দিকে খেয়াল রাখা ও তাদের উৎপাদন ও ঋণ পরিশোধের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের নির্দেশ দিতেন।

৫. ইমাম ইবন তাইমিয়া বলেন, 'সরকারী তহবিলের দায়িত্বে যারা থাকেন, তারা যেন এ অর্থ এমনভাবে বন্টন না করেন যেমনভাবে কোন মালিক তার সম্পত্তি বন্টন করে। তাঁরা এ অর্থের মালিক নন, আমানতদার মাত্র'। বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে, নবী করীম (সা) বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি কাউকে কিছু দিতেও পারি না, কাউকে বঞ্চিতও করতে পারি না ; আমি কেবলমাত্র বন্টন করতে পারি'। দ্রঃ আবুল আব্বাস আহমদ ইবন তাইমিয়া ঃ *al Siyasa Al-Shar'iyya Fi Islah al-Ra'i wa al-R'aiyya* . সম্পাদনা ঃ আল-বান্না ও এম এ আশুর (কায়রো, al-Shab, ১৯৭১) পৃ-৪৩।

৬. পণ্যের মূল্য নির্ধারণ নীতির বিরোধীরা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের বিরোধের কারণ হিসাবে নবী করীম (সা) এর সময়ের একটি ঘটনাকে তাদের যুক্তির ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করেন। একবার কিছু লোক মুহাম্মদ (সা) কে বাজারের দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করে। এর জবাবে নবী করীম (সা) বলেন, 'একমাত্র আল্লাহই সম্পদ দান, সম্পদ হতে বঞ্চিত করা অথবা সম্পদের মূল্য নির্ধারণের মালিক'। এ উক্তি আবু দাউদ আত-তিরমিযী হতে বর্ণিত। যা হোক, এ ঘটনা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের নিষেধকে বুঝায় না। সম্ভবতঃ এ ঘটনার সময়ে কোন স্বাভাবিক কারণে (যেমন অতিরিক্ত চাহিদা বা সরবরাহের স্বল্পতা অথবা উৎপাদন বা পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি) বাজারে মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছিল। কিন্তু যখন বাজারে একচেটিয়া ব্যবসায়ী অথবা উৎপাদকের প্রভাবের কারণে মূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন রাষ্ট্র মূল্য নির্ধারণ না করলে রাষ্ট্রের যথাযথ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার শামিল হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম ইবন তাইমিয়া দেখা যেতে পারে। (ইবন তাইমিয়া ঃ *Al-Hisba Fi al-Islam al-Maktaba al-Ilmiyya* (মদীনা), পৃষ্ঠা ১৬-১৯ দ্রঃ)।

৭. পণ্য সামগ্রী ও সেবাসমূহের ওপর বেসরকারী খাতের নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে মুসলিম আইনবিদ (ফকীহ) ও পন্ডিতগণ (হিসবা'র আওতায়) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন। যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি মালিকানা ইসলামী সমাজের মৌলিক ভিত্তি, কিন্তু ইসলাম কখনোই উৎপাদক এবং বিক্রেতাদের ক্রেতার ক্ষতি ও তাকে প্রতারণা করার সুযোগ দেয় না। শিল্পোন্নত দেশসমূহ তাদের মান নির্ণয় ও বিশেষীকরণ ব্যবস্থা ইসলামী চিন্তাবিদ ও পন্ডিতদের লেখনী হতে গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান সংকলন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরাইশী কর্তৃক *Ma'alim al-Qurba Fi Ahkam al-Hisba* নামে ১৯৩৮ সালে অনুমোদিত ও সম্পাদিত এবং কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত। এ বিষয়ে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মধ্যযুগীয় গ্রন্থঃ *Al-Akham Al-*

www.pathagar.com

Sultaniyya রচনা ঃ আলী মুহাম্মদ আল -মাওয়ার্দী, *Fadl al-Hisba Fi Ihya'ulum al-Din* রচনা ঃ আবু হামিদ আল গাযযালী, Al-Hisba অথবা *Wadhifat Al-Dawla Fi Al-Islam* রচনাঃ ইবন তাইমিয়া, এবং *Al-Turug Al-Hukmiyya,* রচনা ঃ ইবন আল কাইয়ুম। বিষয়টির ওপর আধুনিক কালের লেখাসমূহের মধ্যে, Al-Hisba ডঃ ইসহাক মুসা আল হাসানী কর্তৃক লিখিত, *Hisba* এর ওপর প্রদত্ত শায়খ আলী আল-খাফিফ -এর ভাষণ প্রকাশনায়, *Islamic Jurisprudence Week* দামেস্ক ১৯৬১; *Al-Tashri al-Jama'i Fi al-Islam* (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭১) রচনা ঃ মুহম্মদ ফারুক আল বানহান, *Nizam al-Islam al-Iqtisadi* শায়খ মুহাম্মদ আল-মুবারক কর্তৃক প্রণীত।

৮. উমর (রা) হতে ইবনে মাজা'য় বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, 'শ্রমিককে তার গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই পাওনা পরিশোধ কর'।

৯. দ্রঃ মুহাম্মদ ফিহ্‌র সাফাগাঃ অযশধস, *Al-Amal Wa Haquq al-Ummad Fi al-Islam.* (বৈরুত, দারুল ইরশাদ, ১৯৬৭) পৃঃ ৭২, লাবিব আল সাঈদ ঃ *Dirasa Islamiyya an al-Amal Wa-al-Ummal* (কায়রো, Al-Hay'a al-Misriyya al-Amma Li-alnashr, ১৯৭০)।

১০. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সাইয়েদ কুতুব-এর *Al-Adala al-Ijtima'yya Fi al-Islam* (কায়রো, *Maktabat Wahba*)

১১. অর্থনৈতিক ক্ষমতার নিকট রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মার খাওয়া যে কত সহজ, সমাজের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষী। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্পর্কে খলীফা আবু বকর (রা) -এর সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ভাষণে বলা হয়েছে, 'আপনাদের কাছে যে শক্তিশালী, সে হবে আমার কাছে সবচেয়ে দুর্বল, আর আপনাদের কাছে যে সবচেয়ে দুর্বল, সেই হবে আমার কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী। কারণ অপরের কাছে তার যা প্রাপ্য, আমি তা কড়ায় গন্ডায় আদায় করে দেব।' কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করা হয় যে, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ সবলের পক্ষে আর দুর্বলের বিরুদ্ধে কাজ করে দুর্বলকে অত্যাচার ও আরো দুঃখ-কষ্টের মাঝে ঠেলে দেয়।

১২. সম্পদের বৃদ্ধি ও বন্টনের ক্ষেত্রে যাকাতের কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশ্লেষণের জন্য নিম্নবর্ণিত গ্রন্থ দেখা যেতে পারে ঃ মুহাম্মদ আহমদ সাকর-এর ওংষধসরপ উপড়হড়সু (কায়রো, দারুল নাহদা আল আরাবীয়া, ১৯৭৮) পৃঃ ৮২-৮৯। ইউসুফ আল-কারযাভীর রচিত 'ফিকহুয যাকাত' (বৈরুত, *Muassasat Al-Risala*, ১৯৭৩) এ বিষয়ে মধ্যযুগীয় রচনা ঃ *Kitab al-Khiraj* রচনা ঃ কাজী আবু হানিফা (র) (M'atbaa Sulafiyya, কায়রো, ১৩৫২ হিজরি) এবং *Kitab al-Amwal* রচনা ঃ আবু উবায়দ আল-কাসিম ইবন সালাম গধশঃধনধঃ অষ-কঁধষষবৃধঃ অষ-অুযধৎবৃধ (কায়রো, ১৯৬৮)।

www.pathagar.com

১৩. দ্রঃ মুহাম্মদ ফারুখ আল নাবহান ঃ *Collective trends in Islamic Economic legislation* (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭০, পৃঃ ৩৮৫-৩৯৭।)

১৪. ইবন হাযম তাঁর *Al-Mahall* গ্রন্থের ৪৫২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, 'সমাজে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি সমাজের দরিদ্রদের অভাব মোচনে সহায়তা করবে, তাদের ওপর এ দায়িত্ব রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত। যদি যাকাত অথবা অন্য কোন আর্থিক ব্যবস্থা না থাকে, তবে ধনীরা দরিদ্রদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, শীত-গ্রীষ্ম হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পোষাক এবং বৃষ্টি, সূর্যের তাপ, আলো এবং পথযাত্রীর দৃষ্টি হতে পর্দা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আবাস প্রদান করবে।'

১৫. সমসাময়িক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে 'বর্ধিত ন্যায় বিচার ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সংঘাত ধারণা'র একজন জোর সমালোচক হলেন, *Gunnar Myrdal* ঃ তাঁর রচিত Against the Stream (প্যান্থন প্রেস, কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৭২) পুস্তকটি দ্রষ্টব্য।

১৬. ইসলামের অর্থ ব্যবস্থায় বিশেষ করে মুদ্রা ও অর্থের ক্ষেত্রে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলতঃ প্রয়োগবাদী ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ওপর বিশ্বাসী। আবশ্যিকভাবেই তারা পুঁজিবাদী মুদ্রা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আলাদা। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে স্টক এক্সচেঞ্জ-এর আওতায় শেয়ার ও বন্ড বিক্রি কে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি গোলযোগ সৃষ্টিকারী অবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। স্টক এক্সচেঞ্জ জুয়া খেলার মতই। সম্ভাবনাময় শেয়ার ক্রেতারা চতুরতার সাথে মুনাফা লাভের আশায় অপেক্ষা করে। ব্যবসার ক্ষেত্রে কখনো তা প্রকৃত আয়ের ভিত্তি নয়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কীনস স্টক এক্সচেঞ্জ এর ধ্বংসাত্মক ভূমিকার জোর সমালোচক। কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। তার ভাষায়, 'বিনিয়োগকারী ও শেয়ারের সম্পর্ক ক্যাথলিক বিবাহের মত সুদৃঢ় হওয়া উচিত।' দ্রঃ J. M. Keynes : General theory (Harcourt Company Inc., ১৯৩৬)

১৭. মুহাম্মদ আহমদ সাকর এর Al-Iqtisad al-Islami : Mafahim wa Murta Kazat, উপরোল্লিখিত পৃঃ দ্রঃ ৯৪-৯৬।

১৮. দ্রঃ হামদিয়্যা জাহরান *'Development of the Oil Prices and the Strategy of Using Oil Surplus.'* বইয়ের নাম *Economics and Management Magazine,* (Research and Development Centre at the faculty of Economics and Management, King Ibn Abd-al-Aziz University, ১৯৭৫) পৃঃ ১২৫-১৭৫।

---

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী পদ্ধতি

সাইয়েদ নওয়াব হায়দার নকভী*

১. ইসলামী পুনর্জাগরণকে আধুনিক যুগের অতি নাটকীয় বিষয়সমূহের অন্যতম বলে অভিহিত করা হয়। এটা বিশ্বকে অপ্রত্যাশিত ও অরক্ষিতভাবে পাকড়াও করেছে। একবারের প্রচেষ্টায় বর্তমান সামাজিক প্রথাকে আত্মস্থ করতে একের পর এক ঘটনাবলী দ্রুত ঘটে চলেছে। বস্তুতপক্ষে ধুলিকণার (dust) ন্যায় দৃঢ়ভাবে জমাট বাঁধা ইসলামীকরণের অফুরন্ত শক্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক করতে মুসলিম অর্থনীতিবিদ ও সামাজিক দার্শনিকদের বছরের পর বছর লেগে যাবে। সেজন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে ইসলামী বার্তা লাভই আজ যুক্তিযুক্ত। এটা আবিষ্কারের প্রক্রিয়া উন্মুক্ত করতে পশ্চিমাদের নিকট থেকে গৃহীত বহুল কথিত ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে গ্রহণ করতে হবে, আর যা গ্রহণ করা হবে সাধারণ ইসলামী জীবন পদ্ধতির নিরিখে তাকে পুনঃ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। আবার এমনও হতে পারে যে এর কিছু কিছু অংশ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগও করতে হবে।

এটা অবশ্যম্ভাবী যেহেতু নতুন জ্ঞানের উপকরণসমূহ অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে তাই বর্তমান সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। এভাবেই সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজ একটা মাইলস্টোন থেকে আরেকটা মাইলস্টোনে ধাবিত হয়। এরূপ ধাবমান প্রবৃদ্ধির জন্য যে শর্ত পূরণ প্রয়োজন, তা হলো নবলব্ধ জ্ঞানকে যুক্তিভিত্তিক নীতিবিদ্যার কঠোর নিয়ম-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। ইসলামী জ্ঞানে এ শর্ত পরিপূর্ণ রয়েছে। কারণ এটা ন্যায়বিদ্যা বিষয়ক দর্শনের সূতিকাগারে প্রতিষ্ঠিত এবং পবিত্র ও অনুকরণযোগ্য, তাই এটা পুরো সমাজ ব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দিতে পারে। এর অন্তর্নিহিত গতিশীলতা দিয়ে সেস্থলে আরেকটি নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

আমি আজ মৌলিক ইসলামী নৈতিক মূলনীতিগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যার সাথে সম্পর্কিত করতে চাই। আমি এখানে এমন ভান করবো না যে, এগুলিই ইসলামী প্রেক্ষাপটে একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। এরপরও এটা আমার বিশ্বাস যে, এটাই উচ্চাংগের ন্যায়সংগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং এটা সহজেই মুসলিম দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সদাপ্রস্তুত মূলনীতিতে রূপান্তরযোগ্য।

২. ইসলামী নৈতিক দর্শনের সাধারণ মূলনীতির কথা উচ্চারণ ও তাদের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিবেচনার পূর্বে পাকিস্তানের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের

---

* ড. সৈয়দ নওয়াব হায়দার নাকভী-ডাইরেক্টর, পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকস্ ইসলামাবাদ, পাকিস্তান

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে বিষয়টির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করার জন্য বর্তমান প্রবৃদ্ধিগত দর্শন ও দিক নির্দেশকারী উন্নয়ন প্রচেষ্টার ওপর সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আজকাল পাকিস্তানের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেমন দেখা যায় যে, এসব দেশে উন্নয়ন প্রচেষ্টা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিরাট পরিসরেই হ্যারোড-ডোমার মডেলের নব্য ক্লাসিক তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ব্যাপারটাকে তুলে ধরলে দেখা যায়, তত্ত্বটার মূল লক্ষ্য হলো, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যাপকভাবে পুঁজি গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট করা। জনসংখ্যা একটি নির্ধারিত বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। একথা ধরে নিলে দেখা যাবে যে, পুঁজি ও শ্রমের অনুপাত বৃদ্ধি হেতু বর্তমান পুঁজি-প্রগাঢ়তার ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা অর্থনীতি একটি গতিশীল ভারসাম্যে উপনীত হচ্ছে। সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি হিসেবে ভারী শিল্পে বিনিয়োগকে গুরুত্ব প্রদান করে ফেল্ডস্টেইন ও মহলানবিশ-এর অধিকতর ব্যবহারিক মডেলই শুধুমাত্র পরিকল্পনাবিদদের নিকট পুঁজি-প্রগাঢ়তার আবেশ সৃষ্টি করেছে। এসব তত্ত্ব বেশ কঠোর নিয়মবদ্ধ ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তা ভুলে গিয়ে নীতি নির্ধারকগণ এগুলোকে দ্ব্যর্থহীন ও সরল হাতুড়ে প্রণালীতে রূপান্তরিত করেন। যেমন, আপনি যদি চিরদিন সুখে বসবাস করতে চান তাহলে বর্তমান ভোগের জন্য পুঁজি সংগঠনকে পাইকারীভাবে দ্রুততার সাথে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিন।

এটাই দুর্ভাগ্য যে, সুখ জিনিসটা এমন বস্তু যে, অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃদ্ধি সাধনকারী শিকারী সীমাহীন মূল্যেও তা ক্রয় করতে সক্ষম হয়নি। নিঃসঙ্কোচে ও আনন্দের সাথে আমরা উচ্চ প্রবৃদ্ধির দর্শনের সারি সারি চতুঃষচক্র শকটে চড়ে নিজেরাই নিজেদের জয়গাথা গেয়ে ও জয়ের পতাকা উড়িয়ে পূর্ণ নিয়োগ ও ভারসাম্যের আশায় দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এরপরও ওয়ান্ডারল্যান্ডের এলিসের ন্যায় একই স্থানে স্থিতিশীল থাকার জন্য করণীয় সব কিছুই করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা তাও করতে পারিনি। প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি যেনতেনভাবে অসহায় যাত্রীদের অবশ্যম্ভাবী দুঃখজনক অবস্থার শিকার করে দারিদ্রের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এটাকে আর এফ খান 'জারজ সোনালী যুগ' হিসেবে বর্দ্ধমান বেকারত্বের ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি হিসাবে চিত্রিত করেছেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন পদ্ধতি আমার মতে, অবহেলিত মানবিক মূলধনের তীব্র প্রয়োজনীয়তার প্রায় ক্ষেত্রেই ভুলক্রমেই ভোগ হিসেবে বিবেচিত। তাকে বিনিয়োগ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত বলে গণনা করা হয়নি। এসব দেশের অক্ষমতাই এরূপ হবার কারণ। যেমন পাকিস্তানের ন্যায় শ্রম অধ্যুষিত দেশে কোন প্রযুক্তি প্রবর্তনের কথা উঠলে শ্রম নির্ভর প্রযুক্তিই আসবে। এর পরিবর্তে যদি উচ্চতর পুঁজি-নির্ভর প্রযুক্তির ঘোড়া দৌড়ানোর কথা বলি তাহলে কাঙ্ক্ষিত উচ্চ পুঁজি বনাম উৎপাদিত দ্রব্যের আনুপাতিক হারের কথা বলতে হবে।

www.pathagar.com

এরূপ প্রবৃদ্ধিমূলক কৌশলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল, বন্টনের ক্ষেত্রে অপরাধজনক গাফিলতি। রাতের পর যেমন স্বাভাবিকভাবে দিন আসে, তেমনি প্রবৃদ্ধিও স্বাভাবিক নিয়মে আসবে। এরূপ নমনীয় ধারণার ফলেই বন্টনের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়। এমন নীতির ফলে কায়েমী স্বার্থবাদীর সৃষ্টি হয় যা জাতীয় আয়ের সুষম বন্টনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। উন্নয়ন কর্মসূচী, নিম্ন কর্মসংস্থান ও একেবারে বড় অবিবেচনাপ্রসূত চিন্তাধারা আয় বন্টনে মন্দতর অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

৩. এটা এখন সবারই জানার বিষয় ও শাশ্বত স্বীকৃত যে, কিছু হবে ভিন্ন ধরনের, কিছু হবে আমূল সংস্কারমূলক। এর পরও সত্য যে, শংকা ও বেপরোয়া জোরালো বাতাসে আশার প্রদীপ জ্বলছে। এটা আজ সবার নিকটই বোধগম্য যে, কিছু মৌলিক প্রয়োজনীয় কৌশলের সাহায্যে অভাব, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সমস্যাকে মুখোমুখিভাবে আক্রমণ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত তত্ত্বগত বিষয়ে আধুনিক বিশ্বের অত্যধিক আচ্ছন্নতা উৎপাদন প্রতিমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে প্রচ্ছন্ন দারিদ্র ও বহুল বিস্তৃত অসন্তোষের । এমন কি যারা দরিদ্র অবস্থা থেকে বের হয়ে এর কঠোর কষাঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সামান্যতম হলেও উন্নতির আলো দেখেছে, তারাও তা থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। বিশ্বকে বর্তমান মানবীয় ব্যাধির বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে হলে নতুন কিছুর প্রয়োজন।

৪. এসব সমস্যা সমাধানের ইসলামী পদ্ধতি কি ? এ প্রশ্নের জবাব দেবার পূর্বে সমাজের সাধারণ ইসলামী দৃষ্টিভংগীর একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান ফলদায়ক হবে। এ দৃষ্টিভংগীর সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটা, যা সর্বমোট মানবজীবনের সকল দিকের ওপর বিস্তৃত। এটাও নৈতিক দিক থেকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ইসলামী প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, নীতিবিদ্যাই অর্থনীতিকে শাসন করে। অন্য কোন কিছুই তা' করে না। মার্ক্সের অনুসৃত ধারণা থেকে এটা ঠিক বিপরীত মার্ক্সবাদে অর্থনীতিকে মানুষের নৈতিক আচার আচরণের প্রধান নিয়ামক হিসেবে মনে করা হয়। সে যাই হোক, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলাম মানুষের 'মালিকানামূলক' ও বস্তুতান্ত্রিক প্রবৃত্তির কথা স্বীকার করে না। কেননা ইসলামী মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর ওপর কোন গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। আল কুরআনে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে ঃ 'ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছিত হিসাবেও উৎকৃষ্ট' (১৮ ঃ ৪৬)।

এটা যেহেতু ইসলামী ধারণা সেহেতু এর আবশ্যকীয় উপাদানগুলো কি কি ? প্রধানতঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী শাশ্বতভাবে পূর্বে বর্ণিত সর্বব্যাপী ঐক্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা সংগতিপূর্ণ শক্তি হিসেবে সমগ্র

www.pathagar.com

বিশ্বকে আলোকিত করেছে। বিশেষ করে এটা মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ ও নৈতিক বিশ্বাসকে সংহত করে। মানুষের জীবনের উভয় দিককে একই শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করতে হবে। কারণ পৃথিবীর জীবনের মাধ্যমেই বেহেশতে প্রবেশ করা সম্ভব। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ 'হে আমাদের রব, আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও' (২ ঃ ২০১)। ইসলামী অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে মৌলিক স্তরে দ্বিতীয় যে উপাদান তা শক্তির ভারসাম্য হিসেবে ন্যায়বিচার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আল-কুরআনে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 'দেখ, আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে' (৫৪ ঃ ৪৯)। মানুষের অস্তিত্বকে একই সমতলে রেখে ন্যায়বিচার মানুষের জীবনের সকল দিককে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠা করেছে। এটাই হলো ভিত্তি যার ওপর সামাজিক জীবনের ইসলামী ধারণা প্রতিষ্ঠিত। মানুষের সকল সামাজিক আচার আচরণে সামাজিক বিচারের গুণাগুণ পরিব্যাপ্ত হওয়া উচিত, যা তার অর্থনৈতিক আচার আচরণকে শাসন করে।

এ দু'টো উপাদান- একতা ও ন্যায় বিচার একবারে ও একই সময়ে ইসলামী পদ্ধতিকে একতাবদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে। তাহলে আল্লাহ প্রদত্ত সৃষ্টির সামাজিক বিধান কি ? ইসলামী পদ্ধতির প্রকৃত দিকটা হলো ঃ মানুষ স্বাধীন, কেননা তার স্বাধীনতা আল্লাহ প্রদত্ত। একমাত্র আল্লাহরই নিকট তার দায়িত্ববোধের দ্বারা তার স্বাধীনতা যথারীতি নিয়ন্ত্রিত। ইসলামের ধারণানুযায়ী এরূপ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা মানুষকে অতীতের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তার লক্ষ্য পথে পরিচালিত করে। এভাবে ইসলাম মানুষের স্ববিবেচনাপ্রসূত ক্ষমতার কেন্দ্রীয় আবশ্যকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। মুসলমানের নিকট জীবন জিনিসটা প্রকান্ড একটা যন্ত্র হিসেবে আসে না যে, সে শুধুমাত্র তার একটি অসহায় যাত্রী। তা না হয়ে জীবনটা কলের করাত দিয়ে কাটা টুকরো টুকরো ছবির ন্যায়, যার রহস্য চিরদিনের জন্য তাকে উন্মোচন করতে হবে। 'আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজদের মধ্যে, ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে সে সত্য' (৪১:৫৩)। নিরলস-ভাবে পূর্ণ বিচারবুদ্ধি ও স্ববিবেচনাপ্রসূত ক্ষমতা প্রয়োগ করে মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ইসলামী দৃষ্টির এ আলোকচ্ছটার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো ঃ এটা গতিশীল সামাজিক জীবনের প্রধান শর্ত পূরণ করে। এর উপাদানগুলো সামাজিক সম্পর্কের সকল বিধিবিধানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানকেই নির্দেশ করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সচেতন উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমে তা' অর্জন সম্ভব। যেমন, ন্যায়বিচার হলো একটি মৌলিক সম্পত্তি, যা অবশ্যই কায়েম করতে হবে, সাধারণ নিয়মে যা কায়েম হয় না। কেননা পরিবেশে কোন ত্রুটির সৃষ্টি হলে মানুষ সেজন্য দায়ী হয়। মানুষ ইচ্ছা করলেই বেপরোয়াভাবে শূন্যে তার হস্ত নিক্ষেপ করে সুন্দর আয়েশী একাকীত্বে শুধু আপন চিন্তায় বিভোর থাকতে পারে

www.pathagar.com

না। তাকে সারাক্ষণ শয়তানী শক্তির সাথে এরূপ লড়াইয়ে নিমগ্ন থাকতে হয়, যে শয়তানী শক্তি জীবনের ঐক্য ও ইনসাফের ন্যায় আবশ্যকীয় গুণকে বিনষ্ট করে দিতে পারে। এটাই জিহাদ। এটা শুধু অবিশ্বাসীদের সাথে লড়াইয়েই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পার্থিব সকল কিছুতে শয়তানী শক্তির সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে। এটা একটা বিরামহীন পদ্ধতি, যা মানুষের ভেতরে ও বাইরে চলেই আসছে।

৫. এই অবিমিশ্র ঐশ্বরিক দর্শন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে তাদের ব্যাপক কৃত্রিম পার্থক্যের অবসান ঘটিয়েছে। আদল বা সামাজিক ন্যায়বিচার একটা নির্দিষ্ট সময়ে পার্থিব জীবনের সর্বত্র কায়েম করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটাই ইসলামী পদ্ধতির মূল ভিত্তি। আয় ও সম্পদ কয়েকটি হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকা ইসলামে বৈধ নয়। এ প্রেক্ষিতে কুরআনের ঘোষণা স্পষ্ট 'যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই যেন ঐশ্বর্য আবর্তন না করে' (৫৯ ঃ ৭)। বস্তুত সম্পদ শুধুমাত্র ঐশ্বর্যশালীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে পারে না, কেননা মানুষের যা প্রয়োজন তার সবকিছু তাদের নেই। 'তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক' (৫১ ঃ ১৯)। এটাই ন্যায়ভিত্তিক সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সম্ভাব্য স্পষ্ট ঘোষণা, 'যা প্রত্যেকের নিকট থেকে তার সামর্থ অনুসারে আবার প্রত্যেককে তার প্রয়োজনানুসারে প্রদানের' দ্বৈত নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। একজন ব্যক্তি ন্যূনতম যা আয় করবে বেঁচে থাকার জন্য শুধু তাই সে পাবে, আয়ের সাথে তার এরূপ সম্পর্ক ইসলাম সমর্থন করেনা। আর সে জন্যই ইসলামী সমাজব্যবস্থা পরগাছা ও দরিদ্রতাকে উৎসাহিত করে না।

মানবজাতির মজবুত রাজনৈতিক ও সামাজিক সমতা অনুসৃতিই ইসলামের একটি নির্দিষ্ট প্রবৃদ্ধির দর্শন। প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ হওয়ার অজুহাতেও আয় এবং সম্পদে কোন রকমের অসাম্য ইসলাম সমর্থন করে না। সেজন্য ইসলামী প্রেক্ষাপটে উন্নততর আয় বন্টনের মাধ্যমে অর্জিত নিম্নতর প্রবৃদ্ধির হার অবশ্যই অসম আয় বন্টনের মাধ্যমে অর্জিত উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এর দ্বারা এটা বোঝান হচ্ছে না যে, ইসলাম নেহাতই অর্থনীতিতে নিম্ন প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। কিন্তু সম্পদ বন্টনের নিয়ম যেমন একটি বিশেষ প্রবৃদ্ধিসূচক রেখায় অস্পষ্টভাবে দেখান হয়, তাকে অবশ্যই সমাজ তথা ইসলামের আয় বন্টনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বর্তমান বংশধরদের আবশ্যকীয়তাকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য উৎসর্গ করে দেয়া যাবে না।

তা হলে এটা কি এরূপ দাঁড়ায় যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের বিনিময়ে বর্তমান বংশধররা তাদের বসতি নির্মাণ করবে? উত্তরটা একান্তই নেতিবাচক।

বংশ থেকে বংশান্তরে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুঁজি সংগঠনের নিমিত্তে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য প্রচুর সম্পদের ব্যবস্থা থাকা চাই। আধুনিক অর্থনীতির ভাষায় ইসলাম কাম্য প্রবৃদ্ধির কথা বলে এবং অনিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধিকে নিরুৎসাহিত করে। ইসলামী অর্থনীতিতে

www.pathagar.com

নীতি নির্ধারকদের যা করতে বলা হবে, তার মধ্যে কঠিনতর সমস্যা হলো ঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোগের ধারাকে সর্বোচ্চ করা, যা বর্তমান সময় থেকে অসীম ভবিষ্যৎ বা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হবে। পুঁজি গঠনের নিমিত্ত অর্থনীতিকে প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করতে দেয়ার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ভোগকে নিশ্চিত করা যেতে পারে। একজন অর্থনীতির ছাত্রের এটা অবশ্যই জানা আছে যে, এ কাজটা ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যবস্থাপত্র দেয়ার চাইতে অনেক কঠিন। কেননা তাড়াহুড়ো করে প্রবৃদ্ধির ব্যবস্থাপত্র প্রণয়নকে ইসলাম অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করে।

৬. এটা এখন স্পষ্ট যে, এ ধরনের উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন করা সহজ ব্যাপার নয়। তদুপরি 'সীমাহীন প্রবৃদ্ধি'ও অসম্ভব। এরূপ হওয়ার কারণ হলো এ কৌশলটা প্রবৃদ্ধির ওপরেই জোর দেয় না বরং প্রবৃদ্ধির গুণের ওপরও জোর দিয়ে থাকে। বিশেষ করে মানবিক উপাদান উৎপাদনে ন্যায্য অধিকার পেয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে ইসলামী অর্থনীতিতে পুঁজি গঠন বলতে শুধুমাত্র বস্তুগত পুঁজি গঠনকেই বোঝায় না, বরং মানবিক পুঁজি গঠনকেও বুঝিয়ে থাকে। এ পর্যবেক্ষণের দু'টো আবশ্যিক গুরুত্ব রয়েছে ঃ ১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অবশ্যই কর্মসংস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। ২. প্রবৃদ্ধি পদ্ধতি এমন হবে যে, এতে মানবিক পুঁজির গুণের উন্নয়ন ঘটবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী পদ্ধতিতে শিক্ষা বিস্তার ও এর মান উন্নয়নে ইতিবাচক সুপারিশ প্রদান করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে বস্তুত সার্বজনীন শিক্ষা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সে যাই হোক, যে কোন মূল্যে শুধুমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিই এর লক্ষ্য নয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে শেষপর্যন্ত প্রযুক্তিগত দক্ষতার মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে। এরপরও প্রয়োজন দেখা দিলে পূর্ত কর্মসূচীর তাৎক্ষণিক সমস্যা লাঘবের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। কর্মসংস্থান ও শিক্ষা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৌশলগতভাবে সম্ভাব্য কর্মসংস্থানের ধারা শেষাবধি বিশেষ প্রবৃদ্ধি রেখায় অস্পষ্টভাবে পুঁজি ও শ্রমের আনুপাতিক হারের ওপর নির্ভর করে। যে অর্থনীতিতে পুঁজির পরিমাণ স্বল্প আর শ্রমের প্রাচুর্য রয়েছে সে অর্থনীতির জন্য গড়ে স্বল্প পুঁজি ও শ্রমের আনুপাতিক হারের ওপর নির্ভরশীলতার কথা ভাবতে হবে। তাতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি উচ্চতর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। বর্তমান পুঁজি প্রগাঢ়তার জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা এর মাধ্যমে সমাজে বাঞ্ছিত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় না। তাহলে কি করতে হবে ? প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মধ্যেই এর জবাব নিহিত রয়েছে, যা শ্রম নির্ভর প্রযুক্তির উন্নয়নের ওপর নির্ভর করে। এর ফলে শিক্ষা খাতে বর্ধিত বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা পাকিস্তানে যখন নিম্নতম শিক্ষার হারের সম্মুখীন, সে অবস্থায় সমাজে আসলেই কোন প্রযুক্তিগত উন্নতি হতে পারে নি।

www.pathagar.com

সে যাই হোক, ইসলামী প্রেক্ষাপটে শিক্ষা শুধু কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্যই প্রয়োজন নয় বরং মানুষের মধ্যে উন্নত চরিত্র সৃষ্টির জন্যও প্রয়োজন। ইসলাম যেহেতু একজন মানুষকে 'স্বাধীন' ও 'দায়িত্বশীল' মনে করে, সেহেতু সে অশিক্ষিত থাকতে পারে না। এ জন্যই তাকে অনবরত আল্লাহর কাছে এই বলে দু'আ করতে বলা হয়েছে ঃ 'হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' (২০ ঃ ১১৪)। (এটা আশ্চর্যজনক যে, কুরআনে যে শব্দটি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বলে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে তা হলো 'জ্ঞান' আর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হলো 'আল্লাহ') বাস্তব ক্ষেত্রে জ্ঞানের মাধ্যমেই ইসলাম মানুষের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে ঃ 'যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয়, তারা কি সমান হতে পারে' (৩৯ ঃ ৮) ? এটা এমন একটা প্রশ্ন যার উত্তর স্পষ্টতই না-সূচক।

৭. এটা যদি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হয় তাহলে কিভাবে মুসলিম সমাজকে একটি প্রবৃদ্ধি রেখায় ফেলা যায়, যার মাধ্যমে ইসলামের শর্ত পূরণ হতে পারে ? এখানে সবচেয়ে উন্নত একটি 'প্রারম্ভিক বিন্দু' স্থির করাই কঠিন। গতিশীল বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে পুরো কাম্য প্রবৃদ্ধির রেখা নির্ধারণ করাই প্রয়োজনীয় শর্ত। তাহলে নির্বাচন ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হলো ঃ কার্যক্ষম নীতি-নির্ধারণী কৌশল বের করা যা আর্থ-সামাজিক অসমতার ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে। ইসলামী প্রেক্ষাপটে যা আদলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা যুলুমে পরিণত হয়, আর যুলুম হল গুরুতর অন্যায়। এ প্রেক্ষিতে সামাজিক অসাম্য যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। আর তাই যুলুমকে উচ্ছেদ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিশেষ করে ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কিত সমস্যার একটি সঠিক ইসলামী সমাধান বের করা প্রয়োজন।

আয় সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যকে ব্যাপকভাবে প্রাথমিক সম্পদের মালিকানার সাথে চিহ্নিত করা যায়। তাই স্পষ্টত সীমাহীন সম্পদের মালিকানাকেও 'প্রারম্ভিক বিন্দুর' নীতি নির্ধারণী বিষয় হিসেবে গণ্য করা যায় না। যাকাত, সম্পদ ও মূলধনী কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব নীতি দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথাকে দ্রুত লুপ্ত করার জন্য ঢালাও ভূমি সংস্কার নীতির সাথে একীভূত করতে হবে। প্রাথমিক নীতি-নির্ধারণী অন্যান্য উপাদানের শিক্ষাকেও বিস্তৃতভাবে সার্বজনিনকরণে বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার চূড়ান্ত পদক্ষেপ স্থির করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তার ব্যয় যাকাতের অর্থ থেকেই সংকুলান করা হবে। রীবা হচ্ছে কঠোর ও বাধ্যতামূলক (Mandatory) পদক্ষেপ। তা হবে সচরাচর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিক পদ্ধতি। এ উদ্দেশে পাকিস্তানে কিছু ছোটখাট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন রীবা-মুক্ত বিনিয়োগ, ছোট ছোট গৃহ নির্মাণের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ, ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি ঋণ। এরপরও এরূপ আংশিক পদক্ষেপ কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও পুরো অর্থনীতিভিত্তিক রীবা উচ্ছেদের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সরাসরি কোন সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠা করে না। পরবর্তীতে এই ঘটনার ফলাফলের নিমিত্ত অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা

www.pathagar.com

করতে হবে। সমগ্র সঞ্চয়-বিনিয়োগ সম্পর্ক, পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক ও মুদ্রা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রীবা পুরোপুরি উচ্ছেদের পূর্বে গতিশীল অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা পূরণে সঞ্চয় বিনিয়োগের সম্পর্ককে ঢেলে সাজাতে হবে। সুযোগ ব্যয়ে পুঁজির মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে পুঁজির সর্বোচ্চ ব্যবহার ও বন্টনে দক্ষতা নিশ্চিত করে সমস্যাগুলোর সমাধানে বিকল্প উপায় বের করতে হবে। এর ফলে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মুদ্রা সৃষ্টিতে সরকারের ভূমিকা অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠভাবে বেড়ে যাবে।

রীবা উচ্ছেদ ইসলামে আবশ্যকীয় হলেও পুরো মাত্রায় ইসলামী অর্থনীতির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। লাভের অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাপনার (মুদারিবা'র ভিত্তিতে লেনদেন) মাধ্যমে সুদভিত্তিক লেনদেন প্রক্রিয়ায় রীবার উচ্ছেদ তাৎক্ষণিক ও পাকা প্রতিকল্প (Substitutes) হিসেবে কাজ করতে পারে। এটাকে সহজ পদ্ধতি বলা যেতে পারে। সব অর্থনৈতিক লেনদেনে মুদারিবা প্রচলন করে পুঁজিবাদকে 'ইসলামী' করা যাবে না। সত্যি কথা বলতে গেলে এরূপ ব্যবস্থাপনা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরো শোষণমূলক করে তোলে। সুতরাং এটা অনৈসলামী। আসল কথা হলো রীবা বা সুদমুক্ত অর্থনীতি শোষনমুক্ত ব্যবস্থার একটি অংশ বিশেষ। সকল স্বীকৃত পন্থায় আল্লাহর নির্দেশিত রীবা উচ্ছেদের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ দূর করার জন্য ব্যবস্থাটির প্রচলনে পর্যায়ক্রমে একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। শেষের এ নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মুসলিম অর্থনীতিবিদদের বর্তমান প্রজন্মকে সবচেয়ে বেশী অবদান রাখতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ন্যায় বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে এসব লক্ষ্য বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্জন করা সম্ভব নয় কি ? সর্বোপরি ইসলামী অর্থনীতির কাঠামো সম্পর্কে যা বলা হলো, এর মধ্যে আদলের ন্যায় মৌলিক বিষয়টি অর্জন করা অপেক্ষাকৃত 'নিরাপদ'। তাহলে কেন কেউ কেউ এ খেয়ালী পদ্ধতিকে অযৌক্তিক বলবে এবং অপরিচিত ও অপরীক্ষিত একটি ইসলামী ব্যবস্থার জন্য এত আগ্রহ দেখাবে ? প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বলে এর উত্তর হতে হবে স্পষ্ট। তিনটি প্রধান কারণে মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন উন্নয়ন সমস্যা সমাধানে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করা হয়।

প্রথমত, ইসলাম শুধুমাত্র উদ্দেশের বৈধতার ওপরই জোর দেয় না বরং উপায়ের ওপরও জোর দিয়ে থাকে। যেমন ইসলামী অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণীতে উন্নয়ন সমস্যার মুদ্রা বিষয়ক দিকগুলো সমাধানের জন্য রীবাকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এখন পুরো অর্থনীতিতে রীবা উচ্ছেদ একটা সাধারণ ব্যাপার নয়। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এর বিরাট কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ একটি ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তর করা সম্ভব

www.pathagar.com

নয়। ইসলামী নীতির সত্য বিষয়টি কঠোরভাবে বিশ্ব ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার আপেক্ষিক ও মৌলিক বিষয়ের উদাহরণে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী ব্যবস্থার খুটিনাটি বিষয়গুলোকে বর্তমান আর্থ ব্যবস্থার অঙ্গে প্রবেশ করানো যাবে না। এ বক্তব্য সম্পর্কে বিরূপ কিছুই থাকতে পারে না যেহেতু এটা সামগ্রিক সামাজিক যুক্তিবিদ্যা বা সামগ্রিক ব্যবস্থার একটি উপাদান। তাই বিশেষ বক্তব্যের সত্য যার সাথে যতটুকু সংশ্লিষ্ট ততটুকু সাথে রেখেই প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তার বিশিষ্ট নৈতিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে। আর এর সার্বিক কাঠামোর মধ্যেই এর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, দার্শনিক প্রেক্ষাপটে আমরা ওয়েবিয়ান তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারি যাতে অর্থনৈতিক আচরণ শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এতে কঠোর ধর্মীয় বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক আচার আচরণের সহাবস্থান বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক বিভ্রান্তির পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। বস্তুত ইসলামী নৈতিক বিশ্বাসের বিভিন্ন শাখার কৃত্রিম সন্নিবেশ এবং 'বিদেশী' আর্থ-সামাজিক দর্শন ও ব্যবস্থা একের পর এক মুসলিম দেশকে দ্বৈত সমাজ বিকাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে মানসিক ব্যধিগ্রস্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরপরও ইসলামী নৈতিক বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক আচরণের ওয়েবীয় সমীকরণকে আইন-শৃঙ্খলা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, যদি বৃহত্তর পরিসরে ইসলামী ব্যবস্থাকে একইভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমতাবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে, তাহলে সব ক্ষেত্রেই তা সমান হবে না। ওপরে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী পদ্ধতি একতা রক্ষার প্রয়োজনে শুধুমাত্র বস্তুগত প্রবৃদ্ধির উন্নয়নেই আত্মনিয়োগ করে না বরং আধ্যাত্মিক উন্নয়নেও কাজ করে থাকে। এই 'গঠন' পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিশ্চিত করা হয়। কেননা ইসলামী প্রেক্ষাপটে নৈতিক শর্তে পরিচালিত মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ নির্দেশ করা হয়ে থাকে। যেমন কোন কিছু দান শুধুমাত্র সামাজিক দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য পুনঃ বন্টনমূলক একটি কৌশলই নয় বরং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের একটি উপায়ও মাত্র। 'তুমি কি জান বন্ধুর গিরিপথ কী ? এটা হচ্ছে ঃ দাসমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান য়াতীম আত্মীয়কে অথবা দারিদ্র নিষ্পেষিত নিঃস্বকে' (৯০ ঃ ১২-১৪)। বস্তুগত নৈতিক দিকের একীকরণের প্রকৃত ফল হলো ঃ মানুষের অর্থনৈতিক আচার-আচরণে একটি শক্তিশালী স্বেচ্ছামূলক উপাদানের প্রচলন করা। কারণ কোন কিছু উৎপাদন শুধুমাত্র বস্তুগতই নয়, বরং আধ্যাত্মিকও। এটা বলার প্রয়োজন নেই যে, দু'টো শক্তি একসাথে কাজ করতে থাকলে একটি অপরটি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হতে বাধ্য।

www.pathagar.com

আমি আশা করি উন্নয়ন সমস্যা সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা ইসলাম সম্মতভাবে বৈধ এবং এটা উন্নয়ন পরিকল্পনার নতুন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। এরপরও আমি বলবো কোনক্রমেই এটা শেষ নয় বা আমি এও বলবো না যে, আমার ব্যাখ্যাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধুমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি। এরূপ সংক্ষেপে আমার বক্তব্য পেশ করার উদ্দেশ্য হলো ঃ দার্শনিক অর্থনীতিবিদ ফ্রাঙ্ক রামসে'র ন্যায় ইসলামী পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলার পূর্বে কোন বিষয়কে আরো পরিষ্কার করে উপস্থাপন করা উচিৎ। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের যেমন ক্ষীণদৃষ্টি তেমনি এটাকে পূরণ করাও অনেক সময়ের ব্যাপার। যাই হোক, আজকের বিশ্বে আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন তা কঠিন ও গুরুতর, সাধারণ ও মামুলী উপায়ে যার সমাধান সম্ভব নয়। আমাদের মুসলমানদের সম্ভাব্য কিছু বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে যেহেতু পূর্ব স্থিরকৃত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের সব পন্থা আমাদের জন্য খোলা নেই। আধ্যাত্মিক মুক্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটা অগ্রগতি সাধন করতে না পারলে আমরা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে পারি না। অজানা সব দুর্যোগে নিমজ্জিত হয়ে ইসলামের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান অনুসরণ করলে বড় একটা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাবে, যা শুধুমাত্র এ পৃথিবীতেই নয় অপর পৃথিবীতেও। আমরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হই তার ব্যাপারে আমাদের সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট, বিনীত ও বাস্তববাদী হতে হবে। কারণ সকল প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মহাজটিলতা সম্পর্কে এবং আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমার পুরো সচেতনতা রয়েছে, যা এ ক্ষেত্রে আমি বিনীতভাবে প্রদর্শন করেছি।

---

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যবস্থায় উন্নয়ন কৌশল ভাবনা

ডঃ খুরশীদ আহমদ*

তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়ন কার্যক্রম অপূরণীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অনুন্নয়ন ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে তিন দশকের আন্তর্জাতিক 'ধর্মযুদ্ধ' অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলোতে পাশ্চাত্য মডেলের উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রতি প্রায় সার্বজনিন অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে। এ ব্যর্থতা উপলব্ধিতে ও এর কারণ সম্পর্কে যত পার্থক্যই থাকুক, তৃতীয় বিশ্বের জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ বিরাজমান। তার ফলে উন্নয়নের অর্থনীতি "অসন্তোষের অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।"

মুসলিম বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তর অংশ নিয়ে গঠিত। বর্তমানে (২০০২) মুসলিম বিশ্ব ছড়িয়ে আছে ৪৩টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রায় ১২৫ কোটি মানুষ এবং বিশ্ব জনসংখ্যার[১] প্রায় ২৫% এবং ২৬.৫৬ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে। ১৯৭৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুসলিম বিশ্ব উন্নয়নশীল বিশ্বের মোট এলাকার শতকরা ৩৯.৪ ভাগ এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩১.৭ ভাগের অধিকারী। মুসলিম বিশ্ব শুধু একটি ভৌগোলিক সত্তাই নয়, এর সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক স্বাতন্ত্র্যও রয়েছে। পশ্চিমা ঔপনিবেশিক দাসত্ব হতে মুক্তির পর মুসলিম বিশ্ব এখন পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য থেকে মুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত। সমসাময়িক দুনিয়ায় ইসলামী নৈতিক ও সামাজিক পুনর্জাগরণের যে ঢেউ উঠেছে তা থেকে প্রেরণা পেয়ে ইসলামের নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নীতিগত অনুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে মুসলিম বিশ্ব আজ অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য মডেলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে পন্থা পরীক্ষা করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে ইসলামী পুনর্জাগরণী আন্দোলন মুসলমানদের ভ্রান্তি দূরীকরণে অধিকতর সহায়তা করছে। পাশ্চাত্যের সৃষ্ট প্রধান উন্নয়ন কৌশলের সার্বিক ব্যর্থতা ও মুসলমানদের বিশেষ অসন্তোষের যে চিত্র, তা পুনঃমূল্যায়নের দাবি রাখে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উপেক্ষা না করে উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়াগুলোকে উন্নয়নের জন্য নতুনভাবে দেখা দরকার। বিকল্প পন্থায় কিছু চিন্তা-ভাবনা করা এবং ইসলামী প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য এ প্রবন্ধে চেষ্টা করা হয়েছে।

এ প্রবন্ধে বিতর্কের প্রসঙ্গ হিসেবে তিনটি সমস্যা পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি। প্রথমতঃ উন্নয়নমূলক পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রতি অসন্তোষের প্রধান কয়েকটি কারণ এখানে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে। কারণগুলো দু'ভাগে বিভক্ত ভ্রান্তির সাধারণ কারণ ও মুসলমানদের অবস্থার প্রেক্ষিতে কতকগুলো বিশেষ কারণ।

* প্রফেসর খুরশীদ আহমদ-ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাটিজ, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত আমরা প্রধান কারণ নিয়ে আলোকপাত করতে চাই যা উন্নয়ন কৌশলের ব্যাপারে সমসাময়িক মুসলিম চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করছে। আলোচনার শেষ পর্যায়ে বিকল্প কৌশলের কিছু উপাদান সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। চিন্তা ভাবনার এ উপাদানগুলো অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক কৌশল হিসেবে বর্ণনা করার পরিকল্পনা এখনো নেয়া হয়নি। খুব বেশী হলে এখানে কতকগুলো কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় সম্ভাবনাময় কৌশল প্রত্যাশা করার মত যথেষ্ট যুক্তিও রয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা সম্পর্কে যে সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে, তার ওপর বক্তব্য রাখা অপ্রাসংগিক হবে না। আমরা নিরপেক্ষতা ও আদর্শিক পক্ষপাতহীনতার কৃতিত্ব দাবি করি না। অর্থনৈতিক ঘটনা ও নীতি সুপারিশের পরামর্শ বুঝার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের উপকরণাদি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক এবং এসব উপকরণের যথার্থ ব্যবহারে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু তাই বলে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৌশলগত পদ্ধতি অবলম্বনের ভান করছি না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু এসব কৌশলগত বিষয়ের সাথেই সম্পৃক্ত নয় বরং তার চেয়েও বেশী সম্পৃক্ত ভবিষ্যৎ দূরদর্শিতা। বিশেষ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টা থেকে এটাকে পৃথক করা যাবে না। উদ্দেশ্যসমূহ জনগণকে কাজ ও আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করে। সেখানে জনগণ তাদের আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়ন দেখতে পায়। এতে তাদের বোঝার ভার লাঘব হয় এবং তারা যেটাকে সুন্দর জীবন বলে গণ্য করে, তা অর্জিত হয়। উন্নয়ন কৌশলের ব্যর্থতার মধ্যে কতকগুলো ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরোপিত মূল্যবোধহীন পদ্ধতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত বা উন্নয়নের কারিগরি কৌশল এবং হাতিয়ারের আবেশে একাকার এবং এগুলো লক্ষ্য অর্জনের জন্য ক্ষতিকারক[২]। পুঁজি ও দ্রব্যের অনুপাত, ব্যয়-মুনাফার সার্বিক বিবেচনা, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত দ্রব্যের বিশ্লেষণ এবং ম্যাক্রো মডেলের উপকারিতা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যা হোক, এসব হাতিয়ারের ব্যবহার ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে যদি উন্নয়ন কৌশল ও কর্মসূচীকে সমাজের সবিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাঠামোর মধ্যে কাজ করার জন্য ঢেলে সাজান না হয়। ব্যর্থতার কারণ শুধু হাতিয়ার ব্যবহারের মধ্যেই নিহিত নয়, বরং কাঠামোগতও। এদেরকে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং লক্ষ্য ও মূল্যবোধ-নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আবেশ বা আচ্ছন্নতা সৃষ্টিকারী কিছু ধারণাও এখানে কাজ করছে[৩]। সুতরাং আমরা আদর্শিক প্রতিশ্রুতির সাথে অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচনা শুরু করছি।

উন্নয়নের লক্ষণ

প্রতিকারের জন্য মানুষ সীমাহীন অন্বেষায় নিয়োজিত থেকেছে। তৃতীয় বিশ্বের জনগণের নিকট অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তাদের সকল সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখান হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সাথে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি আরও গভীরতর হয়েছে। তাদের প্রকৃত দারিদ্রাবস্থা ও ধনী-দরিদ্রের

www.pathagar.com

মধ্যকার বিস্তর ব্যবধান সম্পর্কে পাশ্চাত্য আরো সচেতন হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে জনগণ পাশ্চাত্য উন্নয়নের অনেক গল্প শুনেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের পর পাশ্চাত্য অনুসৃত উৎপাদন পন্থা অনুকরণ করার জন্য তাদেরকে পরামর্শও দেয়া হয়। শিল্পায়নকে ধন্বন্তরী মনে করা হয়। শিল্পায়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূল বিষয় গণ্য হয়। সঞ্চয় ও লেনদেনের ভারসাম্যে দু'টা প্রধান শূন্যতা পূরণের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ও পাশ্চাত্য প্রযুক্তি হস্তান্তর নতুন ব্যবস্থাপত্রের প্রধান উপাদান। আমদানীর বিকল্প উদ্ভাবন এবং স্বল্প পরিমাণে হলেও রফতানী উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে স্বপ্নপূরণের চিন্তা করা হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নতুন নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়। মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, ধর্ম ও নৈতিকতার ন্যায় সবকিছুকে এর বেদিতে উৎসর্গ করা হয়। অনুমান করা হয় যে, বর্ধিষ্ণু মোট জাতীয় উৎপাদন চরম উৎকর্ষ ও কাংখিত নতুন স্বর্ণযুগের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানবজাতি প্রাচুর্যের যুগে প্রবেশ করবে।

এ সংক্ষিপ্তসার অতি সহজ বলে অভিযুক্ত হতে পারে। তবুও এটা মোটামুটিভাবে সত্য যে, পাশ্চাত্য মডেলের ওপর ভিত্তি করে যে উন্নয়ন কৌশল তৃতীয় বিশ্বে প্রবর্তন করা হয়েছিল, তা কতকগুলো সাধারণ জিনিসে ভারাক্রান্ত হয়ে চাতুর্যপূর্ণ অর্থহীন অপবাক্যে পরিণত হয়। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও শিল্পায়ন একটি উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি হিসেবে সচেতন অথবা অসচেতন দাম্ভিকতায় পরিচালিত। তখন অন্যদেরও পাশ্চাত্য প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে হয়। সবচেয়ে বেশী ইতিবাচক এমনকি বেশী উৎসাহী সাড়া এসেছিল তৃতীয় বিশ্বের পাশ্চাত্য শিক্ষিত এলিটগণের কাছ থেকে। এরা শক্তি লাভ করেছিল তাদের বিদায়ী প্রভুদের কাছ থেকে। এক ধরনের আনুগত্যের সৃষ্টি করা হয় পশ্চিমা ও তৃতীয় বিশ্বের নতুন ক্ষমতাবান এলিটের মধ্যে। এ সুবিধাবাদী বন্ধুত্ব এখন মারাত্মক অবিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে। কারণ, যে উন্নয়ন কৌশল কঠোরভাবে অনুসরণ করা হতো, তা প্রয়োজনীয় ফল অর্জনে ব্যর্থ। কেননা, প্রায় প্রত্যেক উন্নয়নশীল দেশে দেশীয় শক্তিগুলো পাশ্চাত্য মডেলের প্রতি ততটা আনুকূল্য দেখায়নি। বরং তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় অর্জনে ব্যাপৃত থেকেছে। আর এ সকল প্রচেষ্টাই পাশ্চাত্যভাবাপন্ন সংখ্যালঘুদেরকে চ্যালেঞ্জ করে আসছে। অসন্তোষের প্রধান কারণগুলোকে দু'টি শিরোনামে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, সাধারণ কারণসমূহ উন্নয়ন কৌশল ব্যবহারকারী ও তত্ত্ববিশারদদের নিকট ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কতকগুলো বিশেষ দিক মুসলমানদের মনকে বিদ্রোহী করে তোলে।

কিসে তৃতীয় বিশ্বকে হতাশ করেছে ?

যদি স্বীকার করা হয় যে, উন্নয়নকে কেন্দ্র করেই অনেক আশা সঞ্চারিত করা হয়েছে ; তখন দেখা যাবে বিগত ৩০ বছরের রেকর্ড নৈরাশ্যজনক। দারিদ্র, অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন ও মন্দার সংকট চলেই আসছে। শিল্প বিপ্লবের দু'শতাব্দী পর এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন আন্দোলন আরম্ভের তিন দশক পর দুঃখের সাথে বলতে

www.pathagar.com

হয় যে, অধিকাংশ মানুষ এখনও দারিদ্রে, অপুষ্টিতে, প্রয়োজনীয় আশ্রয়ের অভাবে, রোগ-ব্যাধিতে এবং নিরক্ষরতায় ভুগছে। বিশ্বব্যাংক দুঃখের সাথে স্বীকার করেছে যে, দারিদ্র সীমার ওপর ন্যূনতম পর্যায়ে আয়-অর্জনে ব্যর্থতা অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকার শতকরা ৪০ জনকে অবিমিশ্র দারিদ্রে নিপতিত করেছে। উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে যদিও উন্নয়নের কতকগুলো ছিটমহলের আবির্ভাব ঘটেছে কিন্তু সেগুলো অর্থনীতির পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করতে অথবা ব্যাপকভিত্তিক পরিবর্তন ঘটাতে এবং উন্নয়নের জন্য সমাজের সকল ক্ষেত্রকে কার্যকররূপে একত্রিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ কতকগুলো বিষয়ের মূল্য কাঠামো, বিনিময় হার, কর ব্যবস্থা, মজুরী স্কেল, প্রযুক্তির ধরণ ইত্যাদিকে ভেঙ্গে দিয়েছে। সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ন্যূনতম কর্মসংস্থানের দিকগুলো প্রভূত পরিমাণে উপেক্ষিত হয়েছে বা অনেক কম লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যা চলাচলের বিচারে শ্রম শক্তির সার্বিক অন্তঃপ্রবাহ নতুন কর্মসংস্থান সুযোগের তুলনায় অনেক বেশী। আমদানী-বিকল্প কৌশল সত্ত্বেও আমদানির ওপর সাধারণভাবেই নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাণিজ্যের বিষয়গুলো উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। আন্তর্জাতিক ঋণগ্রস্ততা ভয়ানক হারে বেড়েছে। অপরদিকে উন্নত বিশ্ব থেকে তৃতীয় বিশ্বে প্রকৃত সম্পদের বাস্তব প্রবাহ আস্তে আস্তে হ্রাস পাচ্ছে। সম্পদের সমস্যাকে শক্তির সংকট আরও জটিলতর করেছে। এভাবে সমগ্র দৃশ্যটাই ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে।

উল্লিখিত পরিস্থিতির প্রতিকার হিসেবে মূল পুঁজি[৪] পরিচালিত উন্নয়ন কৌশলের সাথে কতকগুলো নতুন উন্নয়ন কৌশল যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলো নীচে আলোচনা করা হ'ল।

মানব পুঁজি উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গোপন কারণগুলোর মধ্যে যেগুলো সিদ্ধান্তমূলক, প্রাথমিকভাবে সেগুলোর ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'অজ্ঞতার সহগ' পরিমাপ করার অনুশীলন উন্নয়ন গতিশীলতার ওপর আলোকপাত করে এবং মানবীয় সম্পদ উন্নয়ন কৌশলের দিকে চালিত করে। এটা উন্নয়ন চিন্তা ভাবনার একটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ক্ষেত্র, কিন্তু তা মূল স্রোতধারার পদ্ধতি থেকে ব্যতিক্রমধর্মী কোন পদ্ধতি রেকর্ড করতে পারেনি। মানুষের মধ্যে বিনিয়োগ এখনও পুঁজিতত্ত্বের আরো একটি দিক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশ্লেষণের কার্যকাঠামো যথেষ্ট পরিমাণে একই রকম রয়ে গেছে। জনশক্তি পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্রবর্তন বা আবিষ্কার হলেও পরিকল্পনা পদ্ধতির সাথে এর একীভূতকরণ এখনও সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে আশাব্যঞ্জক আরম্ভের পর পদ্ধতিটি অনেক বাধার সম্মুখীন হয় ও ভীষণ অচলাবস্থার মধ্যে থেকে যায়।

www.pathagar.com

কর্ম বন্টন কৌশল

উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও আয়-বন্টনের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, এগুলোকে উপেক্ষিত বহিঃসীমা থেকে উন্নয়ন পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দুতে আনতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও বিশ্বব্যাংক-এর উদ্যোগে কতকগুলো গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং এসব গবেষণায় কিছু অন্ধকার দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন কিন্তু এখনও আশা ও স্বপ্নের রাজ্যেই রয়ে গেছে। অনেক অস্পষ্ট উদ্দেশ্য আছে পুঁজিনির্ভর কৌশলের আধিপত্য এর মধ্যে অত্যন্ত বাস্তব একটি দিক। পরিকল্পনাবিদদের মনোভাব ও দক্ষতা এ পদ্ধতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যথেষ্ট প্রাথমিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে হলেই এটাকে পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় স্রোতধারার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা যাবে। এ ঘনিষ্ঠ সংযুক্তিকরণে ব্যাপক দূরদর্শিতা থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। তবে সমাজ ও সংস্কৃতির সমষ্টি এবং উন্নয়ন পদ্ধতির সাথে এগুলোর সম্পর্ক অনুদঘাটিতই থেকে যাচ্ছে। উদ্বুদ্ধকরণ, প্রযুক্তিগত সামর্থ, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন ছাঁচ সম্পর্কে কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। তাছাড়া বিশ্লেষণের শেষ দিকে পদ্ধতিটি অসম্পূর্ণ ও অসমন্বিত হয়ে থাকছে।

মৌলিক প্রয়োজন কৌশল

এটি আরেকটি প্রতিশ্রুতিশীল পদ্ধতি যা আগ্রহ সহকারে পুঁজি-তাড়িত উন্নয়ন কৌশলের প্রবেশ পথের পদ্ধতির সাথে প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪০ এবং ১৯৫০ এর দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দোরগোড়ায় এসে এগুলো ভেঙ্গে পড়ে। এটা মানবতার কিছু পীড়াদায়ক ক্ষতের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে, তাছাড়া এর প্রারম্ভিক আবেদনও রয়েছে। প্রচেষ্টার লক্ষ্যবস্তুর কতকগুলো সম্পর্কে কিছু বলার থাকলেও পরিবর্তনের পদ্ধতি যে পন্থায় কাজ করছে, সে সম্পর্কে খুব কমই বলার আছে। এটা কঠোর ও চূড়ান্ত প্রশ্নের কতকগুলোর উত্তর দিতে ব্যর্থ। প্রশ্ন হতে পারে, রূপান্তরকরণ কিরূপে সংঘটিত হয় ? পুঁজিতত্ত্বের অধীনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন না করে এসব ন্যস্ত কর্মের জন্য কি করে সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হবে ? এবং কি ভাবে সমাজসেবার ক্ষেত্র বৈদেশিক সাহায্য কৌশলের সাথে একীভূত হবে ? যা মৌলিক প্রয়োজন সৃষ্টি করে তার ওপর আলোকপাত করলেও এটা কতকটা গুরুত্বপূর্ণ ও কতকটা বিতর্কমূলক প্রশ্ন হিসেবে অবশিষ্ট থেকে যায়। পাশ্চাত্যের অথবা গ্রাহকদের জীবন যাপন প্রণালী এবং সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে এসবের প্রয়োজন সম্পর্কে প্রশ্ন থাকতে পারে। একটি দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত সামর্থ বৃদ্ধির পর মৌলিক প্রয়োজন মেটানো ও মৌলিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক কি হতে পারে ? আবার অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা ও মৌলিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের আয়তন বা পরিধিকে বাদ দিয়ে এটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কতদূর টিকে থাকতে পারে ? কৌশলটি সমস্যার সমাধানের চেয়ে সমস্যা সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কৌশল যা আন্তর্জাতিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ও যেখানে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন সংঘটিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে এখানে তার ওপরেই আলোকপাত করা হবে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বেড়েই চলেছে। ধনী ও দরিদ্র জাতির মধ্যে ব্যবধান ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যের দামের অনিশ্চিত ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে যা উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। উন্নত দেশের আর্থিক ও বাণিজ্যিক নীতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির আরো অবনতি ঘটছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে ভয়াবহ লেনদেনের ভারসাম্য সমস্যায় আটকিয়ে রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ পরিস্থিতির মুকাবিলায় অক্ষমতা প্রকাশ করছে। এখানে সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের সাথে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের ভাগ্য অনেক বেশী সম্পৃক্ত। উত্তর-দক্ষিণ সংলাপে যথেষ্ট উষ্ণতা থাকলেও আশার আলো খুবই ক্ষীণ। এটা অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অন্ধকার সুড়ঙ্গের অন্ধকারকেও ছাড়িয়ে যায়।[৫]

কিসে মুসলমানদের মনকে আলোড়িত করছে ?

উল্লিখিত সমস্ত বক্তব্যে মুসলমানগণ সমভাবে অসন্তুষ্ট। উন্নয়ন দর্শনের নৈতিক বৈশিষ্ট্যের ওপরও তারা বিরক্ত। এ পদ্ধতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নৈতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় ও মুসলিম সমাজে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি হিসেবে কাজ করে। সম্পূর্ণ বস্তুবাদী ব্যবস্থা মুসলিম জনগণের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও ইসলামী জীবন বিধানের পরিপন্থী। ইসলাম ন্যায়বিচার ও সুন্দর আচরণের মূল্যবোধের ওপর আর্থ-সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠা ও মানব সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে চায়। কিন্তু এটা নৈতিক ও পার্থিব বিষয়কে জীবন ও জীবন সমস্যার এক অভিন্ন ও সমন্বিত ব্যবস্থার সাথে একত্রিত করে। যে পদ্ধতি জীবনকে ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত করে সেটা ইসলামে নিন্দনীয়।

অপর সামাজিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রতি পাশ্চাত্য ব্যবস্থা তেমন কোন সম্মানই প্রদর্শন করে না। পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অপর জনগণের সংস্কৃতিকে ভেঙে তাদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়েছে। এটাকে আধুনিকতার মূল্য হিসেবে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখা হয়। পরিবর্তনের তত্ত্ব হিসেবে এগুলোকে নিয়মবদ্ধ করা হয়েছে। কাজের জন্য আর্থিক উদ্বুদ্ধকরণকে শক্তিশালী করা ও সুবিধা দেয়াসহ মূল্যবোধের ওপর এখানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার অবশ্যই পুরনো ধ্যানধারণা ও চিরাচরিত প্রথার স্থান দখল করবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাঙ্খিত চাহিদা মেটানোর জন্য জনগণের মধ্যের উদ্বুদ্ধকরণ, মূল্যবোধ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান,

www.pathagar.com

পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্ক, আর্থিক পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। এভাবে সমাজকে পুরনো কাঠামো থেকে অবশ্যই উত্তরণের পূর্বশর্তের দিকে ধাবিত হতে হবে এবং পরিশেষে সমাজ উচ্চ ভোগের দিকে চালিত হবে। এমনকি যারা রোস্টোর পদ্ধতির সাথে একমত নন, তারাও পরিবর্তনের নির্দেশনা[৬] ও প্রাকৃতিক নিদর্শন হিসেবে পদ্ধতিটির মূল বক্তব্য গ্রহণ করেছেন।

মুসলমানগণ এ সবের অনুশীলনকে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতি হাস্যকর প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন। তাদের প্রধান আপত্তিসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল ঃ

ক. সমস্ত পদ্ধতিই মুসলিম সমাজে অনুকরণমূলক মানসিকতার সৃষ্টি করছে। এটা যেমন মৌলিকত্বকে ধ্বংস করছে তেমনি সৃজনশীলতার জন্যও এটা ক্ষতিকর। এ পদ্ধতির প্রতি উৎসাহদানের ফলে মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আধিপত্য স্থায়িত্ব লাভ করছে। এটা পাশ্চাত্যের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। কারণ পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক উপগ্রহ হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য এবং পাশ্চাত্যভাবাপন্ন এলিটদের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র ও পাশ্চাত্য-উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের জন্য দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

খ. মুসলিম সমাজে এ উন্নয়ন কৌশলের প্রয়োগ চরম বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে প্রমাণিত হয়েছে। সমাজকে প্রাচীন ও আধুনিক, উদার ও রক্ষণশীল, গ্রামীণ ও শহুরে, ধনী ও দরিদ্র হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে। এটা ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যসমূহকে স্থায়ী ও ভোগের অভ্যাসকে উৎসাহ দান করেছে যা অবশিষ্ট সমাজকে আধুনিক ক্ষেত্র থেকে পৃথক করে পাশ্চাত্য দেশের অনুরূপ বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। এটা পর্যায়ক্রমে সংখ্যালঘু সুবিধাভোগীদের সমৃদ্ধি ও সংখ্যাগুরু জনগণের দুর্দশার দিকে পরিচালিত করে এবং তার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বৈতবাদ নতুন উত্তেজনা ও সংঘাতের সৃষ্টি করছে। জীবন প্রণালীর এমন পরিবর্তন ঘটছে যে, একটি উচ্চ উপভোগমুখী সুবিধাবাদী সমাজকে সাধারণ জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে যারা স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী। এটা সমাজের নিশ্চিত উন্নয়নশীল অংশ থেকে অবশিষ্ট সমাজকে পৃথক করছে। আধুনিকতার নমুনাসমূহ ঘৃণার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে। এটা সমাজ ও অর্থনীতিতে বিকৃতি সৃষ্টি করছে এবং পশ্চিমা দুনিয়ার ওপর নির্ভরশীলতার সংস্কৃতিকে জোরদার করছে।

গ. সার্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যয়বহুল ও অপচয় হিসেবে পর্যবসিত হতে চলেছে এবং আমদানী-বিকল্প অর্থনীতির সত্যিকার প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবুও এটা অনেককে জীবনের নব্য রীতিতে ও বিলাসিতায় আসক্ত করছে যার ব্যয়ভার সমাজ বহন করতে পারছে না। যে দেশগুলোর ভোগ্যপণ্যের পরিমাণ কম সেখানে একটি উচ্চভোগী সমাজ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদন এবং ভোগের রীতিনীতির বিকৃতি ঘটেছে ও সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুদের খেয়াল ও মর্জি চরিতার্থ করার জন্য তাদের প্রয়োজনকে সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তবে প্রকৃত সফলতা সমাজের জন্য খুবই কম।

www.pathagar.com

ঘ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভোগসুখবাদী মনোভাবের পরিবর্তন হতে চলেছে। জাতিকে শক্তিশালীকরণ ও এর অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠন অপেক্ষা ব্যক্তিগত জীবিকার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা এখানে প্রাধান্য পায় বেশী। এ সমাজে লোভ ও দুর্নীতি ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঙ. পদ্ধতিটির মূলে ধারণা করা হয় যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিজস্ব পথে চলতে পারে এবং সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য বিরাজ করছে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেদীমূলে বিসর্জন দেয়া যেতে পারে। সামাজিক ব্যবস্থার সমষ্টি ও সংহতিকে এখানে উপেক্ষা করা হয়েছে। এটা ইসলামী ব্যবস্থার ঠিক পরিপন্থী যা জীবন ও জীবনের উদ্দেশ্যের বিভিন্ন দিকের মধ্যে এবং সমন্বিত ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে সঠিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমতা রক্ষা করছে।

অনুকরণ এবং এক জিনিসকে অন্য জিনিসের অঙ্গীভূতকরণ পদ্ধতি ইসলামের পরিপন্থী যা সীমিত অর্থে কোন ধর্ম নয়, কিন্তু এর নিজস্ব আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম রয়েছে। ইসলাম নিজস্ব নীতিমালা ও মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে নতুন সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চায় । যা কিছুতে ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে তাতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা উল্টো পরিণতিতে পর্যবসিত হচ্ছে। আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টা শুধুমাত্র সমাজের প্রান্ত স্পর্শ করেছে ও এর প্রধান স্রোতধারায় প্রতিষ্ঠিত হতে ব্যর্থ হয়েছে। পদ্ধতিটি ভাসাভাসা হয়ে আসছে এবং কৃত্রিম পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করছে যা নিষ্ফল প্রমাণিত হতে বাধ্য। পাশ্চাত্যের বহুসংখ্যক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান সমাজের অখন্ড অংশ হতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে এগুলোকে সমাজের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল। অধিকন্তু, পাশ্চাত্যে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে অবস্থায় উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছিল এবং যে অবস্থা সমসাময়িক মুসলিম সমাজে বিরাজ করছে তা যথেষ্ট ভিন্নধর্মী। এ ধারণা পোষণ করা উচিৎ নয় যে, পাশ্চাত্যে যা করা হয় তা অন্যত্রও করা হবে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্যের অনেক আধুনিকীকরণ আদর্শের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই ক্রমশঃ 'বিপরীত সংস্কৃতি'[৭] বলে আখ্যায়িত সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটছে এবং সমসাময়িক মুসলিমগণ বিশেষ করে মুসলিম যুবকগণ পাশ্চাত্য আধিপত্যের উপকরণ ও প্রতীক হিসেবে এগুলোকে প্রতিষ্ঠিত হতে দিচ্ছে না। মুসলিমগণ নতুন উন্নয়ন কৌশলের বিবর্তন কামনা করছে।

ইসলামে উন্নয়ন কৌশল উদ্‌ঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন কৌশল উদ্‌ঘাটনে দু'প্রস্থ প্রস্তাবনা উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রস্তাবগুলো হলো ক. আদর্শগত, খ. আর্থ-ভৌগোলিক। আমরা এগুলোকে সংক্ষেপে বর্ণনা করবো।

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনৈতিক নীতির উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে ইসলামী অর্থনীতির[৮] পুস্তকে যা আলোচনা করা হয়েছে আমরা সংক্ষেপে অর্থনীতির সে পলিসিগুলোর ওপর আলোচনা করতে চাই , যার ওপর ইসলামী বিশেষজ্ঞদের সার্বজনিন মিল রয়েছে।

ক. ইসলামী অর্থনীতির প্রাথমিক লক্ষ্য হলো মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধি করা। যেমন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি যা অর্থনৈতিক পরিবর্তন পদ্ধতিতে সকল ব্যক্তির সার্বিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

খ. ইসলাম ব্যক্তি উদ্যোগ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে এবং তার জন্য নিরাপদ ও সম্মানের জীবন নির্ধারণ করে। যেমন ঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং নতুন কিছু করার সাহসের জন্য ইসলাম সকল সুযোগের সাথে জীবন এবং সম্মানেরও সংরক্ষণ করে। এগুলোই ইসলামী অর্থনীতির আসল বৈশিষ্ট্য। সমাজের সকল সদস্যের জন্য ন্যূনতম মানবীয় প্রয়োজন নিশ্চিতকরণ ও জনগণের দারিদ্র দূরীকরণের সুস্পষ্ট শর্তই ইসলামী অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অভিন্ন অংশ।

গ. ইসলাম শুধু প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেনা, বরং ব্যক্তিগত বাস্তব পারিপার্শ্বিকতা ও সম্পদ যা আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন তার সদ্ব্যবহারের অনুমতিও দান করে। এর অর্থ এই যে, উৎপাদন নীতি শুধু পণ্য ও সেবাই উৎপন্ন করবে না বরং জনগণের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবে ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

ঘ. ইসলাম উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডের জন্য সর্বাধিক উন্মুক্ত পন্থার ওপর গুরুত্বারোপ করে যাতে আন্তব্যক্তিক ও আঞ্চলিক উভয়ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের সুষম বন্টন সুনিশ্চিত হয়। এ পদ্ধতির ব্যবহারের ওপর আরো গুরুত্বারোপ করতে হবে যাতে মানবীয় সম্পর্ক অধিকার (হক) ও ন্যায়ের (আদল) ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে এর সকল কাঠামো থেকে মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর যুলুমের অবসান ঘটায়। এর অর্থ হল, সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টন ইসলামী নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এর অপর দিকটি হলো পণ্যের দাম স্থিতিশীলকরণ এবং সুষম আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন।

ঙ. ইসলাম প্রয়োজনীয় উৎপাদন ও জীবন মানের উৎকর্ষ সাধন করার ওপর গুরুত্বারোপ করে। এটা অপচয় দূরীকরণ, বিলাসিতার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও শিষ্টাচারী জীবন পদ্ধতি উন্নতকরণ ইত্যাদি ইতিবাচক নীতি সৃষ্টি করে।

চ. ইসলাম মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তর সংহতির কাঠামোর মধ্যে মুসলিম উম্মাহর আর্থিক সামর্থ বৃদ্ধি করে এ কারণে যাতে অনৈসলামিক বিশ্বের ওপর এর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। সেজন্য মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা স্থাপন ও অমুসলিম দেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর ভিন্ন কোন পন্থা অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

উন্নয়ন কৌশলের বিবর্তনের মধ্যে ইসলামী অর্থনীতির এ উদ্দেশ্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করছে। এ প্রসংগে কতকগুলো প্রধান বিবেচ্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. সঠিক সম্পদ নিরূপণ করে কল্যাণের জন্য জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে উপস্থাপন করা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর সম্মান এবং সামর্থ অর্জনের লক্ষ্যে জনগণকে তাদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক জীবন পুনঃগঠনে উদ্যমী প্রচেষ্টা চালানোয় অনুপ্রাণিত করতে হবে।

২. দেশের সকল অংশ থেকে দারিদ্র ও মালিন্য উৎখাত এবং জনগণের জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বাধিক অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। প্রবৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার, উৎপাদন ও সম্পদের বন্টনের মধ্যে নব উদ্ভাবিত সমীকরণের ভিত্তিতে আপত্তিসমূহের সমাধান করতে হবে। আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে দেশের সকল অঞ্চল ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. জনগণের মূল সমস্যা ও প্রয়োজন নির্ণয় এবং এগুলোর সমাধানের জন্য কর্মসূচী ও পরিকল্পনার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। সম্পূর্ণ কাল্পনিক পদ্ধতির চেয়ে সমস্যা সমাধানমূলক পদ্ধতি আমাদের জন্য অধিকতর প্রযোজ্য হবে। অর্থনীতির সামষ্টিক মডেলের পরিকল্পনা ব্যষ্টিক লেভেলের সাথে যোগ করা হয় এবং এগুলো বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য অত্যাবশ্যক উপকরণ। জনগণের প্রকৃত প্রয়োজনের নিরিখে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করতে হবে। তাছাড়া জনগণের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর আগ্রহ অবশ্যই যাতে আমাদের দেশের মূল উন্নয়নের প্রতি বিস্মৃতিপরায়ণ না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এর ওপর একটি ব্যাপকভিত্তিক টেকসই কাঠামোর অর্থনীতি গড়ে ওঠা উচিৎ। এর অর্থ হলো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য উৎপাদন এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন ও আবিষ্কারের সামর্থ লাভের ওপর গুরুত্বারোপ। জাতির অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে এসব পণ্যের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা শুধুমাত্র আমদানী বিকল্পের ওপর গুরুত্বারোপ নয়।

৪. মানব সম্পদ উন্নয়ন অবশ্যই উচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া দরকার। এটা উপযুক্ত শিক্ষা, জনশক্তিকে অধিকতর কর্মে নিয়োগ, চাকরি ও পূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করবে। এটা আরো ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্প এবং দেশের পরিকল্পনা প্রচেষ্টার মধ্যে যথোপযুক্ত সমন্বয় সাধন করাকে উৎসাহ দান করবে।

৫. বহির্বিশ্বের বিশেষ করে পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে নিজেদেরকে আত্মনির্ভরশীল করা এবং মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বৃহত্তর সহযোগিতা ও সমন্বিত অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়ারও প্রয়োজন রয়েছে।

৬. মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং শক্তিশালী শিল্প ও প্রযুক্তিভিত্তিক কাঠামো নির্মাণের ওপর জোর দিতে হবে।

www.pathagar.com

এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে একটি নতুন পরিকল্পনা কৌশলের উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং পুঁজি গঠনকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ এর গুরুত্ব পাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু নতুন মডেলে এটা উৎসাহব্যঞ্জক হবে না। মানবীয় উদ্বুদ্ধকরণ ও অংশগ্রহণ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, কল্যাণমূলক কার্যক্রম থেকে উৎসারিত ফল, যথোপযুক্ত প্রযুক্তি এবং নতুন কিছু প্রবর্তনের ভূমিকা এ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে গণ্য হবে। পুঁজির ভূমিকা নির্ণয় করার জন্য কেবলমাত্র উন্নয়ন হারের এবং প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবৃত্তির প্রেক্ষিতে পরীক্ষা করা হবে না, উপরন্তু বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য ও বিভিন্ন প্রযুক্তি মিশ্রিত সম্পর্কের আলোকে বিচার করা হবে যা স্বল্প পুঁজি–উৎপাদন হার এবং ভোগ ও উৎপাদনের বিভিন্ন আনুপাতিক হারের মধ্যে নিহিত। নিম্ন পর্যায়ে, বিশেষ করে বিভাগ, জেলা, শহর এবং গ্রাম পর্যায়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সুশৃঙ্খলভাবে এগুলো প্রকাশ করার জন্য প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পনার উপকরণাদি শুধুমাত্র শীর্ষেই আনুভূমিক অস্তিত্ব লাভ করবে না, বরং এটা খাড়া রেখার মধ্য দিয়ে নিম্নস্তরে পৌঁছেও কাজ করবে। উন্নয়ন পদ্ধতিতে জাতির পূর্ণ অংশগ্রহণ দ্বারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সংযুক্ত করে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি কার্যকর বাধ্যবাধকতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

আর্থ-ভৌগোলিক প্রস্তাবসমূহ

আমরা আদর্শগত বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কেবলমাত্র আদর্শগত দিকের ওপরে একটি উন্নয়ন কৌশল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর্থ-ভৌগোলিক অবস্থার সাথে সম্পদ-বুনিয়াদ, উপাদানের গুণগত অবস্থা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে এগুলোর বৈশিষ্ট্যের সম্পৃক্ততাও থাকে। সব মুসলিম দেশই উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিজয়ের ফলে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। এ অবস্থা থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মুসলমানগণ পরিত্রাণ পেতে সক্ষম হয়। একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা এখন শুধু প্রচেষ্টা দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে যা পরিণামে একমাত্র গ্যারান্টি হবে। ইসলামী জীবন বিধান এবং বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা, মুসলমানদের আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন জাতীয় সত্তা ও অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচার জন্য অন্যান্য সকল মুসলিম জাতি এক সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

এলাকার সম্পদের প্রধান উপাদান, কেন্দ্রীভূত এলাকাসমূহে উচ্চ কৃষিজ উৎপাদন, খনিজ সম্পদ, শক্তির বিভিন্ন রকম সমৃদ্ধ ভান্ডার, কেবলমাত্র গ্যাস এবং তৈলই নয়, অধিকন্তু কয়লা ও জলবিদ্যুতের ন্যায় সম্ভাবনাময় সম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পদের উপাদানগুলো পরিমাণগতভাবেই যথেষ্ট নয়, গুণগতভাবেও এত সমৃদ্ধ যে প্রচুর মেধা পাচার হওয়া সত্ত্বেও মানবীয় পুঁজি এবং প্রযুক্তিকে উন্নয়নশীল মুসলিম দেশ থেকে উন্নত বিশ্বে উল্টোভাবে স্থানান্তর করা হচ্ছে। বহু দেশ তাদের প্রযুক্তিগত

www.pathagar.com

প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি এতবেশী পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে যা আধুনিকতার চরম উৎকর্ষে তাদেরকে প্রবেশ করার ক্ষমতা প্রদান করছে। যেমন ঃ পরমাণু শক্তি, ইলেকট্রনিক্স, আবহাওয়া বিদ্যা ইত্যাদি।

দেশগুলোতে সম্পদের উপাদান এত বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে যে, প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকে অতি উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে, যদিও মুসলিম দেশের বর্তমান বাণিজ্যিক লেনদেন সীমিত। ১৯৭২ সালে তাদের মোট রফতানী শতকারা ৪.৫ এ পৌঁছে। তার মধ্যে কয়েকটি দেশের সাধারণ চিত্র হল অতি উন্নতমানের তৈল উৎপাদন এবং রফতানী ক্ষেত্র। দেশগুলো হলো ঃ সংযুক্ত আরব আমীরাত, কাতার, সউদী আরব, কুয়েত, ওমান ও লিবিয়া। তাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হল বিভিন্ন রকম শিল্প প্রতিষ্ঠা করা, যদিও তাদের কৃষি ক্ষেত্রগুলো এখনও দুর্বল। তাদের প্রধান সম্পদের অভ্যুদয় ঘটে ১৯৭৪ সালের বাস্তবভিত্তিক তেলের মূল্যের সমন্বয়ের সময় হতে যখন নিজ দেশ ও বহির্বিশ্বে বিনিয়োগের জন্য উদ্বৃত্ত পুঁজি প্রাপ্তি সম্ভব হয়। দুঃখজনক ঘটনা হল, এ বিনিয়োগকৃত অর্থের সিংহভাগ শিল্পোন্নত দেশের মূলধনের বাজারে বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশে বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বে বাস্তবে ও সরাসরি এ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়নি।

আবার ভিন্ন প্রকার তেল রফতানীকারক উন্নয়নশীল দেশও রয়েছে, যেখানে খনিজ শিল্প (প্রচুর পরিমাণে তেল নিষ্কাশন করা হয়) প্রধান রফতানিমুখী খাত সৃষ্টি করলেও কৃষি ও শিল্প অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের। উদাহরণ স্বরূপ, ইন্দোনেশিয়ায় প্রচুর তেল উৎপাদনমূলক খাত থাকা সত্ত্বেও খনিজ সম্পদ থেকে এর জিডিপি-এর পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ। কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন যথাক্রমে ২০ ও ১০ ভাগ। এসব দেশ উন্নয়নের জন্য সম্পদের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম। তাদের প্রধান প্রয়োজন হল প্রযুক্তি ও মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতা বৃদ্ধি।

তৃতীয় প্রধান গ্রুপ ঐসব দেশ নিয়ে গঠিত যাদের খনিজ সম্পদ ততটা উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তারা কৃষি জাতীয় কতকগুলো প্রাথমিক উৎপন্ন দ্রব্যের রফতানীকারক। আবার তারা অভ্যন্তরীণ বাজার ও রফতানীর জন্য শিল্পক্ষেত্রেও বিভিন্ন মাত্রায় অগ্রগতি সাধন করে চলেছে। সেই দেশগুলো খুব বেশী প্রাথমিক কৃষিজ রফতানীর ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের শিল্প খাতও সীমিত। তারা হলো ঃ চাদ, মালী, গিনি, সোমালিয়া, সুদান, উগান্ডা, আপারভোল্টা, নাইজার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী আরব ইয়েমেন। এ গ্রুপে অন্য কতকগুলো দেশ রয়েছে যারা প্রাথমিক কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য রফতানী করে যাচ্ছে এবং মোট রফতানীতে শিল্পজাতীয় দ্রব্যাদির চেয়ে শতকরা উচ্চ হারে লাভ করছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আফ্রিকার মিসর ও সিয়েরা লিওন এবং এশিয়ার লেবানন, তুরস্ক, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ। এসব দেশের প্রধান সম্পদ হল বিপুল জনশক্তি। ব্যাপক অভ্যন্তরীণ বাজারের সাথে এগুলো মেধা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়নের সহায়ক। তাদের প্রধান সমস্যা হলো পুঁজি প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা এবং তার সাথে শিল্প পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ মাথাপিছু আয় ও উন্নয়নের জন্য সঞ্চয় সৃষ্টির সমস্যা।

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক উপাদানের প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের বস্তুগত এবং মানবীয় সম্পদের উন্নয়নের যেকোন কৌশল পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত আত্মনির্ভরশীলতার ওপর নির্ভর করছে। এটা কেবলমাত্র একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজনই নয় বরং ইসলামী ছাঁচে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের জন্য অপরিহার্যও বটে। এটা মুসলিম দেশের অন্যতম অর্থবহ উন্নয়ন কৌশল। ইসলামী বিশ্ব যদিনা আত্মনির্ভরশীলতার ওপর ভিত্তি করে উন্নয়ন লক্ষ্যে কাজ করে, তবে এর যেকোন একটি প্রধান প্রভাবশালী অর্থনৈতিক দর্শনের শিকার হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

মুসলিম দেশের এ বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করে ধরে নেয়া যায় যে, ইসলামী ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন কৌশলের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক থাকবে। একটি আদর্শিক বনাম অর্থনৈতিক দিক যা অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বাধিক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে এবং ইসলামী আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। দ্বিতীয় দিক হল ঃ মুসলিম দেশসমূহ ও তাদের সংগঠনের উপ-দলের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন এবং তা হবে ভৌগোলিক সাদৃশ্য, অর্থনৈতিক সম্ভাষণ এবং রাজনৈতিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে। এ উপ-দলগুলো সমস্ত মুসলিম বিশ্বের বড় বড় দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এ দলগুলো প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর মধ্য দিয়ে চেষ্টা করবে যা বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। মুসলিম বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত অধিকতর ন্যায়ভিত্তিক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে উপরিউক্ত সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতা করতে হবে।

উন্নয়নের বিকল্প কৌশল

আমরা এখন আলোচনা সংক্ষিপ্তকরণের পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। পূর্বে আলোচিত প্রস্তাবাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন কৌশলের কতিপয় প্রধান বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবন করা হয়েছে যা পূর্বেই নির্দেশিত।

১. মুসলিম সমাজ এবং সংস্কৃতির ভিত্তি থেকে সমন্বিত উন্নয়ন, মানুষের উন্নয়ন এবং সমাজের বিবর্তনের ওপর মোটামুটি জোর দেয়া হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এ প্রক্রিয়ার অখন্ড অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটাকে সমাজের আদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ থেকে পৃথক করে দেখার উপায় নেই। আদর্শ, উদ্বুদ্ধকরণ, ভাষা ও পরিবর্তনের উপায়সমূহে দেশীয় আস্বাদ থাকবে এবং জনগণের জন্য ভিন্ন ধরনের তাৎপর্য বয়ে আনবে, যা উন্নয়ন কৌশল কর্তৃক প্রবর্তিত পাশ্চাত্য উন্নয়ন মডেলের ধাঁচে গড়ে তোলা হয়েছে।

www.pathagar.com

২. মৌলিক প্রয়োজন এবং স্বাচ্ছন্দ্য যা দক্ষতার সহায়ক, উৎপাদন এবং ভোগের ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আবশ্যক ও অনাবশ্যক পণ্যাদির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকতে হবে। বিদ্যমান পাশ্চাত্য জীবন প্রণালী অনুকরণের পরিবর্তে মুসলিম জনগণের জীবন প্রণালীর উন্নয়ন ও বিবর্তনে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৩. সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস এবং বৃহত্তর ঐক্য স্থাপনও অগ্রাধিকার পাবে। সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়ন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, শহরভিত্তিক শিল্পায়ন বিরাট গণআন্দোলনের সৃষ্টি করে। সে জন্য অপরিকল্পিত শহরায়নকে প্রতিহত করতে হবে।

৪. মৌলিক শিল্পের উন্নয়ন স্বাধীন প্রযুক্তিগত ক্ষমতা সৃষ্টির এবং যথোপযুক্ত প্রযুক্তির সামর্থ উদ্ভাবনে নিশ্চয়তা বিধান করে। নির্ভরশীলতার রীতি অর্থাৎ যেখানে মুসলমানগণ জড়িত হয়ে পড়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসা অত্যাবশ্যক।

৫. মুসলিম বিশ্ব ও এর উপ-গ্রুপগুলোর এবং অবশিষ্ট তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে আত্ম-নির্ভরশীলতা ও বৃহত্তর সহযোগিতা স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে।

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন তাদের প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। এটা সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে পরিষ্কার যে, মুসলিম বিশ্বের প্রধান সম্পদের সদ্ব্যবহার এভাবে হওয়া উচিত যা মুসলিম উম্মাহকে সম্মিলিত আত্মনির্ভরশীলতার শক্তি প্রদান করে। বর্তমানে কতিপয় ইসলামী দেশের উদ্বৃত্ত, যা তারা লেনদেনের ভারসাম্য থেকে উপার্জন করে, পাশ্চাত্য বিশ্বের মূলধনের বাজারে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। পুঁজি উদ্বৃত্তের দিক থেকে ইসলামী দেশগুলো এরূপ বিনিয়োগে সাহস করছে না। তাদের শক্তিশালী মুদ্রা রয়েছে এবং তারা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করছে ও বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের সঠিক মূল্য রক্ষণাবেক্ষণে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে। এরূপ দেশের লেনদেনের ভারসাম্যের ঘাটতি নেই এবং এখানে মূলধনের আন্তঃপ্রবাহ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। এভাবে তাদেরকে দুর্বল মুদ্রায় মূলধন বিনিয়োগে বলপূর্বক বাধ্য করা হচ্ছে। তাদের মুদ্রাস্ফীতির হার লেনদেনের ভারসাম্যের ঘাটতি এবং মুদ্রার আশাব্যঞ্জক মূল্যকে আতঙ্কগ্রস্ত করছে। এটা রিবার (সুদ) ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকৃতির এমন স্পষ্ট নিদর্শন যে, সুদের উপার্জন এরূপ বিনিয়োগের ওপর আকর্ষণীয় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হল এ পন্থায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর নেতিবাচক ফল হতে পারে। উদ্বৃত্ত তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো তাদের বিনিয়োগের ওপর আরো অধিক ভাল ফলাফল নিশ্চিত করে স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নিজদের রক্ষা করতে পারে, যদি তারা বিনিয়োগের স্থান ও বিনিয়োগে বৈচিত্র আনতে পারে। বিনিয়োগের অধিক গুরুত্ব দিতে বা প্রকৃত সম্পদের অংশীদারিত্বের ওপর আরো অধিক মনোযোগ দিতে পারে। অপরপক্ষে, কেউ কেউ বিদেশ থেকে প্রধান মূলধন প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে, প্রকৃতপক্ষে যেখানে কোন উদ্বৃত্তই নেই, অথচ তারা তারই ওপর ভরসা করছে। পাশ্চাত্যের সরকারী সাহায্য ও বাণিজ্যিক ঋণ উভয়ই পুঁজি সংগঠনের প্রধান

www.pathagar.com

মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে এবং এ পুঁজিকেই মুসলিম দেশগুলোর প্রকৃত সঞ্চয় হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। প্রতারণামূলক সাহায্যের সুবিধা গ্রহণ থেকে মুসলমানদের সরে থাকা উচিত যার ব্যবহার উন্নয়নের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার সাথে বাঁধা। ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্ব, আত্মনির্ভরশীলতা কাঠামোর উন্নয়ন এবং গৃহীত কর্তব্যের অলঙ্ঘনীয়তার নিশ্চয়তা প্রদান ও তাদের পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ আরো বেশী প্রয়োজন। মূলধন-উদ্বৃত্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রগুলোকে ভালভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন, যা পশ্চিমী মূলধন বাজারের চলমান মাধ্যম খোঁজ করা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির ক্ষেত্রে নতুনত্ব আবিষ্কার করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করছে। এতে ইসলামী বিশ্বে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের গ্যারান্টি পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রধান ক্ষেত্র হল জনশক্তি সম্পদ, মেধার সদ্ব্যবহার এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে সম্মিলিত উন্নয়ন। যে দেশগুলোর বিরাট জনসম্পদ রয়েছে তাদের পুঁজির পরিমাণ খুবই সীমিত। মুসলিম দেশ বর্ধিত মূলধন দিয়ে সম্পদ প্রাপ্তির সাথে কর্মসংস্থানের অভাব এবং বেকারত্বের সমস্যাও মুকাবিলা করছে। অপেক্ষাকৃত স্বল্প জনসংখ্যার ও বোধগম্য এইরূপ স্পৃহার মূলধন উদ্বৃত্ত দেশের পক্ষে তাদের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক নৈকট্যবোধের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম দেশগুলোর ভিতর শ্রমিক চলাচল অনিবার্য করে তুলছে। একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এত বিশাল চলাচল হতাশার সৃষ্টি করেছে যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। স্বাগতিক দেশ ও যেখান থেকে এ চলাচল সংগঠিত হচ্ছে এমন উভয় দেশের জন্যই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। পরিণামে, মানবীয় সম্পর্কে ভাঙ্গন যা ব্যাপকভাবে জনগণের দেশান্তর গমনের সাথে জড়িত হচ্ছে। তার দিকে তেমন দৃষ্টি না দিয়ে যদি শ্রম উদ্বৃত্ত দেশে অধিক পুঁজি ব্যয় করা যায় তাহলে সেটাই হবে অধিক যুক্তিযুক্ত ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন। মুসলিম দেশগুলোতে বর্ধিত অংশদারিত্বের মধ্য দিয়ে মূলধন প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয় -এর পারস্পরিক স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন অংশে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরো মঙ্গলজনক ভৌগোলিক ভারসাম্যের সৃষ্টি করবে এবং এভাবে ব্যাপক দেশান্তর গমন প্রতিহত করা যাবে।

দক্ষ জনশক্তির অধিকতর বাছাইকৃত গমনাগমন সংখ্যার দিক থেকে সীমিত করতে হবে যা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। মুসলিম বিশ্বের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে পারস্পরিক বৃহত্তর কর্মকান্ড সৃষ্টির জন্য এটাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। ইসলামী বিশ্বের অভ্যন্তরে বিশেষজ্ঞদের উৎপাদনশীল অবদানের জন্য গবেষণা এবং শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে পরিসীমার এরূপ বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা উচিত। তার সাথে বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষানবিশদের মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা বিনিময় কর্যক্রমের জন্য মূলধন সৃষ্টি এবং ভাষাগত বাধা হ্রাস করা বাঞ্ছনীয়। ইসলামী বিশ্বে যেহেতু বিশেষজ্ঞগণের জন্য ক্ষেত্রটি প্রসারিত হচ্ছে ও আরো অধিক লাভজনক ভূমিকার জন্য অবস্থা এবং পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, সেহেতু উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তির পাশ্চাত্যের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের দিকে ধাবিত হওয়ার বর্তমান প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ

www.pathagar.com

করা যাবে। বিশ্বের অন্যান্য অংশে উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বৃহত্তর সমতার সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। তবে এটা অর্থপূর্ণ প্রযুক্তি স্থানান্তরে সহায়ক হবে না বরং আরো বড় নতুন কিছু আবিষ্কার ও গবেষণায় সহায়ক হবে যা উন্নয়নশীল মুসলিম দেশগুলো এবং পৃথিবীর এ অংশে বিদ্যমান বিশেষ সমস্যাকে আরো সংকুচিত করবে।

তৃতীয়ত মুসলিম বিশ্বের সম্মিলিত আত্মনির্ভরশীলতার জন্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেয়া অত্যাবশ্যক। যে অঞ্চলের স্থল ও জলভাগে মূল্যবান সম্পদ রয়েছে সে অঞ্চলকে সমস্ত এলাকার জন্য খাদ্য উৎপাদনে যথোপযুক্তভাবে উন্নত করা যেতে পারে। পানি সেচের সম্ভাবনার উন্নয়ন, আধুনিক খামার ব্যবহারের অভ্যাসকে উৎসাহ দান এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ উৎপাদনের জন্য শিল্প স্থাপনে আরো বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রয়োজনীয় এলাকায় বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া দরকার। খাদ্য উৎপাদনের ন্যায় উন্নয়নকে উপেক্ষা করলে তা হবে সেই এলাকার জন্য বিপজ্জনক। যে এলাকাগুলোতে শক্তি সম্পদের ঘাটতি আছে সে ঘাটতি পূরণের জন্য বিশ্বব্যাপী হতাশাব্যঞ্জক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে খাদ্য সম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তাকে মোকাবেলা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

পরিশেষে, মুসলিম বিশ্বের শিল্পায়ন প্রচেষ্টায় বৃহৎ মার্কেটকে স্পষ্ট স্বীকৃতিদানের ওপর ভিত্তি করে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যা বিশেষীকরণের নির্ধারিত এলাকাগুলোর মাধ্যমে অর্জন করা যাবে। শিল্পায়ন প্রচেষ্টার উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেই তা অর্জিত হবে।

অনেক মুসলিম দেশ শিল্পক্ষেত্রে উন্নতির কেন্দ্র সৃষ্টিতে সফলতা লাভ করেছে। মুসলিম বিশ্বের সর্বমোট উৎপন্ন দ্রব্যের ৪২% বাহরাইন, তুরস্কে ১৯% এবং ০% ওমানে জন্মে। যা হোক, প্রায় সব মুসলিম দেশই উৎপাদনকারী শিল্প উন্নয়নের প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে রয়েছে। প্রধান পণ্য শিল্পে আত্মনির্ভরশীলতার যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু সম্মিলিত আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সন্তোষজনক পর্যায়ে উপনীত হতে অনেক বৃহত্তর প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। প্রধান শিল্পের মধ্যে একটি শিল্প বিভিন্ন প্রকার শিল্পসংক্রান্ত এবং নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যকলাপের উন্নয়নের ওপর প্রভাব রাখে। আর তা হল লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। ইসলামী দেশের মধ্যে কেবল কয়েকটি দেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদন করে অথবা এরূপ উৎপাদন শুরু করার জন্য সব সময় পূর্ব-পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO) ইস্পাতের ওপর একটি গবেষণায় আলজেরিয়া, মিসর, গ্যাবন, লিবিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া, ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, সউদী আরব এবং তুরস্ককে বিশেষভাবে নির্দেশ করে। উল্লিখিত দেশগুলো এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ লাভ করেছে। লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প, ইস্পাতভিত্তিক শিল্প ও রাসায়নিক শিল্পের প্রসারমান উন্নতি, সহযোগিতামূলক বন্দোবস্ত এবং বিভিন্ন এলাকার ভেতর

www.pathagar.com

প্রযুক্তিগত উন্নতি হতে প্রয়োজনীয় মূলধন চলাচলের ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্যের বাজারের সীমা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

মুসলিম বিশ্বের জনসম্পদ ও মূলধন কার্যকরীকরণ কৌশলের একটি বিশেষ দিক হল প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা এবং মুসলিম বিশ্বের স্বাতন্ত্র্যের উন্নতি। আধুনিক বিশ্বে প্রযুক্তির উৎস ও সরঞ্জামের ওপর ভিত্তি করে কোন অর্থবহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কারণ এগুলো ব্যবহারকারীদের নিকট দুর্লভ। এমন কি লাইসেন্স ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন খুব বেশী হলে কেবল প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই তাকে গণ্য করা যেতে পারে। প্রযুক্তির এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে যে, বাইরে থেকে ধারকৃত আজকের প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টির যে কোন প্রচেষ্টা এবং এ সময়ের মধ্যে যা কিছু উৎপাদন সম্ভব তা পরবর্তীতে সেকেলে বলে গণ্য হয়। প্রযুক্তিগত ভিত্তির এমন উন্নয়ন প্রয়োজন যা পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও নতুন আবিষ্কারের পাশাপাশি টিকে থাকতে পারে।

মুসলিম বিশ্বের মানবীয় ও জাতীয় সম্পদ উন্নয়নের জন্য এ বিরাট এলাকার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণের কৌশলে বাস্তব নীতির প্রয়োগ প্রয়োজন। আমাদের শক্তি সম্ভাব্য এলাকার সম্পদের বৃহৎ উপাদানগুলোর মধ্যে নিহিত তা কেবলমাত্র পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই কাজে লাগানো যেতে পারে। দ্রুত সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান উপাদান মুসলিম বিশ্বের আয়ত্তের ভিতর রয়েছে। মেধা ও প্রতিভার অভাবে নয় বরং এ মেধা এবং প্রতিভার উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য যে পরিবেশ দরকার, তা আজো সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিতে এলাকাটি সবচেয়ে বেশী দুর্বল। আমরা বর্তমানে যে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছি তা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গৃহীত পদ্ধতি থেকে অর্জিত ফলটি তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্র ঃ

১. সব মিলিয়ে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১২৫০ মিলিয়ন। তিন ভাগের এক ভাগ মুসলমান এখনো অধিকৃত এলাকায় অথবা অমুসলিম দেশে সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করছে। দেখুন *"The Muslim World Gazetteer"* (করাচী, ওমরা প্রকাশনা, ১৯৭৫) ঃ এবং এম এম আহসান ঃ *Islam: Faith and Practice* (লাইসেস্টার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৭)।

২. গত দু'দশকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিল্পায়নের জন্য গৃহীত পদ্ধতিগুলোর মৌলিক উদ্দেশ্যাবলীকে নতুন করে দেখার জন্য গুরুত্বারোপ করতে হবে। শিল্পায়নই চরম বা শেষ উদ্দেশ্য নয়, এটা মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে আরেকটি উপায় মাত্র। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত উন্নতি যদি প্রত্যাশার চেয়ে কম হয়ে থাকে, উত্তরটি এ হতে পারে যে, এ উদ্দেশ্যাবলীর দৃষ্টিসীমা হারিয়ে গেছে এবং ফলে যে নীতি ও উপায় অবলম্বন করা হয়েছে উদ্দেশ্যাবলীর সাথে তার সমন্বয় সাধন করা হয়নি। "উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য জাতিসংঘের কমিটি :

www.pathagar.com

Industrialization for New development needs, নিউইয়র্ক জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনীতি বিষয়ক বিভাগ ১৯৭৪/পৃষ্ঠা-৮

৩. খুরশীদ আহমদ ঃ *"Economic Development in an Islamic Framework"* এবং জাফর ইসহাক আনসারীর প্রকাশনাসমূহ *Islamic perspectives studies, in honour of Sayyid Abul `Ala Moudoodi)* (লাইসেস্টার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৯), পৃঃ ২২৬-২২৭ এবং টীকা ৯-১৬ পৃঃ ২৩৭-২৩৮।

৪. তৃতীয় বিশ্বের সংকটাবস্থার আরও বিস্তারিত বর্ণনার জন্য খুরশীদ আহমদের "*Third* world's dilemma of Development"দেখুন, *Non-Aligned Third World Annual* সেন্ট লুইস (মিসৌরী), বুকস ইন্টারন্যাশন্যাল অব ডি এইচ টি ই ইন্টারন্যাশনাল, (১৯৭০)। পৃঃ৩-১৮।

৫. খুরশীদ আহমদ ঃ "A Muslim Response" জে গ্রামিলিয়ন ও অন্যান্য (সংস্করণসমূহ) Interfaith plan Colloquim (ওয়াশিংটন, পারস্পরিক বিশ্বাস পরিকল্পনা কথোপকথন, ১৯৭৮।

৬. ডব্লিউ ডব্লিউ রস্টো ঃ The stages of Economic Growth এবং রস্টো (প্রকাশন)। *The Economics of Take off into sustained growth* (লন্ডন, ম্যাকমিলন, ১৯৬৫), আরও দেখুন, C.E. Blach *Q: The dynamics of Modernisation* (NY., 1966).

৭. পোলস্ট্রিটন লিখেছেন ঃ সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠান ও মানের স্থানান্তরণটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই যে, এগুলো জনগণকে হতাশ করে আসছে এবং প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে বা আরো জটিলতর করছে। পাশ্চাত্যের প্রতি কোন বিদ্বেষ ছাড়াই যুক্তি যে, সকল মডেল বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং বাস্তব বিন্যাসে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে যা প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণ পৃথক সংস্কৃতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে না অথবা কেবলমাত্র কিছুর বিনিময়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রাথমিক ও বর্তমান উভয় অবস্থাতেই পার্থক্যগুলো পৃথক জবাব দাবি করে যদিও নতুন উন্নত অর্থনীতির ইতিহাসে স্পষ্টভাবেই কিছু পাওয়ার আছে। পোলস্ট্রিটন ঃ *"Alternatives in Development" in World Development.* খন্ড-২, নং-২, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭, পৃঃ ৬।

৮. দেখুন, এনসাদর এবং এম এম বাকর ঃ *Iqtisaduna* (বৈরুত, ১৯৬৮) আবুল আ'লা মওদুদী ঃ ইসলামী নিজামী-ই-মায়াশাতকে উসুল আওয়ার মাগাসিদ; মওদুদীর (প্রকাশনা) মা'শিয়াত-ই ইসলাম (লাহোর, ইসলামিক প্রকাশন, ১৯৬৯) পৃঃ ১৪১-১৬৪, এম উমর চাপরা ঃ *Economic System of Islam* (লন্ডন, ১৯৭০) এস এন এইচ নাকভী ঃ *"Ethical Foundation of Islamic Economics" in Islamic studies* খন্ড ১৭, নং ২। গ্রীষ্ম, ১৯৭৮, খুরশীদ আহমদ ঃ "Economic Development in an Islamic Framework" উল্লেখিত গ্রন্থ পৃঃ ২২৩-২৪০।

---

www.pathagar.com

আলোচনার সংক্ষিপ্তসার

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বও পাশ্চাত্য উন্নয়ন কৌশলের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেকটাই নিরাশ হয়ে পড়েছে। গত তিন দশকের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রয়োগের পর এটা সুস্পষ্ট যে "উন্নয়ন" এর স্বার্থে স্থানীয় সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থার ওপর পাশ্চাত্য মডেল ও জীবনধারা চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস সফল হয়নি, অবশ্য কিছু কিছু দেশে এবং কোন কোন খাতে পাশ্চাত্য মডেল প্রয়োগের ফলে খানিকটা বর্দ্ধিত প্রবৃদ্ধি সাফল্যের আশা সঞ্চার করেছে। আজ এটা স্পষ্ট যে, এ সাফল্য যতোটা না বাস্তব তার চেয়ে বেশী কাগুজে এবং এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে যে পরিমাণ অপসংস্কৃতির বিকাশ ও সামাজিক অস্থিরতার জন্ম হয়েছে তা জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণকে অনেকটাই আচ্ছন্ন করেছে। সহজ ভাষায়, উন্নয়নের পাশ্চাত্য মডেলকে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশই একদিকে যেমন আত্মস্থ করে নিতে পারেনি অন্যদিকে এগুলো তাদের পরনির্ভরশীলতাও কমায়নি। অনেকগুলো মুসলিম দেশে সমসাময়িক পুনর্জাগরণকে বর্তমান সাধারণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অধিকতর অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ এবং নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে একবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার একটি প্রয়াস হিসেবে দেখা যেতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিক অধীনতা মুক্ত হয়ে বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এখন বুদ্ধিবৃত্তিক, আদর্শগত, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌঁছেছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে পাশ্চাত্য কৌশল ব্যর্থ হওয়ায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে উন্নয়ন প্রয়াসের একটি ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মধ্যে ভেদরেখা টানার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও উন্নয়ন কর্মসূচীর একত্র সহাবস্থান হতে পারে না। কিছু কিছু উন্নয়ন তাত্ত্বিকের এহেন মন্তব্য সত্ত্বেও বর্তমানে বেশ জোরের সংগেই শোনা যাচ্ছে যে, জনগণের নিজ নিজ সাংস্কৃতিক উৎসই উন্নয়নের ভিত্তি হওয়া উচিত। সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে আর্থ-সামাজিক নীতি কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, বরং প্রথমোক্তটাই শেষোক্তটার উৎস এবং বাস্তবায়ন ক্ষেত্র। আর সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে ধর্মের স্থান অবশ্যই থাকতে হবে।

তা সত্ত্বেও দেখা যাবে যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর সাম্প্রতিক আলোচনার সামাজিক সাংস্কৃতিক দিকগুলোকে কমই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।এ সিম্পোজিয়ামে কয়েকজন বক্তা উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি যেসব উন্নয়ন কৌশল আলোচিত হচ্ছে (নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবসহ) সেগুলো পুঁজিবাদী বিকাশ মডেলের সামান্য পরিবর্তিত সংস্করণ ছাড়া কিছু নয়। এখন পর্যন্ত এসব আলোচনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হচ্ছে। আধ্যাত্মিক ও

www.pathagar.com

পার্থিব জীবনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অংশগ্রহণকারীরা প্রবলভাবে অনুভব করেন যে, এ ধরনের স্বতন্ত্রীকরণের ইতি টেনে নতুন একটা উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন, যা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপাদানকে খাটো করে দেখবে না। এজন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক আলোচনায় পাশ্চাত্য মডেলের আধিপত্য অপসারণ করে ধর্মীয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ঐতিহ্যকে স্থান দেয়া।

আশা করা হয় যে, এ সিম্পোজিয়াম জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সামাজিক নীতি নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণে বিশ্বের একটি প্রধান ধর্মের সম্ভাব্য অবদান সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা সংশোধনের প্রথম প্রয়াস হিসেবে কাজ করবে। অতএব, এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী চিন্তাধারার প্রচার যাতে একটা বৈষম্যহীন ও প্রাচুর্যময় নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সামাজিক নীতি প্রণয়নে এ চিন্তাধারা আরো বেশী গুরুত্ব লাভ করে।

ইসলামী সংস্কৃতি

ভিত্তি ও ভবিষ্যত

একটা ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম এবং একটা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা নির্মাণে এর অবদান বিচার করার আগে বিশ্বের এ প্রধান ধর্মটি যেসব মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ইসলামের ঐতিহাসিক বিবর্তন একটু সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলেই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলোর মধ্যে সবসময় বিদ্যমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে মানব অস্তিত্বের সমস্ত দিক ও বিভাগের ঐক্যবোধ। ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের এমন কোন দিক নেই যা ঈমানের সাথে সম্পর্কহীন। বলা হয়েছে যে, প্রকৃত অর্থে ইসলামে তাওহীদ, ইহজাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোন বিভাজন নেই। মানব অস্তিত্বের প্রতি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণের আহবান জানায় এবং এটি মানবজাতির কল্যাণ অভিসারী। একই সাথে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সাফল্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি হিসেবে ইসলাম ঈমানের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করে।

কুরআন ও শরীয়াহ হচ্ছে ইসলামের জাগতিক ও আধ্যত্মিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্ত বিষয়ের মূল ভিত্তি। সুতরাং একটা সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে বুঝবার যে কোন প্রচেষ্টাই এ দু' মূল স্তম্ভ থেকে শুরু হতে হবে। বলা হয়েছে যে, কোরআন এবং হাদীসে মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণ সম্পর্কে প্রদত্ত নির্দেশাবলী বাইবেলের চাইতে অনেক বাস্তব, বিশদ ও ব্যাপক। অধিকন্তু, ইসলামী ফিকহশাস্ত্র

www.pathagar.com

অনুযায়ী আইনই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজ আইন তৈরী করতে পারে না। শরীয়াহ'র পরিধি পাশ্চাত্য আইন শাস্ত্রের চেয়ে অনেক অনেক ব্যাপক। কেননা ব্যক্তির নৈতিকতা, অন্যান্য ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক সবই এর আওতাভুক্ত। যাহোক, কয়েকজন অংশগ্রহণকারী বলেন যে, যদিও কোরআন, সুন্নাহ ও হাদীসের উৎস সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং এগুলোর কর্তৃত্ব চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাঁরই তবুও এসব উৎসের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান এবং রাসূলের ওফাতের পর থেকে এগুলোর ব্যাখ্যা মানুষের হাতে ন্যস্ত, যারা সীমিত জ্ঞানের অধিকারী। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান এগুলোর ব্যাখ্যা নিয়ে মতদ্বৈততার জন্ম দিয়েছে। তা সত্ত্বেও, ইসলাম ধর্মের মৌল বিশ্বাস ও ঐতিহ্য মুসলিম জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত।

ধর্ম, বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ সাধারণভাবে একমত হন যে, আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিকতার অবিভাজ্যতার নীতি এখানেও সুপরিস্ফুট। কয়েকজন বক্তা জোরের সাথে উল্লেখ করেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ থাকার কথা ইসলামের বেলায় একেবারেই অপ্রযোজ্য। খ্রীষ্টান চার্চের মত ইসলাম কোন জায়গাতেই বিজ্ঞানকে বৈরী হিসেবে গ্রহণ করেনি। কার্যত বহু বক্তা উল্লেখ করেন যে, ইসলাম মানুষের মধ্যে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং জ্ঞান অর্জন ও এর বিকাশকে উৎসাহ দান করে। কোরআন এবং হাদীসের বহু জায়গাতেই স্পষ্টভাবে জ্ঞান অনুশীলনের আহবান জানান হয়েছে। সুতরাং সাধারণভাবে ইসলামে ঈমান ও জ্ঞানের সম্পর্ক কখনোই বৈরিতার নয় বরং সহযোগিতার।

যেখানে পাশ্চাত্য বিশ্ব ধর্ম ও বিজ্ঞানকে পরস্পর বৈরী বিবেচনা করে এবং পূর্বোক্তটাকে বিশ্বাস এবং শেষোক্তটাকে যুক্তি থেকে উদ্ভুত মনে করে, সেখানে ইসলাম বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাকে মনে করে মানবীয় এবং প্রাকৃতিক। তবে কয়েকজন বক্তা উল্লেখ করেন যে, ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু কিছু মুসলিম দার্শনিক জ্ঞানকে দু' শাখায় ভাগ করে ফেলেছেন। যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান, যার মধ্যে আছে সব ধরনের বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসভিত্তিক জ্ঞান যার মধ্যে আছে "ধর্মের বিজ্ঞান"। এভাবে দু' শাখাকে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে তারা এর উভয় শাখাকেই কুসংস্কার প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এর বিরোধিতা করে বলা হয় যে, উসুলি জ্ঞানের বিভাজনের বদলে তারা ঐশী একত্ববাদ হতে উৎসারিত ঐক্য সংরক্ষণ করে আসছিলেন। এ মতের অনুসারীদের মতে তথাকথিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং ধর্মীয় শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্যটা পদ্ধতিগত নয় বরং বিষয়গত। আর যুক্তির ভূমিকা হচ্ছে উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাণ উপস্থিত করা। উল্লেখ করা হয় যে, প্রচলিত ধারণার বিপরীতে ইসলাম সমস্ত যুক্তিভিত্তিক তথ্যকে তার বিশ্বাসের বিপরীত বলে প্রত্যাখ্যান করে না। যুক্তি আর সন্দেহকে এক করে দেখা ঠিক নয়। কুরআনের ভিত্তিতে ইসলাম যুক্তিকে তার যথাযোগ্য আসন দান করে। মনে রাখা দরকার যে, কুরআন বলে, প্রতিটি দিনই পূর্ববর্তী দিনের চেয়ে ভিন্নতর প্রতিটি নতুন

www.pathagar.com

সমস্যা সমাধানের ভার নেবে।

যুক্তিই ইসলামী সভ্যতার বিপুল বিকাশধারা সিঞ্চন করে মুসলমানদের মনকে জ্ঞানসিক্ত করেছিল এবং তা বিশ্বের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের পতাকা হাতে সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। সেখানে আজকের মুসলমানরা কেন সব দিক দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের কাতারভুক্ত, এ প্রশ্নের জবাবে সবাই একমত হয়ে বলেন যে, কোনক্রমেই ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে এ পতন ঘটেনি। ইসলাম অতীতে যেমন গতিশীল ছিলো তেমনি বর্তমানেও এটা গতিশীল আদর্শই রয়ে গেছে। আর ইসলামী শিক্ষার যে প্রধান বৈশিষ্ট্যটি একে পাশ্চাত্য শিক্ষার তুলনায় অনন্যসাধারণ করে রেখেছে সেটা হচ্ছে এর বিশ্বজনীন ও এককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। কয়েকজন বক্তার মতে মুসলিমগণ যখন থেকে ভাবতে শুরু করল যে, এ বিশ্বের বিকাশের জন্য তাদের কোন দায়িত্ব নেই তখন থেকেই মুসলিম জাহানে পতনের সূত্রপাত। অন্যান্যরা বলেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম জাহানের পিছিয়ে পড়ার কারণ সম্পর্কে দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত দেবার আগে এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন। এ প্রসংগে তারা ইসলামের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পটভূমিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের মূল্যায়ন করার জন্য ব্যাপক গবেষণা চালান জরুরী বলে মন্তব্য করেন।

ইসলামের ঐতিহ্য অনুবর্তিতা এবং আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণের দ্বৈত প্রভাবের প্রতি এর প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নটিও কিছুক্ষণ আলোচিত হয়। যদিও কিছু কিছু বক্তা সতর্ক করে দেন যে, অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে ধার করে আনা সংজ্ঞায় ইসলামের মূল্যায়ন সঙ্গত নয় তবুও এ বিষয়ে মোটামুটি ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয় যে, আধুনিক বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার সাথে খানিকটা পরিবর্তনের প্রয়োজন সত্ত্বেও ইসলামের যেসব মূল্যবোধ সংরক্ষণ করা উচিত এ সিম্পোজিয়ামে সেগুলো আলোচনা করা হবে।

শুধু ধর্ম হিসেবে নয়, বরং একটা পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে বিবেচনা করার পর বলা হয় যে, ইসলামের ঐতিহ্য অনুবর্তিতার অর্থ হচ্ছে ইসলামের অনড় সাংস্কৃতিক কাঠামো। ইসলামী প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্যানুবর্তিতা, যার ভিত্তি ইসলামের মূল উৎসসমূহে স্থাপিত, সব সময়েই আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার মাত্রাহীন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দৃঢ় রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছে। যদিও ইসলাম সমাজের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধে নয়, তবুও এর নিজের কোন আধুনিকীকরণের প্রয়োজন নেই এবং এর মৌলিক মূল্যবোধ সবসময়েই অপরিবর্তনীয়। আধুনিকীকরণ যতক্ষণ পর্যন্ত ঐতিহ্য অনুবর্তী ইসলামের সাংস্কৃতিক ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সহায়ক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে কখনই অনৈসলামী বিবেচনা করা হয়নি। তাই এটা শুধু জনগণেরই নয়, ইসলামী ধর্মজ্ঞদেরও অটল সমর্থন কুড়িয়েছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যকরণ* কখনই মুসলিম বিশ্বের কোথাও ব্যাপক সমর্থন কুড়াতে পারেনি। কেবল মধ্য শ্রেণীটির মাঝেই এ

* এমন একটা সাংস্কৃতিক ধারা যার প্রভাবে প্রাচ্যবাসী জীবনের সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এবং অন্ধ অনুকরণ করে চলে

www.pathagar.com

প্রক্রিয়া সমর্থিত হয়েছে। মন্তব্য করা হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পাশ্চাত্যকরণের অর্থ পাশ্চাত্য সমাজের অন্ধ অনুকরণ এবং তার অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কৌশলের বাছ বিচারহীন গ্রহণকে বুঝাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই ভয়ঙ্কর রকম অশুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।

সংস্কার ও বিপ্লবের ওপর আলোচনায় বলা হয় যে, পাশ্চাত্য আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে উনবিংশ শতকের ইসলাম অনেকগুলো পুনর্জাগরণী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। এসব আন্দোলন ছিল দু' ধরনের, সংস্কার আন্দোলন ও আধুনিকীকরণ আন্দোলন। সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিলো সমাজের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মুখে ইসলামের পরিশুদ্ধতা রক্ষা করা এবং আন্দোলনকারীরা ছিলেন ইসলামের ঐতিহ্য অনুবর্তী দল। অন্যদিকে আধুনিকীকরণ আন্দোলনের ঝান্ডাবাহীরা ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য প্রভাবিত ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইসলামী বিশ্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে, যার মধ্যে ছিলো তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের এবং সৌদী আরব, মরক্কো প্রভৃতি দেশের আন্দোলন।

বলা হয় যে, বর্তমান ইসলামী বিশ্বে দু'ধরনের আন্দোলন দৃশ্যমান। একটা বিপ্লবী আন্দোলন এবং আরেকটা গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলন। দু'টোর অবস্থান আলাদা হলেও এদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। আর বর্তমান ইসলামী আন্দোলনের ধারা এমন একটা ব্যাপার যেদিকে গভীর মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

রাষ্ট্র ও সমাজ
ইসলামী স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক সমাজের অন্বেষণে

এর মূল লক্ষ্য ছিল একটা নতুন বিশ্বব্যবস্থা তৈরী। ইসলামী মূল্যবোধের সঠিকতর প্রতিফলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী ধ্যান-ধারণার প্রচার ও প্রসার ঘটান। তাই এ সিম্পোজিয়াম ইসলামের কিছু কিছু সামাজিক নীতির অনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও পর্যালোচনা করে।

ইসলামের মূল বাস্তবতা, যা ছিল নবী এবং রাষ্ট্রপ্রধানরূপে মুহাম্মদ (সা) এর দ্বৈত মর্যাদা, এ কথারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে যে, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব বিভাগগুলো আজও অবিভাজ্য। মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যাবলী একই সূত্রে গ্রথিত এবং এর পবিত্র উৎস অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্ উভয়ে একই সাথে দিয়েছে সমাজের ও সমাজ গঠনকারী ব্যক্তির আচরণবিধি।

অংশগ্রহণকারীগণ বলেন যে,ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐক্যসম্পন্ন মুসলিম রাষ্ট্র হচ্ছে একটি আদর্শ সাম্যভিত্তিক ধর্মীয় রাষ্ট্র, যেখানে আল্লাহর চোখে সবাই সমান। উম্মাহ্ হচ্ছে আসলে একটা ধর্মীয় রাষ্ট্র যার কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত। কখনোই কোন ব্যক্তির ওপর তা অর্পিত হতে পারে না। খলিফা বা অন্য শাসকদের ক্ষমতা কখনো দুনিয়ার ওপর খোদায়ী কর্তৃত্বের কিছুমাত্র বেশী বা

www.pathagar.com

কম নয়। অংশগ্রহণকারীদের বড় অংশ ধর্ম ও রাষ্ট্রে উম্মাহর বিভক্তিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে, এ বিষয়টির গভীর পর্যালোচনা প্রয়োজন। সুধীদের কয়েকজন মন্তব্য করেন যে, মুসলমানদের উন্নয়নের উপাদান নিহিত রয়েছে তাদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের মাঝেই, এর জন্য পাশ্চাত্যের কোন ধারণা বা আদর্শ আমদানী নিষ্প্রয়োজন।

অংশগ্রহণকারীগণ একমত হন যে, মুসলিম রাষ্ট্র তার নিজের জন্য কোন নীতিমালা সৃষ্টি করতে পারে না বরং ইসলামের দেয়া নীতিমালা সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নই এর কাজ। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে একটা বিশেষ নীতিমালাকে সমাজের জন্য ব্যবহারিক রূপদান এবং তা কার্যকরকরণ।

অংশগ্রহণকারীগণ একমত হন যে, মুসলিম রাষ্ট্রের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের সহায়ক। তবে তারা এ বিষয়েও ঐক্যমত ব্যক্ত করেন যে, এ কেন্দ্রীকরণ কোনক্রমেই স্বৈরশাসনের সমার্থক নয়। যদিও রাষ্ট্রের কাজের পরিধি সর্বব্যাপ্ত এবং ব্যক্তির প্রায় প্রতিটি কাজেই এর হস্ত সম্প্রসারিত তবুও ইসলামের সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচারের নীতিমালা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিবন্ধক। এর বিপরীতে তাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী গণতন্ত্র (যা ব্যক্তির অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত) কার্যকর করণের জন্যই একটা শক্তিশালী ও কেন্দ্রীকরণকৃত শাসনব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

বক্তারা বলেন যে, ইসলামের স্বাধীনতা হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের স্বাধীনতা যাকে বর্ণনা করা যায় "আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারের আহবান" হিসেবে। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছা ক্ষমতা এবং ভালো মন্দ বাছাই এর অধিকার। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের স্বাধীনতা মানুষের অভ্যন্তরীণ ও অন্তর্নিহিত ব্যাপার, বাহ্যিক অবস্থার ওপর মোটেও নির্ভরশীল নয়। অন্যদিকে এ স্বাধীনতা বল্গাহারা স্বাধীনতাও নয়। কেবল আল্লাহর অধীনেই সে মুক্ত। উম্মাহ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের স্বাধীনতাটাও পাশ্চাত্য ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। মানবাধিকারের সর্বপ্রথম মূলনীতি হচ্ছে সাম্য, যার ওপর নির্ভর করে বাকী সব স্বাধীনতা। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজের সব সদস্যের মাঝে নিরঙ্কুশ সাম্য বিদ্যমান। আল-কুরআনের অন্যান্য স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের নীতিগুলো মূলতঃ এ সাম্য নীতিরই সম্প্রসারিত রূপ। আর মানুষের এ স্বাধীনতার একমাত্র সীমারেখা হচ্ছে গোটা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ যা মানুষের ওপর সমাজের কর্তৃত্বশীলদের (যে কর্তৃত্ব দুনিয়ার উপর খোদায়ী কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করে) আদেশ নিষেধ মানবার বাধ্য-বাধ্যকতা আরোপ করে।

কয়েকজন বক্তা বলেন, যেহেতু মুসলিম বিশ্ব পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন ভেদরেখা টানেনা তাই ব্যক্তির অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কিত ইসলামী অনুশাসনসমূহ উভয় পক্ষের ওপরই সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলামী আইনের অধীনে নারী হচ্ছে একটি দায়িত্বশীল ও স্বাধীন সত্তা। সমস্ত নাগরিক অধিকার ও সম্মানজনক আচরণ লাভের

www.pathagar.com

দাবীদার ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্বগুলো তার ওপরেও সমানভাবে বর্তায়। তারা এ বিষয়ে একমত হন যে, নারী ও পুরুষের অধিকারগুলো মোটেও পরস্পরবিরোধী নয়। বরং পরস্পরের পরিপূরক। কিন্তু নারীর অধিকারের সঠিক সীমানা নিয়ে তাদের মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দেয়। তারা বলেন যে, মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে কুরআনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পূর্ণ সাম্য স্বীকার করা হলেও সর্বক্ষেত্রে তাদেরকে একই রকম অধিকার দেয়া হয়নি। সম্ভবত দৈহিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। আরো বলা হয় যে, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা কোনক্রমেই পাশ্চাত্যের সহনশীল সমাজের তুলাদন্ডে ওজন করা উচিত নয়। বরং আল কুরআন পুরুষকে পরিবারের কর্তা এবং নারীর চেয়ে দক্ষ মনে করে। এর পেছনে যেসব যুক্তি আছে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। বক্তাদের বিরাট অংশ মনে করেন যে, নারীর ওপর নিয়ন্ত্রণগুলো মুসলিম সমাজের শৃংখলা ও পবিত্রতা বজায় রাখার স্বার্থেই। নারীর মূল দায়িত্ব হচ্ছে ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে সভ্যতার ভিত্তি গড়ে তোলা। অন্যদিকে এও বলা হয় যে, ইসলাম নারীদেরকে সমাজের সমস্ত কাজে অংশ গ্রহণের অধিকার দিয়েছে। কিন্তু মুসলিম জগতের নারীরা এ সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে এবং নানান প্রতিকূল প্রতিপার্শ্বের শিকার হয়ে ঐসব অধিকার গ্রহণ করেন না। আরো বলা হয় যে, নারীর অধিকার অস্বীকৃতির পেছনে আরেকটা বিরাট কারণ হল, পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত কুরআনী আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা। কেউ কেউ বলেন, সমসাময়িক ইসলামী দেশগুলোর কয়েকটিতে যে নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে তা ইসলামসম্মত নয়।

ইসলামের বিবাহ প্রথা সাম্য-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতি একটা অপরিহার্য দিক। যদিও ধর্মীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত বহু বিবাহ প্রথা স্বীকৃত, তবুও বহুবিবাহের অনুমতি সব সময়েই সকল স্ত্রীর প্রতি সুষম আচরণের শর্তাধীন। বক্তারা উল্লেখ করেন যে, যদিও বহুবিবাহ প্রথাটা বর্তমানে অত্যন্ত কম দেখা যায়, তবুও এর মধ্যে যথেষ্ট ভালো দিক রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তারা উল্লেখ করেন যে, বহুবিবাহ একটা অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবার প্রথাকে টিকিয়ে রাখে এবং নৈতিক পাপাচারের পথ রুদ্ধ করে উন্নত নৈতিক মান বজায় রাখতে সাহায্য করে। আপাতঃ দৃষ্টিতে অত্যন্ত সাধারণ মনে হলেও ইসলামে বিবাহ ও তালাক প্রথার অত্যন্ত গভীর সামাজিক, নৈতিক, আত্মিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে।

পুরুষ ও নারীর শিক্ষা একই হবে কিনা–এ নিয়ে আবার বক্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। অংশগ্রহণকারীদে কেউ কেউ দৃঢ়ভাবে বলেন যে, আল-কুরআন উভয় সম্প্রদায়ের জন্য একই শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে এবং নারীদের শালীনতার সীমায় অবস্থান করে যা কিছু করা সম্ভব এমন যেকোন কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। তবে, অধিকাংশের মত ছিলো যে, নারীর মূল ভূমিকা যেহেতু একজন স্ত্রী ও একজন মাতার, তাই তার শিক্ষার ধরণ-ধারণ অবশ্যই পুরুষের শিক্ষার চেয়ে ভিন্নতর হবে।

সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ

www.pathagar.com

নিয়েও বক্তাদের মাঝে বিতর্ক হয়। যদি নারীরাও এসব বিষয়ে অংশগ্রহণ করে তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় নারীরাও কি একই ধরনের প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও মজুরী পাবে ? এ ক্ষেত্রেও আবার মতের ভিন্নতা দেখা দেয়। কয়েকজন বক্তা বলেন যে, সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে নারী স্বাধীনতা ও নারীশিক্ষার বিষয়টি একটা সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু অধিকাংশ বক্তাই বলেন যে, সাম্প্রতিক বিশ্বে নারীদের ঘরছাড়া করার ফলে পরিবারের মধ্যে ভাঙ্গন ও অবক্ষয় সৃষ্টি হচ্ছে। যদিও একজন বক্তা বলেন যে, মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীরা যেন অধিকতর ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য নারীদের শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ধারাকে ঢেলে সাজানো উচিত। অধিকাংশেরই মত ছিলো, পুরুষদের পূর্ণ কর্মসংস্থানের বিষয়টিই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত, নারীদের জন্য অল্প ক'টি পেশাই উন্মুক্ত রাখা সঙ্গত।

সাধারণ কাজের ব্যাপারে সবাই একমত হন যে, ইসলামে কাজ হচ্ছে একই সাথে দায়িত্ব ও অধিকার। মানুষ শুধু নিজের জন্যেই কাজ করে না। সে তার ব্যক্তিগত কাজের মাধ্যমেও সভ্যতা গড়ে তোলে। ইসলাম যেহেতু ধর্মীয় আর জাগতিক-এর মধ্যে পার্থক্য করে না তাই কাজ হচ্ছে একইসাথে ধর্মীয় দায়িত্ব এবং এক ধরনের ইবাদত। পুঁজিবাদী সমাজে যেখানে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ কাজ খুঁজে নেয়ার ব্যাপারে দায়িত্বশীল তার বিপরীতে ইসলামে সবার জন্য কর্মসংস্থান করাটা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের আওতাভুক্ত করেছে। ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ইসলাম গোটা সমাজ এবং ব্যক্তিকে একই সাথে দায়ী করে। এখানে উল্লেখ করা হয় যে, প্রত্যেকের জন্য কর্মের সংস্থান করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং সমাজের জন্য প্রত্যেকের কাজ করার ব্যক্তিগত দায়িত্বটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমষ্টিগত ইচ্ছার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এভাবে যথেষ্ট স্বাধীনতা ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এ দুই চরম অবস্থা পরিহার করে কর্মসংস্থান ও শ্রমের ক্ষেত্রে ইসলাম একটি সম্পুর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভংগী ও নীতি গ্রহণ করেছে।

তারা বলেন, ইসলামে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে নৈতিকতার মান এবং উৎপাদনশীল কাজও নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত। তাই মুসলিম সমাজ ধনী ও নিঃস্ব, পুঁজিপতি ও শ্রমিক ইত্যাকার শ্রেণীতে বিভক্ত নয়। প্রত্যেকেই শ্রমিক এবং আল্লাহ, রাসূল ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল। এর অর্থ যদিও এটা নয় যে ইসলামী সমাজ হলো শ্রেণীহীন তবে সব ধরনের শ্রমকেই ইসলাম মর্যাদা দিয়ে থাকে। শ্রমের ক্ষেত্রে ইসলামের কথা হচ্ছে যে, সামাজিক মর্যাদা পেশার ওপর নির্ভরশীল নয় এবং সমাজের প্রতিটি সদস্যই সমান। পাশ্চাত্যের একেক শ্রেণীর জন্য একেক ধরনের নৈতিকতার ধারণা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত।

বেশ ক'জন উল্লেখ করেন যে, মজুরী সম্পর্কে ইসলামের নীতি হচ্ছে, প্রত্যেকটা কাজের জন্যই উপযুক্ত প্রতিদান প্রয়োজন এবং সমান কাজের মজুরীও হবে সমান। একজন বক্তা বলেন, একদিকে পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিককে শোষণ এবং অন্যদিকে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদল কর্তৃক নিয়োগকারীর বিরুদ্ধে অসহযোগ এর কোনটাই ইসলাম অনুমোদন করে না। শ্রমিক ও নিয়োগকারী উভয়েরই অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে।

www.pathagar.com

আর এদের মধ্যে ন্যায়নীতিভিত্তিক সুষ্ঠু সম্পর্ক রক্ষা করে কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য জায়গার মতো এ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রায় সবাই একমত হন যে, সমান কাজের জন্য সমান মজুরী পাওয়া দরকার। একই সাথে এই আশংকাও ব্যক্ত করা হয় যে, এ নীতির কড়াকড়ি প্রয়োগ বিভিন্ন কাজ ও কর্মীর মধ্যে অতি বেশী পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দেবে। এখানে আবার প্রশ্ন করা হয় যে, বিভিন্ন পেশার লোকদের মধ্যে মজুরীর কতখানি পার্থক্য থাকতে পারে। সবাই এ ব্যাপারে একমত হন যে, যদিও কোন কোন পেশায় মানুষকে বেশী আকর্ষণ করার জন্য মজুরীর মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত, তবুও ইসলামের সাম্যনীতি অনুসারে এ পার্থক্য যতটুকু সম্ভব স্বল্প হওয়া সঙ্গত।

ইসলামের মজুরী নীতি ও মজুরী নির্ধারণ প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। শেষে সবাই একমত হন যে, একটা ন্যায়সংগত মজুরী, যা একজন ব্যক্তি ও তার পরিবারের সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য যথেষ্ট। এটাই ইসলামের শ্রমনীতির অপরিহার্য দিক। বেশ ক'জন বক্তা কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, ইসলামে শ্রমের একটা অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে এবং এটা এমন পণ্য যার একটা নির্ধারিত মূল্য আছে। কয়েকজন বক্তা মত প্রকাশ করেন যে, শ্রমের মজুরীকে কিছুতেই চাহিদা ও সরবরাহ প্রক্রিয়ার হাতে ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। বাজারের ভূমিকা এক্ষেত্রে গৌণ এবং নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। ক'জন বক্তা একটা স্বল্পতম মজুরী বেঁধে দেয়ার প্রস্তাব করলে কয়েকজন বক্তা এর বিরোধিতা করে বলেন যে, এ ধরনের পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণ অনেক অশুভ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে। একই সাথে এটাও ভাবা হয় যে, মানুষের জন্য একটা সুষ্ঠু জীবন নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যক্তি স্বাধীনতা ইসলামী নীতির একটা অপরিহার্য অংগ। এখানে মজুরী ও দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিধিকে সংকুচিত করে দিতে পারে। বলা হয় যে, বিভিন্ন বৈষম্যের ক্ষেত্রে ইসলামের যে বিভিন্ন সামাজিক রক্ষাকবচ (যেমন যাকাত) রয়েছে সেগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে।

মুসলিম বিশ্বের আজকে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক ইস্যু হচ্ছে দেশত্যাগ ও দেশান্তর।

মুসলিম বিশ্বের মাঝেই কোন কোন দেশ শ্রম ঘাটতি এলাকা এবং কোন কোন দেশ শ্রম উদ্বৃত্ত। ফলে শেষোক্ত দেশগুলো হতে প্রথমোক্ত দেশগুলোয় প্রচুর শ্রমিক দেশান্তরী হচ্ছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। শ্রম ঘাটতি দেশগুলোয় তেল সম্পদ আবিষ্কারের সাথে সাথে দেশান্তরের পরিমাণ বেড়ে গেছে বহুগুণে। অংশগ্রহণকারীরা অনুভব করেন যে, মুসলিম দেশগুলোয় এ দেশান্তর সামান্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করলেও একই সামাজিক ঐতিহ্য ও জীবন ব্যবস্থার অধীন হওয়ার কারণে খাপ খাইয়ে নেয়া খুব একটা কঠিন হবে না। তারা বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে এই পারস্পরিক আদান প্রদান উম্মাহর জন্য শুভ ফলদায়ক হবে এবং এ

www.pathagar.com

মিথস্ক্রিয়াকে আরও ব্যাপকতর করার উদ্দেশে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একটা সাধারণ শ্রম বাজার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

অংশগ্রহণকারীরা এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রকাশ করেন যে, দ্বিতীয় ধরনের দেশান্তর অর্থাৎ মুসলিম দেশগুলো হতে পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রবাসী হওয়া গোটা উম্মাহর জন্য একটা নেতিবাচক ফল বয়ে আনবে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেশান্তর দু'ধরনের হয়ে থাকে। দু'টোরই প্রতিক্রিয়া ব্যাপক, প্রথমটা গুরুত্বের দিক থেকে অত্যন্ত মারাত্মক। তা হচ্ছে মেধা পাচার, যদিও এসব দেশত্যাগীরা তাদের দেশান্তরকে সাময়িক ব্যাপার বলে মনে করেন। আসলে এ দেশান্তর মুসলমানদের সংস্কৃতি ও জীবনাচরণকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করতে থাকে। এ পরিবর্তনের সর্বশেষ শিকার হয় ধর্মবিশ্বাস। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন যে, এসব দেশান্তরীরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাময়িক সংস্পর্শে এসে এর স্রোতে ভেসে যাবার পরিবর্তে ইসলামী কৃষ্টিকেই সমৃদ্ধতর করে তোলে। ইউরোপীয় দেশগুলোই মুসলিম শ্রমিকদেরকে পুরোপুরি আত্মস্থ করতে না পারার সমস্যায় আক্রান্ত। বেশ ক'জন মন্তব্য করেন যে, এসব পাশ্চাত্য দেশে মুসলমানদের নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতি অটুট রাখার জন্য অধিকতর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কিন্তু একজন বক্তা বলেন যে, পাশ্চাত্য মূল্যবোধকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করে যেসব মুসলিম পুনরায় ইসলামে ফিরে আসেন, তাদের ঈমান হয়ে ওঠে আরো সাচ্চা যা বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অংশগ্রহণকারীরা সবাই একমত হন যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অশুভ প্রভাবের আসল শিকার হচ্ছে প্রবাসীদের সন্তানেরা, যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠার কারণে স্ব-সংস্কৃতি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং ইসলামী ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বেশ ক'জন বক্তা এ ক্ষেত্রে আশু গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণের ওপর জোর দেন এবং স্কুলগুলোয় আরবী শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। কেউ কেউ উল্লেখ করেন যে, কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ ইতোমধ্যেই এ সমস্যার প্রতি কিছুটা দৃষ্টি দিয়েছে এবং ইসলামকে একটা প্রধান ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সরকারী স্কুলগুলোয় ইসলামের ধর্মীয় তামদ্দুনিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যাই হোক, অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন যে, এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশগুলোর আরও বড় পদক্ষেপ নেয়া উচিত এবং এ বিষয়ের ওপর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লেবার স্টাডিজ এবং ও আই সি গবেষণা ও কর্মপ্রয়াস চালাতে পারে।

www.pathagar.com

ইসলাম ও একটি নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা

যদিও কোন কোন লেখক মুসলিম দেশগুলোর অনুন্নয়নের জন্য ইসলামের নেতিবাচক প্রভাবকে দায়ী করেছেন তবুও অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী-ই জোর দিয়ে বলেন, এহেন ধারণা ইসলামের অর্থনৈতিক মতবাদের সাথে, যার রয়েছে একটা সুনির্দিষ্ট নীতি ও সুস্পষ্ট কর্মসূচী, মোটেও সংগতিপূর্ণ নয়। তারা বলেন যে, মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান অবস্থা খাঁটি ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন ও প্রতিফলন নয় বরং এটা মুসলিম জাহানের বহিঃশত্রুদের দ্বারা সৃষ্ট ও চাপিয়ে দেয়া। অংশগ্রহণকারীরা এও লক্ষ্য করেন যে, যদিও এ তর্কের শেষার্ধে মুসলিম চিন্তাবিদরা স্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন যে, ইসলামের একটা স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে, তবুও অধিকাংশ মুসলিম দেশে তার প্রয়োগ অতি সামান্য। সাধারণভাবে তারা অনুভব করেন যে, এ অবস্থার একটা আশু পরিবর্তন প্রয়োজন এবং মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নতুন একটা বিশ্বব্যবস্থা গঠনে তাদের যথার্থ অবদান রাখার যোগ্যতা ইসলামী মূল্যবোধের অধিকতর বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল। এ দেশগুলো বর্তমানে যেসব সমস্যার সম্মুখীন, সেগুলোর সমাধান প্রচেষ্টার সূচনাবিন্দু হওয়া উচিত ইসলামী মূল্যবোধ যা একই সাথে সমগ্র বিশ্বের অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

অংশগ্রহণকারীরা একমত হন যে, ইসলামের অনন্যসাধারণ দিকটি পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলাম আধ্যাত্মিকতার ওপরে জোর দেয়। আর ইসলামের সমস্ত জাগতিক ও পারলৌকিক নীতি ও আদর্শের উৎস একটিই। আর তা হল ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন। অন্য কথায়, ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিমালা হচ্ছে ইসলামের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দৃষ্টিভংগীরই উপ-সেট ও প্রতিফলন। উল্লেখ করা হয় যে, ইসলামের সমস্ত অনুশাসনের মূল সূত্র ও উৎস এক হওয়ায় ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যক্তি ও সামাজিক ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এরূপ মত প্রকাশ করা হয় যে, ইসলামের নৈতিক দর্শন সমস্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীর মূল ভিত্তি। এগুলোকে চারটি নীতিতে সংক্ষিপ্ত করা যায় যেমন, ঐক্য, ভারসাম্য, স্বাধীন ইচ্ছা ও সামাজিক দায়িত্ব।

বেশ ক'জন উল্লেখ করেন যে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে এবং শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিমন্ডলকে ছাড়িয়ে মানব অস্তিত্বের সমস্ত দিক ও বিভাগের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে।

ইসলাম একটা পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা যেখানে অন্য সমস্ত অর্থনৈতিক বিবেচনার ওপর কর্তৃত্ব করে নৈতিকতা, সেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য নয়। বস্তুগত প্রাচুর্যের চেয়ে এখানে বেশী জোর দেয়া হয় সমাজের সর্বাংগীন ও ভারসাম্যমূলক উন্নয়নের দিকে। বক্তারা একমত হন যে, একটি খাঁটি ইসলামী উন্নয়ন কৌশল প্রয়োজন। তা একমাত্রিক হওয়ার পরিবর্তে, যেমনটি বর্তমানে বিরাজমান, বহুমাত্রিক

www.pathagar.com

হবে। ইসলাম স্বীকার করে যে, অর্থনীতি সব সময় ভারসাম্যমূলক অবস্থায় থাকেনা। অর্থনীতিকে ভারসাম্যের লক্ষ্যে নিয়ে যাবার জন্য ইসলাম মুসলমানদের ওপর দায়িত্ব আরোপ করে। ইসলামের ভারসাম্য নীতি অন্যান্য সমস্ত আদর্শের চাইতে আলাদা এবং এটি ভবিষ্যত বংশধরদের চাহিদাকে বিসর্জন দিয়ে অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি অর্জন পরিহার করতে বলে।

ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ার কারণে ইসলামের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রযন্ত্রের অনাকাংখিত বন্ধন হতে মুক্ত। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিই সমস্ত কর্মকান্ডের কেন্দ্র এবং স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের ভূমিকার ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদান। ইসলামের মূল্যবোধ এবং এরই আওতাধীন সামাজিক দায়-দায়িত্ব মেনে নেবার ওপরেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল।

ইসলামী উন্নয়ন কৌশলের সাথে অন্যান্য উন্নয়ন কৌশলের কিছু কিছু মিল থাকা সত্ত্বেও ইসলামের সামগ্রিক কৌশল সন্দেহাতীতভাবেই অনন্যসাধারণ। বেশ ক'জন অংশগ্রহণকারী মনে করেন যে, বিচ্ছিন্নভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে তা সমাজ ব্যবস্থার অংগ-বহির্ভূত একটা বিষয়ে পরিণত হবে এবং উন্নতির বদলে অনুন্নয়নের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আধুনিক যুগে ইসলামের প্রযোজ্যতা এবং সার্বজনিনতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা সাধারণভাবে মত প্রকাশ করেন যে, ইসলামের নীতি প্রকৃত অর্থেই সার্বজনীন আবেদনসম্পন্ন এবং ইসলামের সামাজিক অনুশাসনগুলোর মধ্যে এমন কোন উপাদান নেই যাকে প্রগতির প্রতিবন্ধক বলা যায়।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয় কাঠামো থেকে ইসলাম সম্পূর্ণ আলাদা। এ বিশ্বাস পুনরায় জোর দিয়ে উচ্চারণ করে অংশগ্রহণকারীরা একটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ইসলামী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের লক্ষ্যে ইসলামের বিশিষ্ট দিকগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করেন।

ওপরে আলোচিত বিশিষ্ট দিকগুলো ছাড়াও ইসলামের আরেকটা বিশেষ দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়। সেটা হচ্ছে, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র, এর ইসলামী সংজ্ঞা ও বাস্ত বায়ন পদ্ধতি। ইসলামী জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে সমাজের দুর্বলতর মানুষের কল্যাণের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রত্যেকের অংশগ্রহণের দায়িত্ব ও অধিকার। অন্যদিকে পাশ্চাত্যে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে সমাজের কম ভাগ্যবানদের জন্য কিছুটা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করার ওপর ভিত্তি করে। সেখানে ইসলামের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের (অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি সদস্যেরই দায়িত্ব হচ্ছে বাদ বাকী সব সদস্যের কল্যাণে কাজ করা) ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে পাশ্চাত্যের মডেলে যেখানে অনেকখানি প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আসে ইসলামী মতাদর্শ অনুসারে, সেখানে একেবারে ক্ষুদ্রতম প্রবৃদ্ধির হার নিয়েই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকতে পারে বিনাখরচে শিক্ষা, উন্নত চিকিৎসা সুবিধা, ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ ইত্যাদি ...। সমাজের কম ভাগ্যবান মানুষই স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

www.pathagar.com

সেক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেশ ক'জন বক্তা জোর দিয়ে বলেন যে, যাকাত আর দান দু'টোকে এক অর্থে গ্রহণ করা উচিত নয়। সম্পদ বন্টনে বৈষম্য দূর করা ছাড়াও যাকাত দেয়ার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাকাত গ্রহীতাকে তার অর্থনৈতিক অবস্থা এতখানি উন্নত করতে সহায়তা করা যাতে সেও যাকাতদাতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। কয়েকজন মত প্রকাশ করেন যে, নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ইসলামের এ অনন্যসাধারণ দিক-যাকাত ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সিম্পোজিয়ামে ইসলামী অর্থনীতির আরেকটি বিষয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা, বিশদভাবে পর্যালোচিত হয়। সবাই একমত হন যে, ইসলামী সমাজে রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইসলামী শরীয়াহ দেশের সমস্ত মুসলমান ও অমুসলমান জনসাধারণের সুষ্ঠু জীবন যাপন নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত করেছে। যেহেতু ইসলামের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব বিষয়াবলী অংগাংগীভাবে যুক্ত, তাই ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মপরিধি স্বভাবতঃই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের চাইতে ব্যাপক। ইসলামে ব্যক্তিগত ও সরকারি উভয় খাতেই রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ব্যাপ্ত। বলতে গেলে জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই এর হাত প্রসারিত।

রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে এর সীমানায় যেন কোন দুঃস্থকে অযত্ন অবহেলায় পড়ে থাকতে না হয় সেটা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যেমন স্বতঃস্ফূর্ত পদ্ধতি আছে (যেমন যাকাত) তেমনি বল প্রয়োগেরও বিধান রয়েছে। সাম্যনীতির বাস্তবায়ন যেকোন ইসলামী রাষ্ট্রেরই অপরিহার্য উপাদান এবং সমাজের প্রত্যেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্ব স্ব ভূমিকা রাখার অধিকার পাচ্ছে কি না, তা দেখাশোনার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার জন্য ইসলামের স্থায়ী নিয়মগুলোর (যেমন উত্তরাধিকার আইন ও মোহরানা প্রথা) পাশাপাশি রাষ্ট্রেরও অধিকার আছে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের। এসব পদক্ষেপের মধ্যে থাকতে পারে কৃষি সংস্কার, ভূমি বন্টন, শ্রম সংস্কার ইত্যাদি। কয়েকজন অংশগ্রহণকারী আরও মন্তব্য করেন যে, সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন কর আরোপ এবং সুদ, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী বন্ধ করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন প্রয়োগ করতে পারে।

কয়েকজন বক্তা বলেন যে, স্বাধীনতা ভিত্তিক ব্যক্তিমালিকানা ইসলামী অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তা সত্ত্বেও জোর দিয়ে বলা হয় যে, এ ব্যক্তিমালিকানা অবাধ ও নিরঙ্কুশ হবার পরিবর্তে সব সময়েই রাষ্ট্রের বেঁধে দেয়া সীমার আওতাধীন। অধিকাংশ বক্তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আল্লাহর দান হিসেবে বিবেচনা করেন। ব্যক্তিগত সমপত্তিকে এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে যাতে একই সাথে ইসলামী মূল্যবোধ অনুসারে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সর্বোচ্চ হয়। কারণ সমাজে সাম্যনীতি কতখানি বাস্তবায়িত হচ্ছে তা দেখার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণও অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু সমষ্টির কল্যাণও ব্যক্তিগত সম্পত্তির কাজ, তাই রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে ভালোভাবে ব্যবহার হচ্ছে না এমন জমি বাজেয়াপ্ত করে নেয়ার।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এটি পরামর্শনীতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। উল্লেখ করা হয় যেখানে রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারে এবং নাগরিকদেরকে শ্রমিক হিসেবে খাটাতে পারে সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবার এবং সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র উদ্ভবের সম্ভাবনা রয়েছে।

যদিও ব্যক্তিগত খাত ইসলামী অর্থনীতির একটা প্রধান উপাদান, রাষ্ট্রের ক্ষমতা রয়েছে জনগণের প্রয়োজনানুযায়ী সরকারী খাতকে প্রয়োজনমত বর্ধিত ও সংকুচিত করার। সমাজের প্রত্যেকের একটা সুষ্ঠু জীবন নিশ্চিত করাটা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং এ কাজের প্রধান ভূমিকা পালন করবে সম্ভবতঃ সরকারি খাত। অব্যবহৃত খনিজ, জ্বালানী, পানি, খাদ্য ইত্যাদি সরকারি বা সমষ্টিগত সম্পত্তি বিবেচিত হবে।

সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে উৎপাদন বাড়ান এবং মানব সম্পদসহ সমস্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। জোর দিয়ে বলা হয় যে, নৈতিক ও কল্যাণমূলক দিকগুলোর বিনিময়ে ইসলাম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে চায় না। যুক্তি দেখানো হয় যে, ইসলামে প্রযুক্তি মানুষের জন্য, মানুষ প্রযুক্তির জন্য নয় এবং উৎপাদনের কৌশল ও উপকরণগুলো অবশ্যই জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদার অনুকূল হতে হবে। যেমন, ভোগ্যপণ্য উৎপাদন এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে জনগণের গরিষ্ঠ অংশের চাহিদা পূরণ হয় এবং বিলাস দ্রব্যাদির দিকে খুব বেশী উৎপাদন প্রয়াস নিয়োজিত না হয়। সাম্য ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে রাষ্ট্রকে অবশ্যই একচেটিয়া কারবার প্রতিরোধ করতে হবে। যদিও ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি অনুযায়ী পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হবে চাহিদা ও সরবরাহ দ্বারা কিন্তু উৎপাদনের মানদন্ড নির্ধারণ করবে রাষ্ট্র এবং অবৈধ পণ্য যাতে উৎপাদিত না হয় রাষ্ট্র সেদিকেও লক্ষ্য রাখবে। জরুরী পণ্য সেবা ও প্রচার মাধ্যম যাতে একচেটিয়া কারবারীর কবলে না পড়ে সেদিকে কড়াভাবে নজর রাখা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

ইসলামী রাষ্ট্রের আরেকটা দায়িত্ব হচ্ছে কর্মসংস্থান। ইসলামী ব্যবস্থার অধীনে উন্নয়নের পর্যায় যতখানিই থাকুক, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক অবস্থা যাই থাকুক না কেন শ্রমদানকারীর জন্য একটা সম্মানজনক নিম্নতম মজুরী নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। বেশ ক'জন মন্তব্য করেন যে, ইসলামী আইনজ্ঞদের মতে পণ্যের মূল্য ও সম্মানজনক মজুরী নির্ধারণ রাষ্ট্রের কাজ। আয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, বরং এগুলো উদ্দীপকের কাজ করে। কিন্তু সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি দাবী করে যে, এ বৈষম্য একটা নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করতে পারে না।
অংশগ্রহণকারীরা বলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখানে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার একটি অংশ গঠন করে মাত্র।

এ সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশলের ভিত্তি হবে ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি এবং এর লক্ষ্য হবে সমাজের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি সংহত করা। এটা জোর দেবে মুসলিম

www.pathagar.com

জীবনাচরণের দিকে, পাশ্চাত্য জীবনাচরণের দিকে নয়। ন্যায়বিচার হবে এর কেন্দ্রীয় উপাদান। এ ধরনের উন্নয়ন প্রয়াসের লক্ষ্য হবে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক।

সিম্পোজিয়ামে আলোচিত এ উন্নয়ন কৌশলের বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে থাকবে সমগ্র সমাজের মৌলিক উন্নয়ন, সমগ্র সমাজের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানো, আয় বৈষম্য সংকোচন এবং সমাজের বিভিন্ন খাতের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন। আরও বলা হয় যে, মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে শিল্প ও প্রযুক্তি বিকাশের জন্য মৌলিক শিল্প স্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। প্রত্যেক দেশের উন্নয়ন প্রয়াস চলবে তার নিজস্ব সম্পদের ওপর ভিত্তি করে এবং এ উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটা মুসলিম চরিত্র থাকতে হবে যাতে পরবর্তী সময়ে সবগুলো মুসলিম দেশ সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার অধীনে এগুতে পারে।

অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য (মুসলিম আদর্শ, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের উজ্জীবন এবং স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রত্যাবর্তন) অনুধাবনের পর মুসলিম নেতৃবৃন্দের উচিত এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করা এবং এই প্রয়াসে নেমে পড়া।

উল্লেখ করা হয় যে, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং একটা নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এর অবদান শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের মানদন্ডে মূল্যায়ন করলে চলবেনা। বরং ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার উন্নয়নও বিবেচনা করতে হবে। বেশ ক'জন উল্লেখ করেন যে, এত বিশাল ও বৈচিত্র্যময় মুসলিম বিশ্ব যদি একটি একক হিসেবে কাজ করে এবং সামগ্রিক ইসলামী অর্থনীতির অধীন হয় তাহলে এটা সন্দেহাতীতভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে, যা একটা নতুন বিশ্বব্যবস্থা তৈরীতে অবদান রাখবে। উপরন্তু, যেহেতু মুসলিম দেশগুলো সবই উন্নয়নশীল দেশ তাই তাদের সহযোগিতা ও সামষ্টিক স্বনির্ভরতা সহজেই তৃতীয় বিশ্বে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

বেশ ক'জন এ মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রসম্পন্ন সবগুলো মুসলিম দেশের জন্য একত্রে একটা একক উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা খুবই সমস্যাসঙ্কুল। তবে তাঁরা একমত হন যে, একটা উন্নয়ন কৌশল যদি বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী কাটছাঁট করে নেয়া হয়, তা হলে সেটা সন্দেহাতীতভাবেই একটা নতুন বিশ্ব গঠনের পথে বিরাট অবদান রাখবে। তাঁরা মনে করেন যে, ইসলামের নৈতিক ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভংগী একটা আন্তর্জাতিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে। তারা স্বাধীনতা, সামাজিক দায়িত্ব, সাম্য ও ন্যায় বিচারের ওপর ইসলামের জোর দেয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, ইসলামের এ অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো অন্যান্য উন্নয়নকামী দেশ সহজেই গ্রহণ করতে পারে, ইসলামী দেশগুলো যদি প্রমাণ করতে পারে যে তাদের ব্যবস্থা বাস্তবায়নযোগ্য।

www.pathagar.com

সমাপনী বক্তব্য ও ভবিষ্যৎ গবেষণার আবশ্যকীয়তা

সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন যে, মানুষের চাহিদা এবং সমাজের প্রতি মূল্যবোধের মাধ্যমে ইসলামের যে অঙ্গীকার এবং যে অঙ্গীকার সমাজের সব মূল্যবোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সে মূল্যবোধ আন্তর্জাতিক সমাজকে অনেক কিছু দিতে পারে। তারা মনে করেন যে, বিশ্ব ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসে ইসলামের ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বিশ্ব সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নে বর্তমান সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজন নয়া সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও নতুন ধ্যান ধারনার। সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণকারীদের অনেকে মনে করেন যে, মানবজাতিকে দেয়ার জন্য আধ্যাত্মিক চেষ্টাও আমাদেরকে করতে হবে। অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, উন্নয়নের বর্তমান সংজ্ঞা এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামের ধ্যান ধারণা ও ইসলামের ন্যায় নীতির বিষয়টি আজ কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন। গত ৩০ বৎসরের উন্নয়ন কৌশলের ব্যর্থতার ব্যাপারে অংশগ্রহণকারী বক্তাগণ পুরো উন্নয়ন কৌশলের বিষয়টি পুন পরীক্ষার ব্যাপারে একমত হয়ে বলেন যে, আমাদেরকে এমন স্বাধীন উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে, যে কৌশল পশ্চিমা দর্শনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেনি। বর্তমানে প্রায় অপছন্দনীয় বিশ্বব্যবস্থার সাথে বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় নতুন তত্ত্ব, মূল্যবোধ ও সমাজ দর্শনের ওপর আলোচনায় সিম্পোজিয়ামে একমত পোষণ করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে মনে করা হয় যে, সমাজের প্রতিটি মানুষের কল্যাণকামী ধর্ম ইসলাম নতুন সমাজ দর্শন হিসেবে মানবজাতির কল্যাণে অবদান রাখতে পারে। ইসলামের এই অবদান বস্তুগত অর্থে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

বক্তাগণ বলেন যে, বর্তমান বিশ্বে ৪৩টি স্বাধীন মুসলিম দেশ রয়েছে। বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ মুসলিম দেশগুলোতে বাস করে। এই জনসংখ্যার গঠন, নতুন অর্থব্যবস্থা, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং তাদের সমন্বিত উন্নয়ন, তাদের নিজেদের সাথে সাথে অবশিষ্ট বিশ্বের জন্যও বর্তমানের চেয়ে নতুন ও উন্নত বিশ্ব ব্যবস্থা কায়েমে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা যেতে পারে। বক্তাগণ বলেন যে, বর্তমানের উন্নয়ন মডেলের প্রতি পশ্চিমাদের বিতৃষ্ণা ইসলামের সফল উন্নয়ন মডেল বিশ্বকে রাতারাতি একটি ভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থার সুযোগ এনে দিতে পারে। ইসলামে উন্নয়নের এই নতুন মডেল তৃতীয় বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হবে। তৃতীয় বিশ্বের চল্লিশ শতাংশ ভূ-ভাগের অধিকারী মুসলিম বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নে মাইল ফলকের ভূমিকা পালন করতে পারে। অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন যে, নতুন ও আরো সুষম বিশ্বব্যবস্থা গড়ায় ইসলাম বাস্তব, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান রাখতে পারে।

www.pathagar.com

সিম্পোজিয়ামে আলাপ আলোচনা ও সিম্পোজিয়ামকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা সাধনাকে আরো দীর্ঘ ও বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। ভবিষ্যতের কর্মসূচীগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ডের ওপর বেশী জোর দেয়া হবে।

বক্তাগণ সিম্পোজিয়ামে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর আরও বলেন, ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন মডেলের ওপর বাস্তবধর্মী গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, যেসব বিষয়ের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করা হবে তার জন্য যথাযথ গবেষণা পদ্ধতির ওপর আরো অধিক গুরুত্ব দিতে হবে (ইসলামী আইনের বিধি বিধানের গ্রহণ ও বর্জনের বিষয়)। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে একাত্মতা প্রকাশের নিমিত্ত বক্তাগণ বলেন, কোন বিষয়ের ওপর গবেষণা পদ্ধতি এমন হতে হবে যাতে এর প্রয়োগ বিশ্বব্যাপী একই রকম হয় এবং যে পদ্ধতির মাধ্যমে কোন বিষয়কে সমন্বিত ও একতাবদ্ধ করা যাবে। আলোচকদের মধ্যে কেউ কেউ এই মতও ব্যক্ত করেন যে, সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের কারণে বিশ্বমুখী'র ধারণাটি পদ্ধতিগত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

অর্থনৈতিক বিষয় ও পরিকল্পনার বিভিন্ন মডেলের ওপর আলোচনার সাথে সাথে বক্তাগণ বলেন যে, ইসলামী বিশ্বে বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাদপদতার সমস্যা নিরসনে ইসলামী দর্শনকে যুগোপযোগী করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে তারা বলেন, ইতিহাস খ্যাত গ্রন্থ সূত্রগুলোর পুনর্মূল্যায়নে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। এর ফলে মুসলিম চিন্তাবিদগণ জ্ঞানের উন্নয়নে আরো বেশী অংশগ্রহণ করতে পারবে। এভাবে ঐতিহাসিক মূল সূত্র ও ইসলামী দর্শনের সূত্র সমূহের পুনরুদ্ধারের ফলে এবং এগুলোর সহজ প্রাপ্তির কারণে এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিমগণ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আরো বেশী অবহিত হতে পারবে।

সিম্পোজিয়ামে প্রস্তাবিত শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের ওপর অনেকগুলো প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং সেগুলো অনুমোদনও করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ শিক্ষার ওপর মধ্যমেয়াদী সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ও কারিগরি সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এগুলোর ব্যাপারে আরো বড় ধরনের কার্যক্রম গ্রহণেরও আলোচনা করা হয়। সিম্পোজিয়ামে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মীয় কাঠামোর আলোকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ইসলামের প্রকাশনা কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

কতকগুলো বিশেষ বিষয়ের ওপর গবেষণার সুপারিশ করা ছাড়াও বক্তাগণ মনে করেন যে, ঐগুলোর বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য সময় কাঠামো থাকা দরকার এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও প্রয়োজন। কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সময় বেঁধে দেয়া হয় তিন থেকে পাঁচ বৎসর। এর জন্য মধ্য মেয়াদী কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক

www.pathagar.com

কাঠামো প্রস্তুতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও ইন্টারন্যাশনাল লেবার স্টাডিজ ইনস্টিটিউট সহায়তা করবে। বক্তাগণ মনে করেন যে, ইসলামিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের জন্য প্রস্তাবিত বিশেষ ধরনের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট আর্থিক বিবেচনায় যথোপযুক্ত নয়। এই ধরনের ইনস্টিটিউট আঙ্কারায় অবস্থিত Centre for Research for Statistical, Economic and Social Research, ইস্তাম্বুলের Centre for Research of Islamic History, Art and Culture এবং রাবাতের Islamic Foundation for Science, Technology and Development এর অনুরূপ। সিম্পোজিয়ামে ইসলামের ওপর গবেষণা পরিচালনা ও এসব গবেষণার ফলাফল ও অন্যবিধ তথ্যসমূহের প্রচার ও প্রসারের জন্য বিদ্যমান ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। এই এসোসিয়েশনের মাধ্যমে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার আদান প্রদান করবে।

ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুশীলন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি, ইসলামের সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক দর্শনের ব্যাপারে উত্থাপিত উন্নয়ন তাত্ত্বিকদের সহজাত বেমানান যুক্তি প্রমাণ করে যে, এই বিশাল ধর্মটির বিশ্বকে দেয়ার অনেক আছে। ইসলামের ওপর আমাদের এই চিন্তা দর্শনকে আর্থ-সামাজিক সকল পর্যায়ের নীতি নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের তাত্ত্বিক দিক এবং ইসলামী দর্শনের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত বর্তমান সিম্পোজিয়ামটির ন্যায় গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন, কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম আয়োজন জরুরী। আর তখনি নতুন ও উন্নততর বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলামের সহজাত মূল্যবোধকে সামাজিক নীতি বিনির্মানের বিবেচনায় আনা যাবে।

---

www.pathagar.com

বি আই আই টি'র প্রকাশনাসমূহ

1. *A Young Muslim's Guide to Religions in The world (1992) by Dr. Syed Sajjad Husain*
2. *Islam in Bengali Verse (1992) by poet Farrukh Ahmad, Translated into English by Dr. Syed Sajjad Husain*
3. *Directory of Specialists (1993) edited by M. Zohurul Islam FCA and Dr. A.K.M. Ahsanullah*
4. *Civilization and Society (1994) by Dr. Syed Sajjad Husain*
5. *Social Laws of Islam (1995) by Shah Abdul Hannan*
6. *ইসলামী উসূলে ফিকাহ্ (১৯৯৬) মূল ঃ ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানী, অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ নূরুল আমিন জাওহার*
7. *Leadership Western and Islamic (1996) by Dr. Mohammad Anisuzzaman and Prof Md. Zainul Abedin Majumder*
9. *Guidelines to Islamic Economics: Nature, Concepts and Principles (1996) by Prof M. Raihan Sharif*
10. *মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক (১৯৯৭-২০০২) মূল ঃ ড. জামাল আল বাদাবী, অনুবাদ ঃ মোঃ শামীম আহসান*
11. *Islamization of Academic Disciplines (Seminar proceedings) (1997) Edited by M. Zohurul Islam FCA.*
12. *কোরআন ও সুন্নাহ ঃ স্থান-কাল-প্রেক্ষিত (১৯৯৭), মূল ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী এবং ড. ইমাদ আল দীন খলিল, অনুবাদঃ শেখ এনামুল হক*
13. *Origin and Development of Experimental Science (1997) by Dr. Muin-ud-Din Ahmad Khan*
14. *রাসূলের (সা) যুগে মদীনার সমাজ (১৯৯৮) মূল ঃ আকরাম জিয়া আল উমারী, অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম*
15. *ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ (১৯৯৮) মূল ঃ মারওয়ান ইব্রাহীম আল-কাইজী, অনুবাদ ঃ শেখ এনামুল হক*
16. *Man and Universe (1998)*
17. *আত-তাওহীদ ঃ চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য (১৯৯৮) মূল ঃ ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, অনুবাদ ঃ অধ্যাপক শাহেদ আলী*
18. *Al-Zakah: A Hand book of Zakah Administration (1990) by M. Zohurul Islam FCA*
19. *The Islamic Theory of Jihad and The International System (1999) by Md. Moniruzzaman*

www.pathagar.com

20. *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ (২০০০)*
মূল ঃ ড. এম উমর চাপরা, অনুবাদঃ ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব
21. *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (২০০০)*
মূল ঃ ড. এম উমর চাপরা, অনুবাদ ঃ ড. মাহমুদ আহমদ
22. *ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ*
মূল ঃ ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবু সুলায়মান, অনুবাদ ঃ মাওলানা আকরাম ফারুক
23. *Accounting: Philosophy, Ethics and Principles-An Islamic Perspective by M. Zohurul Islam FCA*
24. *আমাদের সংস্কৃতি ঃ বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ (প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সংকলন) ২০০২*
সম্পাদনাঃ অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার
25. *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid (2002) by Prof. Md. Athar Ali*
26. *রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খন্ড), মূল ঃ আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক, সম্পাদনা ঃ আবদুল মান্নান তালিব*
২৭. *ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, মূল ঃ ড. আব্দুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান*
অনুবাদঃ অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার
২৮. *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী, মূলঃ বি. আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন*
অনুবাদঃ ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান
২৯. *ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা সামাজিক প্রেক্ষাপট* (ILO *প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন*)
অনুবাদঃ এম রুহুল আমিন

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. *রসূলের (স) যুগে নারী স্বাধীনতা (৪র্থ খন্ড), মূল ঃ আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী, সম্পাদনাঃ আবদুল মান্নান তালিব*
2. *On Openness, Integration and Economic Growth by Dr. M. Kabir Hassan*
3. *A Dynamic Analysis of Trade and Development in Islamic Countries: Selected Case Studies, by Dr. Masudul Alam Chowdhury*
4. *The Economy of the Muslim Countries in the New World Order by Dr. M. Kabir Hassan*
5. *Crisis in the Muslim Mind by Abdul Hamid A. Abu Sulayman, Translated by Mahbubul Haque.*

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি) একটি শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯৮৯ সালে এটি কার্যক্রম শুরু করে। দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদগণ বি আই আই টি'র কর্মকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

প্রধান লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- বর্তমান প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে নৈতিকতাভিত্তিক এবং যুগোপযোগী এবং প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কাজ করা।
- মৌলিক, গবেষণামূলক ও অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশ করা।
- সামাজিক-সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অন্যান্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা সভা, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা।
- মুসলিম উম্মাহ্‌র কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের অনুরূপ সংগঠনসমূহের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ ও প্রকাশনা, মতামত এবং তথ্য বিনিময় করা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
(বি. আই. আই. টি)
১৪৫ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৯১১৪৭১৬, ৯১৩৮৩৬৭, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯১১৪৭১৬
E-mail: biit_org@hahoo.com
biit89_info@yahoo.com

www.pathagar.com

বিশ্ব অর্থব্যবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি, সমাজবাদী অর্থনীতি কোনটিই মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে স্থায়ী কোন কল্যাণ আনতে পারেনি। বিশ্ব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে বিশ্বায়নের কথা বলা হলেও সামগ্রিক বিবেচনায় কোন মতবাদই জনসম্পদের বিশ্বায়নের কথা বলেনি। বিশ্বায়ন শুধু বাণিজ্য আর শিল্পায়নেই সীমাবদ্ধ থাকলে সামগ্রিক অর্থে মানব কল্যাণ সম্ভব নয়। বাণিজ্যের ন্যায় মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য মানবসম্পদের ব্যবহারেও বিশ্বায়ন জরুরী। **"ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা"** বইয়ে নতুন বিশ্বব্যবস্থার আলোকে কল্যাণকামী অর্থব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম স্থানান্তর, অর্থ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনে ধর্ম-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ব্যবস্থাসহ সমসাময়িক ইসলাম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে এই বইয়ে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি)

ISBN -984-8203-31-8

www.pathagar.com